বঙ্গদর্শন।

১০৩ সংখ্যা।

দেবীচৌধুরাণী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল ভবানীঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন, যে একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে বাস না করিলে তিনি একাকী কি প্রকারে এ অরণ্য মধ্যে বাস করেন? ভবানী ঠাকুর একজন কেন, দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়াদিলেন। একজন হাটে ঘাটে যাইবে আর একজন তাঁর কাছে অনুক্ষণ থাকিবে। দুইজন দুই রকমের। যে হাটে ঘাটে যাইবে, তার নাম গোবরার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কানে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোন মতে ঈশারা ইঙ্গিতে চলিত; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এ রকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাঁধে।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির স্ত্রীলোক, বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—বর্ষাকালের কচি পাতার মত রং। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

দুইজনে একত্রে আসিল—যেন পূর্ণিমা অমাবস্যার ভাব হইয়াছে। গোবরার মা প্রফুল্লকে প্রণাম করিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি গা?" গোবরার মা শুনিতে পাইল না, অপরা বলিল, "ও একটু কালা—ওকে সবাই গোবরার মা বলে।"

প্র। গোবরার মা! তোমার কয়টি ছেলে গা?

গোবরার মা। আমি ছিলেম আর কোথায়? বাড়ীতে ছিলেম।

প্র। তুমি কি জেতের মেয়ে?

গোবরার মা। তা যেতে আসতে খুব পারব। যেখানে বলিবে, সেই খানে যাব।

প্র। বলি, তুমি কি লোক?

গোবরার মা। আর তোমার লোকে

কাজ কি মা? আমি একাই তোমার সব কাজ ক'রে দেব। কেবল দুই একটা কাজ পারব না।

প্র। পার'বে না কি?

গোবরার মার কান ফুটিল। বলিল পারব না কি? এই জল তুলিতে পারব না। আমার কাঁকালে জোর নাই। আর কাপড় চোপড় কাচা—তা না হয় মা তুমিই করো।

প্র। আর সব পারবে ত?

গোবরা। বাসন টাসনগুলো মাজা—তাও না হয় তুমি আপনিই করলে?

প্র। তাও পারবে না? তবে পারবে কি?

গো। আর এমন কিছু না—এই ঘর ঝেটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারিনে।

প্র। তবে পারবে কি?

গো। আর যা বল। সলতে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এটো পাত ফেলবো,—আর আসল কাজ যা তা করব,—হাট করব।

প্র। বেসাতির হিসাব টা দিতে পারবে?

গো। তা, মা, আমি বুড়ো মানুষ হালা কালা, আমি কি অত পারি। তবে কড়ি পাতি যা দেবে তা সব খরচ করে আসব—তুমি বলতে পাবে না যে আমার এই খরচটা হলো না।

প্র। বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

গো। তা মা, যা বল, তোমরা আপনার গুণে বল।

প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, "তোমার নাম কি গা?"

নবাগতা সুন্দরী বলিল, "তা ভাই জানি না।"

প্র। হাসিয়া বলিল, "সে কি? বাপ মায় কি নাম রাখে নাই?"

সুন্দরী বলিল, "রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নহি।"

প্র। সে কি গো?

সুন্দরী। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ মার কাছ ছাড়া। ছেলে বেলায় আমায় ছেলে ধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্র। বটে! তা তারাওত একটা নাম রেখেছিল?

সুন্দরী। নানারকম।

প্র। কি কি?

সুন্দরী। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী, চুলোমুখী।

এতক্ষণ গোবরারমার আবার কান হারাইয়াছিল। এই কয়টা সদাশ্রুত গুণবাচক শব্দে শ্রুতি জাগরিত হইল। সে বলিল, "যে আমায় পোড়ারমুখী বলে, সেই পোড়ারমুখী, যে আমায় চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী, যে আমায় আঁটকুড়ী বলে, সেই আঁটকুড়ী—

সুন্দরী। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলি নাই বাছা।

গোবরার মা। তুই আঁটকুড়ী বলিলেও বলেছিস্, না বলিলেও বলেছিস্—কেন বলবি না?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বলচে না গো—ও আমাকে বলচে।"

তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোবরারমা বলিল "ও কপাল! আমাকে না? তা

বলুক মা বলুক, তুমি রাগ ক'রোনা। ও বামনীর মুখটো বড় কছুয়্যি। তা বাছা! রাগ করতে নেই।"

গোবরার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন। প্রফুল্ল অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বামনী? তা আমাকে এতক্ষণ বল নাই? আমার প্রণাম করা হয় নাই।" প্রফুল্ল প্রণাম করিল।

বয়স্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "আমি বামনের মেয়ে বটে—এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামনী নই।"

প্র। সে কি?

বয়স্যা। বামন যোটে নাই।

প্র। বিবাহ হয় নাই? সে কি?

বয়স্যা। ছেলে ধরায় কি বিয়ে দেয়?

প্র। চিরকাল তুমি ছেলে ধরার ঘরে?

বয়স্যা। না, ছেলে ধরায় এক রাজার বাড়ী বেচে এয়েছিল।

প্র। রাজারা বিয়ে দিল না?

বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্ব্বমত।

প্র। নিজে পাত্র বুঝি?

বয়স্যা। তাও কয়দিনের জন্য বলিতে পারি না?

প্র। তার পর?

বয়স্যা। তার পর, পলায়ন।

প্র। তার পর।

বয়স্যা। রাজমহিষী কিছু গহনা দিয়াছিলেন, গহনা সমেত পলাইয়াছিলাম। সুতরাং ডাকাতের হাতে পড়িলাম। সে ডাকাতের দলপতি, ভবানী ঠাকুর। তিনি আমার কাহিনী শুনিয়া আমার গহনা লইলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন। আপনার গৃহে আমার আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। এক প্রকার কি?

বয়স্যা। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। আমারই মত?

বয়স্যা। তোমার শুধু ধন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ। আমার সব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম?

বয়স্যা। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

বয়স্যা। হাঁ—কেন না যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিল "বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না।

বয়স্যা বলিল, "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেননা তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।"

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথায় উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।

স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সাস্থ। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী, ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে, এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, "আমি অত কথা ভাই বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত বলিলে না।"

বয়স্যা বলিল, "ভবানীঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি, আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতে ছিলাম শোন। ঈশ্বরই পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তি টুকুকে দুইভাগ করিলে কতটুকু থাকে?

প্র। দূর! মেয়ে মানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।

প্র। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।" তখন নিশি, প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তার চখের জল মুছাইল। বলিল, "এত জানিতাম না।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন হইল, ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বিদায় দিয়াছেন। হরবল্লভের সংসার যেমন চলিতেছিল—তেমনি চলিতে লাগিল—সকলে খায় দায় বেড়ায়, সংসারের কাজ করে। একজনের দিন কেবল ঠিক সে রকম যায় না। হঠাৎ কেহ কিছু বুঝিল না—জানিল না। প্রথমে মা জানিল। গৃহিনী দেখিল, ছেলের পাতে দুধের বাটিতে দুধ পড়িয়া থাকে, মাছের মুড়ার কেবল কণ্ঠার মাছটাই ভুক্ত হয়, "রান্না ভাল হয় নাই" বলিয়া ব্রজ ব্যঞ্জন ঠেলিয়া রাখে। মা মনে করিলেন, "ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।" প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন, তারপর কবিরাজ ডাকিবার কথা হইল। ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মাকে, ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল কিন্তু ব্রহ্ম

ঠাকুরাণীকে পারিল না। বুড়ী, ব্রজেশ্বরকে একদিন একা পাইয়া চাপিয়া ধরিল।

"হাঁরে ব্রজ, তুই আর নয়ান বৌয়ের মুখ দেখিস্ না কেন?"

ব্রজ হাসিয়া বলিল, "মুখ খানি একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে মেঘ ঝড় ছাড়া নেই—দেখিতে বড় সাধ নাই।

ব্রহ্ম। তা মরুক গে, সে নয়ান বৌ বুঝবে—তুই খাস্‌নে কেন?

ব্রজ। তুমি যে রাঁধ!

ব্রহ্ম। আমিত চিরকাল এমনি রাঁধি।

ব্রজ। আজ কাল হাত পেকেছে।

ব্রহ্ম। দুধও বুঝি আমি রাঁধি? সেটাও কি রান্নার দোষ?

ব্রজ। গোরুগুলার দুধ বিগড়ে গিয়েছে।

ব্রহ্ম। তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস্ কি?

ব্রজ। কবে তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম। আর তোর বড়াইয়ে কাজ নেই! মুখে অমন অনেকে বলে! শেষ এই নিমগাছের তলায় আমায় গঙ্গা দিবি—তুলসী গাছটাও দেখ্‌তে পাবনা! তা তুই ভাব না যা—কিন্তু তুই আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হ'য়ে গেলি কেন?

ব্রজ। ওটা কি কম ভাবনা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়া রাণায় ব'সে কি তাই ভাবছিলি? চোক দিয়ে জল পড়ছিল কেন?

ব্রজ। ভাবছিলাম যে স্নান করেই তোমার রান্না খেতে হ'বে। সেই দুঃখে চখে জল এসেছিল।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দেবে? তা হলে খেতে পারবি ত?

ব্রজ। কেন সাগর ত রোজ রাঁধিত? খেলা ঘরে যাওনি কোন দিন? ধুলা চড়চড়ী, কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট—একদিন আপনি খেয়ে দেখ না? তারপর আমায় খেতে ব'লো।

ব্রহ্ম। প্রফুল্ল এসে রেঁধে দেবে?

যেমন পথে কেহ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের ভিতর সেই আলো পড়িলে ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনি হইল। ব্রজ উত্তর করিল, "বাগ্‌দী যে!"

ব্রহ্ম। বাগদী না। সবাই জানে সে মিছা কথা। তোমার বাপের কেবল সমাজের ভয়। ছেলের চেয়ে কিছু সমাজ বড় নয়। কথাটা কি আবার পাড়ব?

ব্রজ। না, আমার জন্য সমাজে আমার বাপের অপমান হবে—তাও কি হয়?

সে দিন আর বেশী কথা হইল না। ব্রহ্ম ঠাকুরাণীও সবটুকু বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা বড় সোজা নয়। প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়,—এক ত রূপেই সে ব্রজেশ্বরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আবার সেই একদিনেই ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিলেন, প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর। যদি প্রফুল্ল—বিবাহিতা স্ত্রী—স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত, তবে এই উন্মাদকর মোহ সুস্নিগ্ধ স্নেহে পরিণত হইত। রূপের মোহ কাটিয়া যাইত, গুণের মোহ থাকিয়া যাইত। কিন্তু তা হইল না। প্রফুল্ল বিদ্যুৎ একবার চমকাইয়া, চির

কালের জন্য অন্ধকারে মিশিল, সেই জন্য সেই মোহ সহস্রগুণে বল পাইল। কিন্তু এত গেল সোজা কথা। কঠিন এই যে,ইহার উপর দারুণ করুণা। সেই সোণার প্রতিমাকে, তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকাল জন্য গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল! বুঝি না খাইয়া মরিয়া যাইবে। যখন সেই প্রগাঢ় অনুরাগের উপর এই গভীর করুণা—তখন মাত্রা পূর্ণ। ব্রজেশ্বরের হৃদয় প্রফুল্লময়—আর কিছুরই স্থান নাই। বুড়ী এতকথা বুঝিল না।

কিছুদিন পরে ফুলমণি নাপিতানীর প্রচারিত প্রফুল্লের তিরোধানবৃত্তান্ত হরবল্লভের গৃহে পৌছিল। গল্প মুখে মুখে বদল হই'তে হইতে চলে। সম্বাদ টা এখানে এইরূপ আকারে পৌছিল—যে প্রফুল্ল বাতশ্লেষ্ম বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল। ব্রজেশ্বরও শুনিল।

হরবল্লভ শৌচ স্নানী করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "বাগ্‌দীর শ্রাদ্ধ বামুনে করিবে?" নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, "একটা পাপ গেল—আর একটার জন্ত এই নাওয়াটা নাইতে পারলেই শরীর জুড়ায়।" কিছুদিন গেল। ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া, শুকাইয়া, ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু জ্বর হয় মাত্র, কিন্তু ব্রজ নির্জ্জীব, শয্যাগত। বৈদ্য দেখিল। ঔষধপত্রে কিছু হইল না—রোগ বৃদ্ধি পাইল। শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।

আসল কথা আর বড় লুকান রহিল না। প্রথমে বুড়ী বুঝিয়াছিল, তারপর গিন্নী বুঝিলেন। এ সকল কথা মেয়েরাই আগে বুঝে। গিন্নী বুঝিলেই, কাজেই কর্ত্তা বুঝিলেন। তখন হরবল্লভের বুকে শেল বিঁধিল। হরবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছি! ছি! কি করিয়াছি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি।" গিন্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।" হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।"

ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল—ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিল। একদিন হরবল্লভের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত। হরবল্লভ শ্রাদ্ধ করিতেছেন, ব্রজেশ্বর সেখানে কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত আছেন। তিনি শুনিলেন শ্রাদ্ধান্তে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেন,

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

কথাটি ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন,

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের

পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।

আর্য্য পিতৃভক্তি বাঙ্গালা মুলুকে আর নাই; ইংরেজি শিক্ষার হলাহলে বাঙ্গালার প্রাচীন ধর্ম্ম জর্জ্জরিত হইয়াছে; পরমারাধ্য, পরমপূজনীয় পিতাঠাকুর, যাঁহার শ্রীচরণ কমল স্পর্শ করিতে সাহস হইত না, তিনি এখন মাইডিয়র ফাদারে পরিণত হইয়াছেন; আর তিনি ভক্তির পাত্র নহেন, অনুযোগের পাত্র মাত্র। বাঙ্গালী হইয়া যে বাপকে, "বুড়া বেটা" না বলিল, সেই আজ কাল সৎপুত্র মধ্যে গণ্য। এ সমাজ নাকি আবার উন্নত হইতেছে, অধঃপাতে যাইতেছে না, কেননা বাঙ্গালী স্পীচ দিতে শিখিয়াছে। ধর্ম্মের পবিবর্ত্তে বক্তৃতা, আমাদের বড় লাভ হইয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লেব শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানীঠাকুরেব কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, আর কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক, প্রফুল্ল তাহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠকঠাকুব নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ কবাইলেন। আরম্ভ করাইয়া, দুই চাবি দিন পড়াইয়া, অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে, নিশিও বিস্মিতা হইল। প্রফুল্লের রন্ধন, ভোজন শয়ন সব নাম মাত্র, কেবল সু ঔ জস অম ঔশস ইত্যাদিতে মন। নিশি বুঝিল, যে প্রফুল্লের সেই "দুই নূতন" কে ভুলিবার জন্য, অনন্য চিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষায় চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকবণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার পর, প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এসকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তারে যোগ শাস্ত্রাধ্যায়নে নিযুক্ত করিলেন। এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবদগীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এ দিকে প্রফুল্লের ভিন্ন প্রকার শিক্ষাব ও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন গোবরার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে—সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না। কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লের কষ্ট নাই—মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি, ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে তাও সকল দিন এত জুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানীঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে প্রফুল্ল থানা, ডোবা, বিল, খালে, আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত; সুতরাং গোবরার মা, হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিল না।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বমত রহিল, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নূন লঙ্কা ভাত। আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা সন্দেশ, ঘৃত মাখম ক্ষীর ননী ফলমূল, অন্ন ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের নূন লঙ্কা ভাত। দুইজনে একত্রে বসিয়া খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি দুইজনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভালসামগ্রী বড় খাইত না—গোবরার মাকে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে, প্রফুল্লের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহা খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল কেবল নুনলঙ্কা ভাতে খাইল।

পঞ্চম বৎসরে, তাহার প্রতি প্রথম বৎসরের মত ভোজনের উপদেশ হইল। তদ্ভিন্ন দুগ্ধ ও মুদ্গও খাইতে পাঠকঠাকুর অনুমতি করিলেন। বলিলেন, "এখন তোমার শরীরে বল চাই। বলকারক আহার করিবে।"

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানীঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। আপনি ভিন্ন কোন পুরুষকে তিনি ইহাদিগের বাসস্থানে আসিতে দিতেন না। এই বনে তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—যাহাতে নিষেধ তাহা-কেহই করিতে পারিত না। বাহিরে যাওয়ার পক্ষে প্রফুল্লের প্রতি কোন নিষেধ ছিল না। প্রফুল্লও কখন কখন মাটে ঘাটে বেড়াইতে যাইত--কিন্তু কোন পুরুষের সঙ্গে কখন কোন কথা কহিত না। ভবানীঠাকুরের চর যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, তাহা সে জানিতনা।

এইমত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা, অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্য্য ভোগের যোগ্য পাত্র করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে মাত্র প্রফুল্ল ভবানীঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছুই দিল না। ভবানীঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন,

"পাঁচ বৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন, তোমার হস্তগত ধন, তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব,—ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করিও। আর তোমায় ভিক্ষা দিব না,—তুমি আপনি আপনার দিন পাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই। কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি,—আর একবার বলি।

প্রথম, ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছ—উহাতে তোমার কোন অধিকার নাই। নিজের সুখের জন্য উহার কিছু তুমি ব্যয় করিতে পার না। তবে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধার্থ যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা ব্যয় করিতে পার। তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের জন্য তোমার নিজ শরীর রক্ষার প্রয়োজন—অতএব শরীর রক্ষার্থ আবশ্যক মত ব্যয় করিবে। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যোদ্ধারের জন্য যদি বেশ ভূষার প্রয়োজন হয়, তাহাও করিবে। কিন্তু ভোগ বিলাসের জন্য এক কপর্দ্দক ও নয়। অতএব প্রথম কথা, ইন্দ্রিয়সংযম। এক্ষণে আমার দ্বিতীয় উপদেশ শুন। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখন তাহা মনে করিবেনা। করিলে পুণ্যকর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর আমার তৃতীয় উপদেশ এই যে সর্ব্ব কর্ম্ম ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। কোন কর্ম্মের শুভফল নিজে প্রাপ্ত হইবার কামনা করিবেনা। ভগবান বলিয়াছেন,

যৎ করোষি, যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥

গীতা ৯। ২৭।

এই ত্রিবিধ সংন্যাস তোমার সম্পূর্ণ হইলে, অর্থ সমুদায়ই তোমারই হইবে। তার পর তুমি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিও,—আমি নিবারণ করিব না। উচ্চ অট্টালিকা প্রস্তুত করিও, উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিও, কিছুতেই আর তোমার ধর্ম্মচ্যুতি বা চিত্তবিকৃতি হইবেনা। সাংসারিক সম্পত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও সন্ন্যাসী হওয়া যায়। সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস। এখন

বুঝিলে তোমার কাছে যে ধন আছে তাহা কার?

প্র। ধন শ্রীকৃষ্ণের—সে কথা ত অনেক দিন হইয়াছে।

ভ। কিন্তু সে কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিলে কি না? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আর্ত্তকে দিলে আমি পাইলাম। অতএব যখন তুমি এই ধন পরোপকারে ব্যয় করিবে, তখন আর তোমার মনে এমন ভ্রম জন্মিবেনা যে আমার ধন আমি পরকে দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের ধন, শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়ায় পুণ্য নাই। অতএব তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারিবে।

প্র। কিন্তু আর্ত্তমাত্রেই কি শ্রীকৃষ্ণ? যে দোষী, যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, দণ্ড প্রাপ্তিকালে সেও আর্ত্ত।

ভ। আর্ত্ত অনার্ত্ত সব শ্রীকৃষ্ণ। জগদব্রহ্মাণ্ড সব শ্রীকৃষ্ণ। যেখানে দিবে, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণ পাইবেন। দিও, রাখিও না। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,

> যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র
> সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
> তস্যাহং ন প্রণশ্যামি
> স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
> সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং
> ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
> সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি
> স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
> আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র
> সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
> সুখং বা যদি বা দুঃখং
> স যোগী পরমো মতঃ॥ *

প্রফুল্ল বলিল, "প্রভু, আমাকে যেরূপ উপদেশ দিবেন, আমি সেইরূপই করিব। কিন্তু এই সময়ে আপনার নিকট একটি নিবেদন আছে—যদি অপরাধ না লয়েন, তবে জানাই।"

ভবানী। আমার সঙ্গে তোমার এক্ষণে সচরাচর দেখা হইবে না। তোমার কাজ এখন তোমার হাতে। অতএব যাহা বলিবার থাকে আজ বল।

প্রফুল্ল। কথাটা আমার মনে এই হয়, যে আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত; দস্যুবৃত্তি পরম অধর্ম্ম। শুনিয়াছি আপনার এই বৃত্তি। সে কথা সত্য কি না, আমার কাছে বলিবেন, আমার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

ভবানী। আমি ত ডাকাতি করি। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রফুল্ল। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক। এই ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভবানী। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাতি করি না—

প্র। তবে কি?

ভবানী। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাতি কিরকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ। এদেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য শাসন করিতে

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ অ ৩০—৩২

জানেও না, পারেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাতি করিয়া ?

ভ। শুন বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানীঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যাধিকারীর দুর্ব্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘর বাড়ী লুঠ করে, লুকান ধানের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের যায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণ বধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তান্ত্রিক কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটা বিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কিপ্রকারে করি, তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে ?"

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল। সে ভবানী ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিল। বলিল, "আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।"

ভবানীঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে স্বদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া, তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক, তাঁহার এক খানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফল্লকে পাঁচবৎসর ধরিয়া শান দিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানা গুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের প্রায় বড় ধার। তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল--প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত। যাইহউক এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবনতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই।

ব্রহ্মচর্য্য।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের অনেক প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় বুঝাইতে হইলে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ব্রত। ব্রত কাহাকে বলে বোধ হয় হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। পৃথিবীতে হিন্দুর ন্যায় কেহ ব্রত করে না এবং করিতে পারে না। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া সংযতচিত্তে কঠোর নিয়ম পালন করার নাম ব্রত। ব্রহ্মচর্য্যরূপ ব্রত দুই প্রকার— উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচর্য্য এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য। মুক্তি লাভার্থ সংসার হইতে পৃথক থাকিয়া কঠোর প্রণালীতে জীবন ধারণ করিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মসাধনার নাম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য। এ ব্রহ্মচর্য্যের কথা এ প্রবন্ধে বলিব না। পরোপকারার্থ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে শিক্ষালাভ আবশ্যক, নিয়মানুসারে সেই শিক্ষালাভের নাম উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচর্য্য। মানুষের চারি আশ্রমের মধ্যে জীবনের প্রথম ভাগের জন্য শাস্ত্রে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, সে এই ব্রহ্মচর্য্যরূপ আশ্রম। অতএব, উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ,—মনুষ্যজীবনের ভিত্তি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি প্রণালীতে সেই ভিত্তি স্থাপন করিতেন, তাহা যত সংক্ষেপে পারি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষা কাহাকে বলে বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয় বুঝিতে হয়—শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার নিয়ম। হিন্দুশাস্ত্র মতে শিক্ষার বিষয় চারিটি—দেহ, মন, আত্মা এবং হৃদয়।

ব্রহ্মচারী অথবা ছাত্রের দেহ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ রাখিবার নিমিত্ত মনুসংহিতায় কতকগুলি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

(১) সূর্য্যেণ হ্যভিনির্ম্মুক্তঃ
শয়ানোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণো
যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা॥ (২অ-২২১)

যে ব্রহ্মচারীর শয়নাবস্থায় সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হয়, সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মহাপাপে লিপ্ত হয়।

(২) উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য
চরমঞ্চৈব সম্বিশেৎ। (২অ-১৯৪)

গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই শিষ্যকে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে এবং গুরুর শয়ন করিবার পর শয়ন করিতে হইবে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠা কত আবশ্যক তাহা সকলেই জানেন। সেই নিয়ম এই দুই শ্লোকে এবং আরো কতকগুলি শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে।

শারীরিক বল এবং স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধনার্থ দূরপথ গমন এবং শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় হিতকর ব্যায়াম আর কিছুই নাই। মনু ও ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ
সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ম্প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ
তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥ (২অ ১৮৬)

শ্রমশীল হইয়া দূর হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ আনিয়া তাহা রৌদ্রে শুখাইবে এবং তদ্দ্বারা সায়ং ও প্রাতে অগ্নিতে হোম করিবে।

(২) উদকুম্ভং সুমনসো
গোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্যাবদর্থানি
ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ॥ (২অ—১৮২)

জল কলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ, প্রভৃতি আচার্য্যের যাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিবে এবং প্রতি দিন ভৈক্ষ্যচর্য্যা করিবে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার ব্যবস্থা আছে। তাহারা উদ্দেশ্য—শারীরিক বল, স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮০ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান মনু বলিতেছেন :—

এবঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥
(২অ—১৮০)

ব্রহ্মচারী যেমন তেমন শয্যায় শয়ন করিবে। কদাচিৎ ইচ্ছাক্রমে রেতঃস্খলন করিবে না। ইচ্ছাক্রমে ঐ কার্য্য করিলে সে আপনার ব্রতকে নষ্ট করে।

মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র শিখান হইত। তদ্দ্বারা ছাত্রের মানসিক শক্তি এবং জ্ঞানভাণ্ডার কতদূর পরিবর্দ্ধিত হইত, তাহা এখন পরিষ্কাররূপে বুঝিবার উপায় নাই। তবে এটি বুঝিতে পারা যায় যে গুরু শিষ্যকে অতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সকল শিখাইতেন এবং যাহা শিখাইতেন তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া শিখাইতেন। যথা মনু :—

ষট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং
গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা
গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা
বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো
গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ (৩অ—১৩২)

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর এবং আবশ্যক হইলে ততোধিক কাল, অথবা তাহার অর্দ্ধকাল কিম্বা তাহার এক-চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদ-শাখা শিক্ষা করিয়া, তিনটি, দুইটি বা একটি ভিন্ন বেদশাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

আত্মার শিক্ষা ও প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা এই :—

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যা-
দ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণং।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব
সমিদাধানমেব চ॥
(২অ—১৭৬)

নিত্য স্নান করিবে। পবিত্র দেহে ও পবিত্র মনে দেব, ঋষি, ও পিতৃলোকের তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিবে। এবং কাষ্ঠাহরণপূর্ব্বক হোমকার্য্য করিবে।

এবং—

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ
সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।

সায়ম্প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ
তাভিরগ্নি মতন্দ্রিতঃ॥ (২অ—১৮৬)

এ শ্লোকের অর্থ উপরে লিখিয়াছি।

আচম্য প্রয়তো নিত্য-
মুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌ দেশে জপং জপ্য-
মুপাসীত যথাবিধি॥ (২অ—২২২)

আচমন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে পবিত্র স্থানে বসিয়া দুই সন্ধ্যা সাবিত্রী উপাসনা করিবে।

হৃদয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে ও অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা, মাতা, আচার্য্য, জ্ঞানবান ব্যক্তি প্রভৃতিকে ব্রহ্মচারী ভক্তি ও সম্মান করিবে। যে কেহ কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করে, তাহাকে ব্রহ্মচারী গুরু বলিয়া মান্য করিবে।

অল্পং বা বহু বা যস্য
শ্রুতস্যোপ করোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যা-
চ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥(২অ—১৪৯)

যিনি অল্পই হউক বা বহুই হউক ব্রহ্মচর্য্যার সাহায্য করেন, ব্রহ্মচারী তাঁহাকেও গুরুবৎ পূজা করিবে।

যিনি ব্রহ্মচারী তাঁহার জীবহিংসা করা অকর্ত্তব্য।

প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং। (২অ—১৭৭)

প্রাণি হিংসা পরিত্যাগ করিবে।

এই যে হৃদয়ের শিক্ষা, ইহা শুধু উপদেশসম্বন্ধ ছিল না। ব্রহ্মচারীকে এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে হইত।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং
সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা
কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ
আচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু
তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা
পরমন্তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো
ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥
(২অ—২২৭, ২২৮ ও ২২৯)

মাতা পিতা পুত্রের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেন, সাধ্য কি যে পুত্র শত শত বর্ষেও সে ধার শুধিতে পারে। নিত্য সেই পিতা মাতার এবং আচার্য্যের প্রিয় কর্ম্ম করিবে, ইহাঁরা তিনজন তুষ্ট হইলেই সকল তপস্যা সিদ্ধ হয়। এই তিনজনের শুশ্রূষাই মহা তপস্যা। তাঁহাদের বিনানুমতিতে অন্য কোন ধর্ম্মই আচরণ করিবে না।

এই রকম অনেক নিয়ম ও উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এক রকম বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের শিক্ষা চারি প্রকারের ছিল—দেহের শিক্ষা, মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা এবং আত্মার শিক্ষা। এখন এদেশে ছাত্র কয় প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে? বোধ হয় এক প্রকার বই নয়, অর্থাৎ শুধু মনের শিক্ষা। এখন ইস্কুল কালেজে ছাত্রের কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচালনা হইয়া থাকে এবং ছাত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করে। হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা ইস্কুল কালেজে হওয়া সুকঠিন। পূর্ব্বে যেমন গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবার রীতি ছিল তাহাতে হইতে পারিত; এখন ইস্কুল

কালেজে যে রকমে বিদ্যাভ্যাস করা হয়, তাহাতে হইতে পারে না। পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং শিষ্য গুরুকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। অর্থাৎ গুরুশিষ্যের মধ্যে একটী হৃদয়ের গ্রন্থি থাকিত এবং সেইজন্য গুরুর কাছে শিষ্যের উত্তম হৃদয়ের শিক্ষা হইত। এখন ইস্কুল কালেজে গুরুশিষ্যের মধ্যে হৃদয়ের গ্রন্থি থাকে না। কাজেই এখন বালকেরা ইস্কুল কালেজে হৃদয়ের শিক্ষা পায় না। ঘরে পিতা মাতা সন্তানকে এ শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই সন্তানকে ইস্কুল কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। এই জন্য এখন আমাদের মধ্যে অনেক স্নেহ, দয়া, সহৃদয়তা প্রভৃতির ভান দেখিতে পাওয়া যায়—প্রকৃত স্নেহ, দয়া, সহৃদয়তা বড় একটা দেখা যায় না।

আত্মার শিক্ষা সম্বন্ধে ও এই সকল কথা খাটে। আমাদের ইস্কুল কালেজে প্রায়ই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলতঃ প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা কাহাকে বলে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় এ কথা ও বলা যাইতে পারে যে, ইস্কুলকালেজ প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নয়। দুই চারি খানা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলে ধর্ম্মশিক্ষা হয় না। ধর্ম্মচর্য্যাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা। গৃহ, ধর্ম্মচর্য্যার উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এখন গৃহে সন্তানের ধর্ম্মচর্য্যার প্রতি পিতা পিতৃব্যের মনোযোগ নাই। কাজেই এখন আত্মার শিক্ষার অভাবে আমাদের শিক্ষা অত্যন্ত অঙ্গহীন হইতেছে।

শরীরের শিক্ষাও এখন হয় না বলিলেই হয়। পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন শিক্ষকের নিমিত্ত জল তুলিবার রীতি নাই এবং ছাত্রের দ্বারা জল তুলাইয়া লইলে এখন শিক্ষককে বোধ হয় পদচ্যুত হইতে হয়। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ প্রভৃতি যে সকল স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করা উচিত, তৎপ্রতি লোকের এখন বিশেষ মনোযোগ নাই। সন্ধ্যাহ্নিকে আস্থা থাকিলে প্রকারান্তরে এই সকল নিয়মের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকিত। কিন্তু সে আস্থাও নাই, সে লক্ষ্যও নাই। হোমকাষ্ঠ আহরণার্থ পূর্ব্বকালে ছাত্রকে অনেক পথ হাঁটিতে হইত এবং শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। এখন কেহ হোমও করে না, কেহ পথও হাঁটে না। ইস্কুল কালেজ যাইতে এবং ইস্কুল কালেজ হইতে বাটি আসিতে পথ হাঁটার প্রয়োজন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতায় লোকে গাড়ি পাল্কি করিয়া, অন্ততঃ হিন্দুস্থানী বেহারার স্কন্ধে চাপাইয়া বালকদিগকে ইস্কুল কালেজে পাঠাইতে আজি কাল কিছু বেশী ভালবাসিতেছেন। এবং মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে ইস্কুল স্থাপন করিয়া লোকে বালক দিগের পথহাঁটারূপ হিতকর ব্যায়ামটি ক্রমে উঠাইয়া দিতে যত্নবান হইতেছেন। এইজন্য আমি বলি যে, গ্রামে গ্রামে ইস্কুল আমাদের উন্নতির লক্ষণ নহে, অবনতির লক্ষণ। বিদ্যার বহুল প্রচারের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে ইস্কুল আবশ্যক বটে। কিন্তু বিদ্যাবলের অগ্রে শারীরিক বল চাই। যদি শারীরিক বল পরিবর্দ্ধনার্থ গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম চর্চ্চার অনুষ্ঠান করা না হয়, তাহা হইলে গ্রামে গ্রামে ইস্কুল

স্থাপন করা অত্যন্ত অবিধেয়। কিন্তু বাঙ্গালীর উৎসাহ, উদ্যম এবং শক্তি বড় কম। ইস্কুল এবং ব্যায়ামানুষ্ঠান দুই একেবারে তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠা অসম্ভব। তাই বলি যে পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুদিগের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পাঠশালার আবশ্যক, কিন্তু আট দশ বৎসরের বা ততোধিক বয়সের বালকদিগের নিমিত্ত কাছে কাছে ইস্কুল স্থাপন করা ভাল নয়। মধ্যম শ্রেণীর এবং উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় দূরে দূরে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এবং দেশের রাস্তা ঘাট যত বেশী হইবে এবং ভাল হইবে, এক ইস্কুল হইতে অন্য ইস্কুলের দূরত্ব তত বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। অতি অল্পদিন আগে, অতি অল্প বয়স হইতে এদেশে লোকে যে রকম পথ হাঁটিতে পারিত, এখন তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। সে পথ হাঁটার কথা এখন গল্প বলিয়া মনে হয়। সাধে কি আমরা ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি? পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ঐন্দ্রিয়িক শিথিলতা নিবারণ বিষয়ে কিরূপ দৃষ্টি ছিল তাহা বলিয়াছি। এখন সন্তানের অধ্যয়ন কালের মধ্যে তাহার বিবাহ দিতে না পারিলে পিতা মাতা আপনাদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা ও হতভাগ্য মনে করেন!

অতএব শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃত ব্রহ্মচারী এখন নাই, পূর্ব্বকালে ছিল—জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এখন স্থাপিত হয় না, পূর্ব্বকালে হইত।

এখন প্রাচীন শিক্ষার নিয়ম কি ছিল বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

মনুসংহিতার দুই চারিটি শ্লোক পড়িলেই সে নিয়ম জানিতে পারা যায়।

(১) সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্
ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং
তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥ (২অ-১৭৫)

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকরত ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক নিজতপোবৃদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নিয়ম পালন করিবে।

(২) বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ
গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি
প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥ (২অ-১৭৭)

মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার বিলাস এবং প্রাণি হিংসা পরিত্যাগ করিবে।

(৩) অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষো-
রুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ
নর্ত্তনং গীতবাদনং॥ (২অ-১৭৮)

আভ্যঙ্গ করিয়া তৈলাদি মর্দ্দন, নেত্ররঞ্জন, পাদুকা ও ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্যগীতবাদ্য, এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

(৪) ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং
নৈকান্নাদী ভবেদ্‌ব্রতী। (অ-১৮৮)

ব্রহ্মচারী একজনের অন্নে জীবনধারণ করিবে না। ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

(৫) হীনান্নবস্ত্র বেশঃস্যাৎ
সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। (২অ-১৯৪)

গুরুসমীপে শিষ্যের অন্ন, বস্ত্র ও বেশ সর্ব্বদা গুরুর অপেক্ষা হীন হইবে।

(৬) দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ
পরিবাদং তথানৃতং।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভ-
মুপঘাতং পরস্য চ॥ (২অ-১৭৯)

দ্যূতক্রীড়া, বৃথাবাগবিতণ্ডা, পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, স্ত্রীসেবা, স্ত্রীলোকের প্রতি কামদৃষ্টি এবং পরের অপকার পরিহার করিবে।

এইরূপ আরো অনেক ব্যবস্থা আছে। অতি সামান্য অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রকারদিগের মতে শিক্ষার নিয়ম চারিটি বস্তু,—(১) কষ্টসহিষ্ণুতা (২) বিলাসবিদ্বেষ (৩) চিত্তসংযমন (৪) নিষ্ঠা। এই চারিটি একত্রিত না হইলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। বাবুগিরি করিলে মানুষ শিক্ষিত হইতে পারে না। বিলাসপ্রিয় হইলে মানুষ পরিশ্রম করিতে পারে না এবং বিনা পরিশ্রমে জ্ঞানলাভ করা যায় না। বিকলচিত্ত বা বিকলেন্দ্রিয় হইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কোন কাজই করিতে পারে না। যে কাজই কর, নিষ্ঠা না থাকিলে অর্থাৎ দেহের, মনের এবং প্রাণের যত শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি সেই কাজে বিনিযুক্ত না হইলে, সিদ্ধিলাভ একেবারেই অসম্ভব। একটি কাজ করিতে করিতে অন্য কাজে মন দিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। কোন একটি কাজ যেমন করিয়া করা উচিত তেমনি করিয়া করিতে হইলে তন্ময় হওয়া চাই। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ব্যতিরেকে কেহ কখন ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম ছিল এখন ও কি সেই নিয়ম আছে? বলিতে দুঃখ হয়, সে নিয়ম এখন নাই! লোকে এখন সন্তান সন্ততিকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চায় না। পথ হাঁটিতে কষ্ট হইবে বলিয়া ছেলেকে গাড়ি পাল্কি করিয়া ইস্কুলে পাঠায়। গায় একটু রৌদ্র লাগিবে বলিয়া হাতে ছাতা না দিয়া ছেলেকে ইস্কুলে পাঠায় না। পঠদ্দশাতেই আমাদের বালক এবং যুবকদিগকে বিলক্ষণ বিলাসপ্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বালকেরা প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম জুতা, উত্তম উত্তম বস্ত্র, pomatum প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, কখন কখন জামার বোতামে বড় বড় গোলাপ ফুল গুঁজিয়া ও ইস্কুলে আসে। চিত্তসংযমন কাহাকে বলে এখনকার ছাত্রেরা জানিতে একবারেই অক্ষম—কেননা পঠদ্দশাতেই তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়। এই সকল কারণে এখন অধ্যয়নে নিষ্ঠা নাই। এবং আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরকম বোধ হয় যে এই সকল কারণ ব্যতীত আরো কতকগুলি কারণ বশত এখন ছাত্রের নিষ্ঠা ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। এখন ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। তদ্দ্বারা তাহাদের অধ্যয়নে নিষ্ঠা কমিয়া যাওয়া এবং চিত্তসংযমনে বিঘ্ন ঘটাই সম্ভব। বোধ হয় ঐ সকল আন্দোলনে তাহাদিগের নিযুক্ত না হওয়াই ভাল। সামাজিক বা রাজনৈতিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন যে মন্দ বা অনাবশ্যক তাহা আমি বলি না। আমি এই

মাত্র বলি যে, আন্দোলন যাহার কার্য্য আন্দোলন ভিন্ন তাহার অন্য কার্য্য থাকা উচিত নয়, কেননা অন্য কার্য্য থাকিলে তাহার আন্দোলন হয় বিফল, নয়অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন হয়। তেমনি অধ্যয়ন যাহার কার্য্য, অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্য কার্য্য থাকিলে তাহার অধ্যয়ন হয় বিফল, নয় অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয়। দর্শনগ্রন্থ লিখিতে লিখিতে পার্লিয়ামেণ্টে বসিতে গিয়া জন ইষ্টুয়ার্ট মিলের কি হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী ডিস্‌রেলির উপন্যাস লেখক বলিয়া ভাল যশ হইল কৈ? লর্ড ব্রুহাম নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া কোন বিষয়েই অক্ষয় যশ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। রাজাধিরাজ লুই নাপোলিয়ন সিজরের ইতিহাস লিখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে এপর্য্যন্ত গ্রন্থকার বলিয়া উচ্চ আসনে বসাইল না। তাই বলি, অধ্যয়ন যাহার কাজ, অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্য কাজ না থাকিলেই ভাল হয়। অধ্যয়ন শেষ করিয়া অন্য কাজ করিলে অধ্যয়নও ভাল হয়, অন্য কাজও ভাল হয়। এদেশে অধ্যাপক মহলে প্রবাদই আছে—ক্ষণা দুর্দ্দম-তার্কিক—অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী এক দণ্ড শাস্ত্রচিন্তা হইতে বিরত হইলে তাহার অধীত শাস্ত্র বিফল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অধ্যয়ন একটা মহাযোগ। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে সেই মহাযোগ ভঙ্গ হয়।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষার যাহা প্রকৃত নিয়ম, এখন এদেশে তাহা নাই। এখন শিক্ষার্থীর কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, বিলাসবিদ্বেষ নাই, চিত্তসংযম নাই, নিষ্ঠা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না, মনুষ্যজীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় না, মানুষ মানুষ হয় না। Smiles' Self-Help এবং Craik's Pursuit of Knowledge under Difficulties প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল লোকের মানুষ হওয়ার বিবরণ লিখিত আছে, এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা মানুষ হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে অধ্যয়ন একটি কঠোর তপস্যা। যে দেশের ইতিহাস দেখিতে ইচ্ছা হয় দেখ, এই তপস্যার প্রমাণ পাইবে। এ তপস্যা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু এ কঠোর তপস্যা আমাদের শেখা আবশ্যক হইয়াছে। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন যে "বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে; সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটি লাইকর্গস্ হইতে হইবে; কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না।" (পারিবারিক প্রবন্ধ—১২৫ পৃষ্ঠা।)

আরো এক কথা। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে অধ্যয়ন ফুরাইলেই ব্রহ্মচর্য্য ফুরায় না, তপস্যা ফুরায় না। মনু বলিয়াছেন:—

১। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।

অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে।

২। স সন্ধার্য্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা॥

সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো-
দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ (৩অ-৭৯)

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যসুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।

এ সকল কথার অর্থ এই যে মানুষের সমস্ত জীবনটিই ব্রহ্মচর্য্য হওয়া উচিত। জীবনকে একটী মহাব্রত মনে করিয়া সেই ব্রত উদ্‌যাপনার্থ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু, বিলাসবিরোধী, সংযতচিত্ত এবং নিষ্ঠাবান হইতে হইবে। যে মানুষ জীবনকে মহাব্রত মনে করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন না করে তাহার জীবন নিতান্তই অসার, অর্থশূন্য এবং বিফল হইয়া থাকে। জগতে যাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে তিনি চিরকালই ব্রহ্মচারী। উদাহরণ—বুদ্ধদেব, চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট, সক্রেতিস, মিল্টন, সেক্সপীয়র, সোফোক্লিস্, গার্ফিল্ড, গারিবল্‌দি। জগতে যিনি যখন ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন তখনই নিষ্ফল ও কদর্য্য হইয়াছে। উদাহরণ–সিজরদিগের আমলের রোমক, এবং দ্বিতীয় চার্লসের আমলের ইংরাজ। আমাদের জীবনকেও যদি সার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকেও জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। আমাদিগকেও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কষ্টকে কষ্ট মনে না করিয়া, বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া, চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়কে আপন আপন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বশীভূত করিয়া, আমাদের সমস্ত শক্তি সহকারে ঘোর নিষ্ঠাবান হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব জীবনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, সেই উদ্দেশ্যটি সাধনার্থ আমাদিগকে সংসারে থাকিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে হইবে।

এইখানে একটি সম্ভবপর প্রশ্নের মীমংসা করা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপটি ব্যাখ্যা দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কঠোরতাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত প্রাণ এবং গূঢ় অর্থ। যদি তাহাই হয়, তবে কোমলতার সহিত কি মানুষের কোন সম্পর্ক নাই এবং রাখা উচিত নয়? আকাশে মেঘের যে বিচিত্র খেলা হয়, মানুষ কি তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিবে না? স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীতে সান্ধ্য সমীরণে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ প্রভ বীচি উৎক্ষিপ্ত হয়, মানুষ তাহা কি দেখিবে না? বসন্তে বসুন্ধরা যে অপূর্ব্ব পুষ্পাবরণে আবৃত হয়, মানুষ কি তাহা দেখিবে না? অবশ্য দেখিবে। না দেখিলে মানুষ মানুষ হইবে না। মনুষ্যদেহে কঠিন অস্থিও আছে, কোমল মাংসও আছে। পৃথিবীতে কঠিনতম পর্ব্বতও আছে, কোমলতম কুসুম ও আছে। জগতে রুদ্র রৌদ্র ও আছে, কমনীয় কৌমুদী ও আছে। বিশ্বের সেই দুই মূর্ত্তি ধ্যান না করিলে মানুষ মানুষ হয় না—ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ হয় না। লক্ষ্মণ সসত্ত্বা সীতাদেবীকে তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী বাল্মীকি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন:-

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্
সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।

অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্ ॥
(রঘুবংশ, ১৪ সর্গ, ৭৮)

তুমি নিজ বলের অনুরূপ জলকলস লইয়া যখন আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বাড়াইবে, তখন স্তন্যপায়ী শিশুর উপর প্রসূতির যে অপূর্ব্ব প্রীতি, তাহা তুমি তোমার পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বেই অনুভব করিবে।

পৃথিবীর কোমলতার কি চমৎকার, কি রমণীয়, কি মহিমাময় ধ্যান! এইরূপে পৃথিবীর নীল আকাশ, পৃথিবীর স্বচ্ছ সলিল, পৃথিবীর সুপ্রস্ফুটিত কুসুম, পৃথিবীর সুকণ্ঠ, পৃথিবীর সুগন্ধ, পৃথিবীর সুন্দর দেহ, পৃথিবীর শ্যামল কান্তি ধ্যান করিও, তোমার ব্রহ্মচর্য্যার বিঘ্ন না হইয়া, বলবৃদ্ধি হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস-রূপ কঠোর তপস্যায় যে রামচন্দ্র জয়ী হইয়াছিলেন, এইরূপেই সেই রামচন্দ্র জানকীরূপ সুকোমল সৌন্দর্য্যকে ধ্যান করিয়াছিলেন। যাহার তপস্যা যত কঠোর, তাহার তত কোমলতার প্রয়োজন। প্রখর-রবিকর পীড়িত পথিকের সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধি জলের যত প্রয়োজন, আর কাহারো তত নয় এবং সেই পথিকের হাতে সেই জল যত পুণ্যপথগামী হয়, আর কাহারো হাতে তত হয় না। সেই জন্য প্রাচীন ভারতে তপস্বীর তপোবনেই বেশী ফুল ফুটিত, বেশী মৃগ মৃগী খেলাইয়া বেড়াইত, বেশী কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শুনা যাইত। ব্রহ্মচারীর জীবন, বিশেষতঃ উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর জীবন, নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। যে পরের জন্য বাঁচিয়া থাকে, তাহার যেমন আত্মত্যাগ বা আত্মনিগ্রহ আবশ্যক, তেমনি পরের সম্বন্ধে কোমল, সুমধুর এবং সহৃদয় হওয়া আবশ্যক। জগতের অপূর্ব্ব কোমলতায় হৃদয় মিশাইতে না পারিলে মনুষ্য-হৃদয় কেমন করিয়া জগতের সম্বন্ধে কোমল হইবে? পৃথিবীর সুকুমার এবং সুকোমল সৌন্দর্য্যই পরোপকারী ব্রহ্মচারীর শিক্ষার গূঢ় ভিত্তি। কোমলতার অর্থ না বুঝিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। তাই বলি যে, কেবল ব্রহ্মচারী পৃথিবীর সুকোমল সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম, অপর সকলে সে সৌন্দর্য্যের কেবল অপমান বা অপব্যবহার করে।

সেই জন্য জগতের সেবারূপ মহাব্রত-ধারী উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর হস্তে হিন্দু শাস্ত্রকার নারীরূপা কোমল, কমনীয় এবং পবিত্র কুসুমটি সযত্নে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী ভিন্ন জগতের সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অধিকারী আর কেহ নাই। ব্রহ্মচারীর চক্ষে জগতের সৌন্দর্য্য দেখিও, তাহা হইলে সে সৌন্দর্য্যে তুমি যত সৌন্দর্য্য দেখিবে, আর কেহই তত দেখিবে না।

☞ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সিটি কলেজগৃহে এই প্রবন্ধ বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।
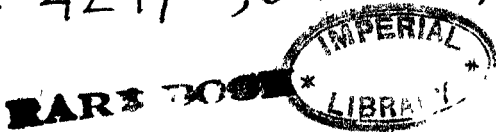
হায় কি হলো ?—

(১)

হায় কি হোলো—কলম্ ছুঁতে হাসি এলো ছুখে !
ভেবেছিলুম্—মনের কথা বল্‌বো ছাতি ঠুকে !
এলো হাসি—হাসিইতবে, ঢেউ খেলিয়ে চ'ল্যে,
ছড়াক্ থানিক্ রসের কথা—"হায় কি হলো" ব'ল্যে !

(২)

হায় কি হলো দেশের্ দশা বিপণ্ রাজার্ ডুবে ?
সাদা-কালো সমান্ হবে,—সবার মুণ্ডু ঘুরে !
আসল কথা রইল কোথা, কেউ না সেটা খোঁজে ;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,—হাওয়ার সঙ্গে যোঝে !
সফেদ্-কালা মিশ্‌খাবে না, সমান্ হওয়া পরে !
নাচের পুতুল্ হয় কি মানুষ্ তুলে উঁচু ক'র্যে ?

(৩)

হায় কি হলো—পেটের্ কথা বেরিয়ে গেল কত !
ইস্তক্ সে লাট্ টম্‌সন্,—বেরাল্ ইঁদুর যত—
ব'ল্যে দিলে "রাষ্ট্র ক'র্যে গুপ্ত প্রেমের কথা",
নেটিভ্ দিগের উচ্চপায়া, সেটা কথার্ কথা !
ধর্ম্মভীতু এ দিশীও তাদের্ ভিতর ছিল,
পষ্ট কথা ব'ল্যে দিয়ে "পুরস্কারি" নিল !

(৪)

হায় কি হলো—কত লোকের্ ভ্রম্‌টা গেলো ঘুচে,
বিলেত্ ফেরা এ দেশীতে তফাৎ নাইক মুছে !
যতই বলুন্, যতই শিখুন্ তাদের চলন্ চাল্,—
ইংরাজেরা ভোলে না তায়,—হায়রে কলিকাল্ !

(৫)

হায় কি হলো—কপাল পোড়া, উমেদারের্ পেসা
পড়্‌লো চাপা, জাঁতার্ তলে—সাহেব বড় গোসা !

অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর কি হলো তায়!
এ পোড়া ছাই "ইল্‌বার্টবিল্" কেন হায় হায়!

(৬)

দেশের্ দশা হায় কি হলো—বিলেত্ গেলো রমা,
তিন্ দিন্ না যেতে যেতে—খ্রীষ্ট ভজে, ওমা!
পুরুষ্ পাছে মেয়ে আগে—সুফল্ তাতে ফলবে না,
চাই এ দেশে, আর্ কিছু দিন্, এ দিশী "জানানা"!

(৭)

হায় কি হলো—আকাল্ এলো আবার্ ধ্বজা তুলে,
রাজার্ পুণ্যে প্রজার্ কুশল—লেখাই আছে মূলে!
তাদের আবার্, হায় কি হলো—অন্ন যাদের ঘরে?
জমিদারের গলা-টিপে স্বত্ব চুরি করে!
"টেনেন্সিবিল্" নামে আইন্ হচ্চে তৈয়ের্ করা,
গয়া-গঙ্গা-গদাধর্—ভূস্বামী প্রজারা!

(৮)

হায় কি হলো—কথায় দোষে সুরেন্ গেলো জেলে!
ইংলিস্‌ম্যানে "কন্‌টেম্পট্" ও "সিডিসন্"ও চলে?
আহেল্ বেলাত্ মরিস্ সাহেব ধর্ম্ম-অবতার,
দেশের্ ছেলে খেপিয়ে দিয়ে কল্লে একাকার!
ফিন্‌কি ছুটে ভারত্ জুড়ে আগুণ্ গেলো লেগে;
হায় কি হলো—ছেলে গুলো পুলিস্ দিলে দেগে!

(৯)

হায় কি হলো—বঙ্গদেশের্ কপাল্ গেলো ফিরে,
গুলি পূরে গোরা ফউজ্ দাঁড়িয়ে বারাক্‌পুরে!
আস্‌চে সুরেন্ ঘরে ফিরে—এইত কথা সাদা,
এতেই এতো আড়ম্বরি—ইংরেজ কি গাধা!

(১০)

বোঝে যারা "হায় কি হলো"—তাদের কাছেই বলি,
"ন্যাসনেল্ ফনের্" ব্যাপার্‌টা নয় কি ঢলাঢলি?
পরের অধীন্ দাসের জাতি "নেসেন্" আবার্ তারা?
তাদের্ আবার্ "এজিটেসন্"—নরুন্ উঁচু করা!

(১১)

হায় কি হলো—দলাদলি বাধ্‌লো ঘরে ঘরে!
পার্টি-খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত্-রাজ্য পরে!

সবাই "লীডর্"—কর্ত্তা স্বয়ং—আপনি বাহাদুর্,
কতই দিকে তুল্‌চে কতো কতইতরো সুর !

(১২)

হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম্ দেছে ছেড়ে !
হায় কি হলো—দেশ্‌টা গেছে "সাপ্তাহিকে" জুড়ে !
হায় কি হলো—ভূদেব্ গেলো, ছেড়ে গুরুগিরি !
হায় কি হলো—হেম্ নবীনের্, নাইকো জারিজুরি !

(১৩)

সবার্ চেয়ে হায় কি হলো—ওই যে হাসি পায়,
"হেষ্টি-পিগট্" মিষ্টি কথা—"মিষ্টিরি" তলায় !
কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি—"ন"জ্জার্ কথা বড়,
পাদ্‌রী হয়ে উভয় দলে—রগড় ভারী দড় !

(১৪)

হায় কি হলো—আধ্‌খানা মাঠ্ জুবার্ট নেছে ঘেরে !
বিষয়টা কি, বুঝ্‌তে নারি কাণ্ডখানা হেরে !
আদ্দেক্ বাড়ী সহর্ মাঝে হচ্চে ম্যারামৎ ;—
শুন্‌তে ভালো "এক্‌জিবিসন্"—এক্ জনার্ কিস্‌মৎ !
দেশের্ শিল্পী কারিগুরি শিখ্‌বে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দুদিন্ বাদে মর্‌বে এদিশীরা !
হাস্‌বো কত—"এক্‌জিবিসন্" দেশের্ ভালো করে !
খেতে অন্ন নাইক যাদের্—একি তাদের্ তরে ?

(১৫)

হায় কি হলো, দাঁড়াই কোথা ?—ইংরেজে ইংরেজে
তুমুল্ কাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মল্লসাজে !
বল্‌চে যত "কলোনিরা" আম্‌রা হিস্যে চাই,
ভাগ্‌বসাবে "অষ্ট্রেলিয়া" অন্য কথা নাই !
এ দিশী ইংরেজে সবাই বাঁধ্‌ছে আবার্ দল্,
রাখ্‌বে ভারত্ নিজের হাতে—দেখিয়ে বাহুর্‌বল !
"ইংলিস্‌ম্যানে"র ফরেল্ সাহেব কচ্চে "কম্যাণ্ডরি",
পেছন্ থেকে পাইওনিয়ার্ হাঁকচে হাওলদারি !
বাপ্‌রে-বাপ্—কি চেহারা "ভলণ্টিয়ার্"গণ
সাঙ্গিন্ হাতে দাঁড়িয়ে গেছে—কাঁপচে কলা-বন্ !
আর্ কি থাকে রাণীর্-রাজ্য ?—নীলকর্, চা-কর্

দিচ্চে সাড়া সাজিন্ খাড়া—উঁচিয়ে হাতিয়ার্!
ছেড়ে দেবে ছর্‌রা-ভরা—পাখী-মারা "গন্,"—
ছুলাখ্ সেপাই উড়ে যাবে—"আর্ম্মি"—"সেলর"-গণ!
তাই ত বলি "হায় কি হলো"—রাজ্য আলমগিরি!
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস্ বলিহারি!
বুঝ্‌বে যদি "হায় কি হলো"—পয়সা কটি দিও,
যত্ন ক'রে বঙ্গদর্শন কাগজ্ খানি নিও!!

দশমহাবিদ্যা।*

(গীতি কাব্য।)

হেম বাবুর এই অপূর্ব্ব কাব্য বুঝাইবার আগে, সাধারণতঃ কাব্য সম্বন্ধে কয়টী কথা বলিতে হইতেছে।

কাব্য পড়ি কেন? কেহ কেহ বলেন ভাল লাগে বলিয়া,—কেবল আমোদের জন্য। তাঁহাদের মতে কাব্য সৌন্দর্য্যের ষোলকলা চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিয়া বিমল আনন্দ বিতরণ করে; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। অন্য এক শ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন, উদ্দেশ্যহীন কিছুই এ সংসারে হইতে পারেনা। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য,—সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি; এবং সেই সৃষ্টি সহায়ে, চিত্ত শুদ্ধি বিধান করা কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য। সুতরাং উদ্দেশ্য এবং সফলতার কথা ধরিলে, এ সংসারে কাব্যের ন্যায় মঙ্গল বিধাতা আর কেহ নহে। দেখা গেল, দুই শ্রেণীর কাব্য রসজ্ঞেরাই আসলে এক মত,—কাব্যের প্রাণ যে সৌন্দর্য্য, কেহই ইহা অস্বীকার করেন না। প্রথমোক্ত সমালোচকেরা কিন্তু উদ্দেশ্যের কথা শুনিলে বড় চটিয়া যান। তাঁহারা বুঝেন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এসব সাংসারিক কথা। সাংসারিক ক্ষতি, লাভ গণনার মধ্যে কাব্য আনিয়া ফেলা ঘোর হৃদয়হীনতার কায। তাঁহারা স্বীকার করেন, পবিত্রতার অতিরেকে সৌন্দর্য্য মাত্র তিষ্টিতে পারে না—প্রকৃত কাব্য জন্মিতে পারেনা। কিন্তু তথাপি, পবিত্রতা বা নীতি অথবা সত্য বিশেষ যে কাব্যের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে, সেটা তাঁহাদের অসহ্য।

* শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজার ২০৯ নং ভবনে ষ্টানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৮২।

কাব্যের উদ্দেশ্য আমোদ, কিন্তু আমোদ কি? আমোদের পরিণাম কি? যাত্রার কালুয়া ভুলুয়ার অশ্লীল আমোদে অন্যে আমোদ পায়,—আপনি বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হন কেন? অতএব আমোদে পবিত্রতা চাই।—আমোদের ও উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধিবিধান; আমোদ আমাদিগকে নীচতার পঙ্ক হইতে মহত্ত্বের স্বর্গে উন্নত করে। মনুষ্যের সুখ বৃদ্ধি করিয়া, মনুষ্য জীবন উন্নত করে বলিয়াই আমোদের এত উপযোগিতা এবং এত প্রয়োজন। কাব্যের আমোদ অনর্থক কেন হইবে? ইতিহাস বা বিজ্ঞান, দর্শন বা ব্যবস্থাশাস্ত্র, মনুষ্য জাতির অশেষ উন্নতির পরিপোষক—কাব্য নহে কেন?

একটু আশঙ্কা হয় বটে যে, চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে, সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ বিধান করিতে গেলে, কবি নীতি লইয়া বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে,—কাব্য লোপ পাইবে। কবি ও সমালোচকের কার্য্য যে বিভিন্ন, এই সমালোচকগণ তাহা ভুলিয়া যান। যাহা সত্য, যাহা নীতি সুতরাং যাহা কোন মহদ্ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, কবি তাহাই কাব্যে পরিণত করেন; কবিতার আত্মার তাহাই অনুপ্রাণিত করেন। তার পর তাঁহার সমালোচক আসিয়া, সেই সৌন্দর্য্য এবং সেই নীতির বিশ্লেষণ করিয়া কবির অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন।

"দশ-মহাবিদ্যা" বুঝিতে হইলে এই কথা কয়টি মনে রাখিতে হইবে। যে মহাতত্ত্বের ভিত্তিতে এই গীতিকাব্য দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক্ষণে evolution বা ক্রম-বিকাশ নামে সুপরিচিত। আমাদের কবি "বৃত্রসংহার" কাব্যের নানাস্থানে জড়জগতের বিকাশ মাত্র দেখাইয়াছিলেন—লাপ্লাস্ এবং হর্বটস্পেনসরের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক জড়সৃষ্টিতে তিনি কাব্যের মোহ সিঞ্চন করিয়াছিলেন। উপস্থিত কাব্যে তাঁহার লক্ষ্য—জীবজগতের বিকাশ। সেই বিকাশ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া তিনি মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন।

কাব্যের প্রারম্ভে সতীশূন্য কৈলাসের দৃশ্য। সতীদেহ ছিন্ন হইয়াছে। সতী-শোকে কৈলাসপুরী আজ "অন্ধকার, বিঘোর ভুবন।" কৈলাসের সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য "সতী মুখ বিভাসিত" আলোক অভাবে মলিন। স্বয়ং বামদেব গভীর শোকে মগ্ন। এই শোক-গাম্ভীর্য্যের পরিমাণ হয় না। কবির নিজ ভাষায় সে চিত্র দেখান যাইত, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। ক্ষুদ্র কাব্য;—পাঠক মহাশয় অল্প সময়ে পড়িয়া শেষ করিতে পারিবেন। আর এই কাব্যের আগাগোড়া অনন্ত গম্ভীর কবিতার সারি।—উদ্ধৃত করিতে হইলে সবগুলি করিতে হয়।

সেই শোক গাম্ভীর্য্য হইতে পবিত্রতা আসিয়াছে। যতক্ষণ শোকের বেগ তীব্র উচ্ছ্বাসময়, ততক্ষণ শঙ্করের চক্ষে সতী সেই চির পরিচিতা, সুকুমারতনু গৃহিণী মানবী:—

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, কক্ষে কভু তুলি হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর
মমতার আভাস যেমন॥

কিন্তু নারদের অনন্ত গীতি মহিমায় সে মোহাবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল—উদ্ভ্রান্ত প্রেমে স্থিরগাম্ভীর্য্য জন্মিল। তখন বামদেব "ঈষৎ হাসিতে অধর মণ্ডিত" করিয়া নারদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

অহে ভক্তিমান্, ভ্রান্তি বিলাসে
শিবেরো প্রমাদ ঘটনা।
অনাদ্যা রূপিণী ভব প্রসবিনী
সতীরে মানবী ভাবনা!

অতঃপর এই কাব্য মধ্যে সতীর মানবী-রূপ আর কোথাও দেখা যায় না—তিনি সর্ব্বত্র সেই "অনাদ্যা রূপিণী ভব-প্রসবিনী।" কঠোর নাস্তিক প্রিয়জন বিরহে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করেন,—কেননা সে স্বর্গ প্রেম এবং বাসনার সৃষ্টি। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ কোমৎ কবিত্বময় মহাধর্ম্মের ভিত্তি পত্তন করিলেন, স্ত্রী জাতিকে আরাধ্যা দেবী বলিয়া সম্মানিত করিলেন। এ পবিত্রতা, এ কবিত্ব, এ মহানুভাবকতার মূলে সেই বাঞ্ছিত বিচ্ছেদ। ভালবাসাতেই স্বর্গ; তার পৃথিবী, স্বর্গ নাই। সুতরাং এই কাব্যের প্রভাতে, এই শোক দুঃখের বিশেষ প্রয়োজন। নহিলে দশ মহাবিদ্যারূপের মহিমা বুঝা যাইত না। অনেক কথা প্রহেলিকাবৎ বোধ হইত।

এই কাব্যের নারদ মহানন্দময়, সেই নারদ ঋষিই বটেন,—কিন্তু পুরাণের সেই কলহপ্রিয় নারদ নহেন। বাহিরে তিনি আনন্দময়, ভিতরে ভিতরে জীব দুঃখে অনন্তদুঃখী। মহাদেব যখন সতী-শোকে ঘোর মোহাচ্ছন্ন, তখন তিনি অনন্ত জ্ঞানী ঋষি;—অনন্তের মোহময় গীতি বলে শিব শোকোপনোদনে সযত্ন। কিন্তু সতীশোকে তাঁহার ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতে ছিল;—সতীর মাতৃবৎ স্নেহ স্মরণ করিয়া, সে চরিত্রের অতুলনীয় গৌরব অনুভব করিয়া, গর্ভাগ্নি ভূধরের মত স্থির ছিলেন। শিব যেমন সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন, নারদের শোক প্রবাহ অমনি ছুটিল। দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বুঝাইলেন যে সতীর কখন মৃত্যু হইতে পারেনা,—কেননা তিনিই স্বয়ং আদ্যাশক্তি।

নারদ সেই প্রকৃতিরূপিণী প্রাণময়ী সতী মূর্ত্তি দেখিতে চাহিলেন। তখন মহাদেব নিজ দেহ-মুক্ত হইয়া অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।—এমন দৃশ্য বাঙ্গলা কোন কাব্যে আর কখন দেখি নাই। মিলটন ও সচরাচর দেখাইতে পারেন নাই।

তখন জড় জগৎ হইতে জীব জগতের প্রথম বিকাশ দেখা গেল। অসংখ্য অমেয় জীবকুল;—যেমন করিয়াই হউক সকলেরই বাঁচিবার চেষ্টা। বড় ঠেলা ঠেলি, মারামারি,—অনন্ত জীবনের সংগ্রাম। রোগ, শোক—বিষম বিপত্তির অনন্ত মূর্ত্তি সকল—আপনি আপনি মুহুর্মুহু উছলিয়া উঠিতেছে। সে দেশে মায়া মমতা নাই, সহানুভূতির লেশ মাত্র নাই—কেবল স্বার্থ, কেবল পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভীষণ অত্যাচার! দেখিয়া দেখিয়া নারদ স্তম্ভিত, বিষণ্ণ দিশাহারা হইলেন। একি! যিনি জগন্মাতা, জীব-কুলপালিনী, দয়ার উৎসরূপিনী—তাঁর কি এই কীর্ত্তি? তাঁর এই রূপ! বিশ্বাস হয়না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অবিশ্বাস করি কিরূপে? এইরূপ তর্কে

দার্শনিক স্থির করিয়া বলেন যে ঈশ্বর অপূর্ণ, সসীমশক্তি, নির্ম্মাতা মাত্র,—সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। এ ভ্রম দূর করিবার অধিকার কেবল এক কবির ;—তাঁহার আসন যুক্তিময়-ভীষণ দার্শনিকের বহু উচ্চে। নারদ সেই দার্শনিক,—এখানকার কবি মহাদেব। তিনি দেখাইলেন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কৌশলে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ,—সকলই মনুষ্যের কল্পনাতীত শুভ কামনায় গ্রথিত। প্রত্যক্ষ দেখ, দশমহাবিদ্যারূপ! সেই সতী, অনন্ত প্রকৃতি সকল রূপেরই মধ্যে—অথচ বিকাশ কেমন বৈচিত্র্যময়! তখন নারদ, সেই দারুণ নৃশংস জড় মূর্ত্তির চরম বিকাশ দেখিলেন—মনুষ্য হৃদয়ে।

দশমহাবিদ্যার দশমূর্ত্তিতে মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। তারামূর্ত্তিতে জ্ঞানের প্রথম বিকাশ। তার পর কবি অন্যান্য মূর্ত্তিতে উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ, ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি কমনীয় গুণরাজির সমাবেশ কল্পনা করিয়া, শেষে মহালক্ষ্মীরূপে সর্ব্বজীবে দয়াভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অক্ষরে অক্ষরে যিনি এই বিকাশশৃঙ্খল মিলাইয়া দেখিতে চান, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজ নহে; এবং কবির তাহা উদ্দেশ্যও নহে। আমাদের বিশ্বাস,—"দশমহাবিদ্যার" প্রকৃত গৌরব অনুভূত হইতে দিন লাগিবে। সুতরাং এক অর্থে এই গীতিকাব্য বর্ত্তমান সময়ের ঠিক্ উপযোগী নহে।

নারায়ণ।

The Great Being is by its very nature the expression of the whole order of things—not merely of the order of man but of the external world. Catechism 74.

Humanity is (i) Single, immense, eternal, real, (ii) destined to constant development under sociological laws, (iii) subject to biological and cosmological necessities, (iv) and prime mover of the existence of individuals and societies. (v) Our affections, thoughts and actions rest on it. (vi) Its compound existence is founded on the free concurrence of independent wills: discord tends to dissolve it, and it requires the preponderance of the heart over the intellect. (vii) Its struggles (against environing necessities) excite our benevolence, its power and blessings awaken

our veneration and in any case it is sustained by our love. (viii) It also excites our activity, the aim being its preservation and amelioration. (ix) As an object of contemplation it gives expression to the whole order of things, studies that order and perfects it, and thus comes home to our bosoms : our feelings, conceptions and activity. (x) It suggests of itself the sacred formula of its worship—Love our principle (*i. e.* of our life). Order (the immutable order of the world and of man) the Basis (*i. e.* of our thoughts) and Progress (*i. e.* the development of that order) the End (of our activity.)

See CATECHIEW p. p. 63-64.

সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত দুএকটী বিরুদ্ধ কথা সপক্ষের নিকট প্রসন্নচিত্তে শ্রবণ করা হিন্দুর পক্ষে শ্রেয়। প্রস্তাবিত বিষয়ের ন্যায় গুরুতর কথায় সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রত্যাশা করা ভুল। নারায়ণ সর্ব্বভূতময়। আমরা তাঁহাকে আত্ম-প্রলয়কারী মনে করিতে পারি না। প্রারব্ধ। প্রারব্ধ অঙ্গীকার করিলে হিন্দুধর্ম্মের হানি হয় না। কাল ও স্থল। নববুদ্ধিতে নারায়ণ প্রধান কল্পে নরসমষ্টির এবং গৌণ কল্পে অনর বিষয়ের অধিষ্ঠাতৃ। সামীপ্য এবং সাযুজ্য। অনর বিষয় নরাশ্রিত অথবা নরবিচ্ছিন্ন। নারায়ণকে নরবিচ্ছিন্ন বিষয় হইতে পৃথক রাখিয়া ভাবনা করিলে সাযুজ্য প্রগাঢ় এবং সামীপ্য সাধন বুদ্ধিও চেষ্টার আয়ত্ত হয়। ইহাতে নারায়ণের অনাদি-অনন্তপ্রকৃতির কোন হানি হয় না। সর্ব্ব প্রলয় অপ্রসিদ্ধ। কালের গতি, উন্নতিমার্গে চক্রাকৃত নহে। কালচক্রাকারে নারায়ণের আনন্দও পুষ্টি সাধন। ব্যবস্থা। "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।" নিয়ম ও ব্যবস্থা, ব্যবস্থা ও উন্নতির সম্বন্ধ। স্নেহ ঘটিত সামীপ্য-সাধন-ব্যবস্থা। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা। সঙ্কল্প ও সাধন। সত্য, বিশ্বাসের, এবং বিশ্বাস স্নেহের প্রসবিতৃ। নারায়ণের ধ্যান হইতে তদীয় বীজমন্ত্র উদ্ধার।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পাঠক "নারায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু বাস্তবিক গুরুতর অসন্তোষের কোন কারণ নাই। লেখকেরা পাঠকের সেবাতেই অনুরক্ত; এমন কি, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলেও মার্জ্জনার পাত্র। কেননা এখনও এই শ্রেণীস্থ সেবক সংখ্যা এতদ্দেশে তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। আমি হিন্দু পাঠকের উদ্দেশেই লিখিতে বসিয়াছি; এবং হিন্দুগণকে অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার বাসনাও করি না। যে ব্যক্তি স্বয়ং সমাজ হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করে না, সে অন্যকে স্থানচ্যুত করিয়া কোথায় রাখিবে? আমি যদি হিন্দুমণ্ডলীর বিচারে পতিত হই, তথাচ আমি সপক্ষ। সপক্ষের কথা শ্রুতি-কঠোর হইলেও শুনা আবশ্যক। যদি তাহা গ্রাহ্যযোগ্য হয় তাহা হইলে লাভের বিষয়; আর যদি ভ্রান্তকথা ব্যক্ত করি, তবে আমার ভ্রম দূরীকরণ করা—পতিতের উদ্ধার করাও—আবশ্যক বটে।

তর্ক করিতে হইলে অগত্যা কতকগুলি মূল সূত্র অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যে সকল বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ, তাহার মূল সূত্র অবধারিত করাও কঠিন। ঈশ্বর আছেন কি না; তাঁহার গুণাগুণ কি? পাপ পুণ্যের ভেদ কি, আদি কোথা হইতে? কার্য্যকারণের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহার অবধি কাহাকে বলে? প্রারব্ধের ব্যত্যয় হয় কিনা, নিয়তির সপক্ষে বা বিপক্ষে কার্য্য করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কি না? সুখদুঃখের নিয়ম কি এবং আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার উপায়ই বা কি? এতাদৃশ বিষয়ের বিচারস্থানে সকল কথাতে মতভেদ স্বীকার পূর্ব্বক বাদানুবাদ করা বিড়ম্বনা মাত্র। লোকে আত্মমতের সমর্থন শুনিতেই ভাল বাসে; কিন্তু এরূপ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য প্রত্যাশা করাই অসঙ্গত। সুতরাং তর্ক করাতে ফল এই হয় যে, লোকে লেখকের গূঢ় সপক্ষতা ভুলিয়া গিয়া কেবল তাঁহার মতভেদ দেখিতে পায়। যেখানে যত ঐক্য প্রত্যাশা কর, সেই খানে মতভেদগুলিও যেন সেই প্রত্যাশার অনুপাতক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অনুভূত হয়, এবং অনেক সময়েই গৌণ বিষয়ের মতভেদ হেতু মুখ্য বিষয়ের ঐক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব এরূপ গুরুতর বিষয়ের আন্দোলনস্থলে এই সকল পরিণাম লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত পাঠকের সমীপে এত বাহুল্য উক্তি করিতেছি।

অতএব হে পাঠক! আমি সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ে—অন্য কি স্বয়ং নারায়ণের বিষয়ে—দুচারিটী অপ্রসিদ্ধ কথা বলিলেই আমার প্রতি বক্রভাব অবলম্বন করিও না। আমি তোমার সপক্ষ। বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে যুগবিপ্লব উপস্থিত তাহার জন্য তোমারই ন্যায় ব্যথিত। এতাদৃশ ভয়ানক সময়ে স্থিরচিত্তে বাদানুবাদ করাই নিতান্ত আবশ্যক। আমি উপায়ান্তর না পাইয়াই নারায়ণের অবয়ব সঙ্কীর্ণ করিবার প্রস্তাব করিতেছি। প্রশান্ত ভাবে অভিনিবেশ কর; দেখিতে পাইবে যে ইহাতে অনুমোদন করিলে উপাসনা, মুক্তি এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ বিষয়ে কোন বিঘ্ন হইবে না, বরং উপকার হওয়াই সম্ভাবিত। এই উপায় ব্যতীত ইদানীন্তন সর্ব্বগ্রাসক প্রচণ্ড তর্কস্রোত কিছুতেই নিবারিত হইবে না।

নারায়ণ, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি, প্রকৃতি-পুরুষ, ইত্যাদি যত কিছু মূল সূত্রের কথা বল, সমস্ত লইয়াই এতদ্দেশে নানা বিতণ্ডা হইয়াগিয়াছে। সেই সকল অসংখ্য মতামতের উপরে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির একটী তর্কের কথা উপস্থিত হইলে, প্রচলিত সনাতন ধর্ম্মের কিছু মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি প্রচলিত মতের শত্রুতা করিতে ইচ্ছা করি না বরং তাহার দৃঢ়তা সাধন করাই আমার চেষ্টা। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা এতাদৃশ চেষ্টাতে আপাততঃ বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু সঙ্গত মতে আপত্তি করিতে পারেন না। তবে যাঁহারা সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন—এমন কি, কোন ধর্ম্ম অবলম্বনেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না; যাঁহাদিগের ধর্ম্মাভাব তাঁহারা নিজেই

জানেন না, এরূপ ব্যক্তির এতাদৃশ অভাব মোচন—এতাদৃশ মৃগতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন—আমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী কোন ব্যক্তি যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন তবে তাঁহাকে এই অনুরোধ করি যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে তিনি কিরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে বাসনা করেন, তাহা মনে মনে কতক রচনা করিয়া—আমার কথা শ্রবণ করেন।

আমি প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত মতটী পাঠককে স্মরণ করিতে বলি। হিন্দুধর্ম্মানুসারে নারায়ণ সর্ব্বভূতময়। তিনি দ্বৈত কি অদ্বৈত, দ্বৈত কাহাকে বলে, অদ্বৈতবাদ মতে মায়ার লক্ষণ কিরূপ? এ সকল কথা লইয়া যে সকল তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রকাশ হইবে যে, নারায়ণ বল কি পরব্রহ্ম বল, যে নামেই তাঁহাকে ব্যক্ত কর, তাঁহাতে সর্ব্বভূতময়ত্ব সংযোগ করিলে হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ হইবে না।

"জগদীশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা।" এই বিষয়ে দুই একটী কথা বক্তব্য আছে। যিনি সর্ব্বভূতময়, তাঁহার নিকট সৃষ্টি এবং প্রলয় বাস্তবিক অভিন্ন বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকাতে বীজ বপন করিলে তাহা মৃত্তিকাসাৎ হয় বটে কিন্তু তাহা হইতেই অঙ্কুর উদ্ভব হইয়া অসংখ্য বীজ উৎপাদন করে। ইহার কোথায় প্রলয়ের অন্ত এবং কোথায় সৃষ্টির আরম্ভ হইল তাহার নির্দ্দেশ করা অসাধ্য। সুতরাং অনন্তব্যাপী নারায়ণ প্রধানতঃ পালনকর্ত্তা বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট সৃষ্টি কেবল স্থিতির রূপান্তর মাত্র। এবং প্রলয় যেন স্থিতি পরম্পরার সন্ধি স্থল। এরূপ সৃষ্টি ও প্রলয়, স্থিতির অবান্তর বিষয় মাত্র। আমি নারায়ণ সম্বন্ধে এখন এ অবান্তর কথার প্রসঙ্গ করিতেছি না। সমগ্র সর্ব্বভূতের আদ্যন্ত স্বরূপ যদি কোন সৃষ্টি প্রলয় থাকে, তবে তাহারই কথা বলিতেছি। তাহার বিষয় হিন্দুগণ মধ্যে বড় আলোচনা হয় না।

ফলতঃ আমাদিগের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে সর্ব্বকারণ পরব্রহ্মকে বুঝায় না। তদপেক্ষা হীন এবং অবান্তর কারণ বিশেষকেই বুঝিতে হয়। এই "কারণ" শব্দ প্রয়োগ স্থলেও কিঞ্চিৎ সতর্কতা আবশ্যক। কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা লইয়া মতভেদ আছে। সৃজন একটী কার্য্য বিশেষ, সুতরাং সর্ব্ব কারণের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার একতা, বিচার সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে অনাদি কারণকে সর্ব্বভূতময় নারায়ণ হইতে বিভিন্ন করিলে অদ্বৈতবাদের প্রতিকূলতা করা হয়। আবার কারণের লক্ষণ ধরিতে গেলে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাতে ব্যাপৃত হইতে হয়। অতএব সৃষ্টিকর্ত্তা এবং জগৎকারণ ইত্যাদি সংজ্ঞা নারায়ণ হইতে আপাততঃ পৃথক করিলে ক্ষতি দেখা যায় না।

নারায়ণ সর্ব্বভূতময় বলিয়াই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। কেবল প্রলয়কর্ত্তা মহাকাল সম্বন্ধীয় কোন কোন লক্ষণ লইয়া একটী প্রচণ্ড বৈরিতা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বভূতময় নারায়ণকে সর্ব্বপ্রলয়কারী বলিলে কএকটী কুতর্ক উপস্থিত হয়। যে আদি পুরুষের অন্ত

নাই, তাঁহা হইতে স্থিতির সহকারী সৃষ্টি কি প্রলয়কর্ত্তার উদয় হইতে পারে। কিন্তু তাহা অবান্তর বিষয় মাত্র। নারায়ণ হইতে উদ্ভূত প্রলয়কে সর্ব্বপ্রলয়কারী মনে করিলে সেই পরম-তত্ত্বের অস্তিত্ব বিষয়েও ব্যাঘাত হয়। ইহা নিবারণ করা আবশ্যক বলিয়াই পাঠককে সতর্ক করিতেছি। বৈষ্ণবের সহিত শাক্ত ও শৈবের বিবাদ সকলেরই বিদিত আছে। এবং আহ্লাদের বিষয় এই যে সেই বিবাদ এখন সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তৎসংক্রান্ত নিগূঢ় কথাগুলি বিলুপ্ত হইবার নহে। শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞের সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু পরাজয় এবং তদনন্তর পরস্পরে সন্ধি বিষয়ক বৃত্তান্ত এই সকল গভীর কথার রূপক বিশেষ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সকল কথার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, নারায়ণকে আমরা আত্মপ্রলয়কারী মনে করিতে পারি না।

উল্লিখিত বাক্য হিন্দুধর্ম্মবিরোধী হইল কিনা একথা সংশয়ের স্থল। আমি মনে করি যে উহাতে আমাদিগের মূলতত্ত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না। অথচ আমার অনুমান এই যে, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেই হিন্দুধর্ম্মবিরোধীগণের সমস্ত কুতর্ক নিরসন করিতে পারা যায়। ফলতঃ এই বাক্য রক্ষাপূর্ব্বক আমরা উপাস্য বিষয়ের যে মূর্ত্তি ধ্যান করিতে পারি, তাহার সম্বর্দ্ধনা করাই আমার উদ্দেশ্য। এস্থলে তিনটী কথার প্রতি-লক্ষ্য করা আবশ্যক হইবে। নারায়ণকে আত্মপ্রলয়কারী মনে করিলে ক্ষতি কি; না করাতে লাভ কি এবং প্রস্তাবিত বাক্যটীর মর্ম্ম কি।

তিনটী কথার মধ্যে প্রথম কথার বিচার করিব না। আমি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সপক্ষ, এইজন্য প্রচলিত বিশ্বাসের ক্ষতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটাইতে অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ এই তর্কদ্বারা উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই নিমিত্ত ধ্বংসভাগ পরিত্যাগ করিয়া সংগঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছি। কি ধ্বংস করিলাম তাহা বিচক্ষণ পাঠ-কেরা স্ব স্ব বিচারমতে স্থির করিবেন। এবং ভরসা করি বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন, যে এমন কোন গুরুতর অঙ্গ হানি হয় নাই।

নারায়ণের এই প্রলয়কারীত্ব লক্ষণ ত্যাগ করিলে যে সকল লাভ হইবে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। অতএব প্রথম সূত্রে ঐ প্রলয়কারীত্ব লক্ষণটীই কি, তাহার প্রতি অভিনিবেশ করা আবশ্যক।

একটী গৌণ কথা লেখকের অভিপ্রায় জ্ঞাপক বলিয়া এখানে উত্থাপন করি-তেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল কথা তর্কের দ্বারা সমর্থন করিতে হইলে বিচার করা অসাধ্য হয়। অতএব হিন্দুধর্ম্ম-ঘটিত যে একটী বিরুদ্ধাচরণ স্পষ্টাকারে ভাবনা করিয়াছি এবং যে ভাবনাপ্রযুক্ত এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, তাহা অগ্রে ব্যক্ত করাই ভাল।

আমি "প্রারব্ধ" অগ্রাহ্য করিয়া উপস্থিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রারব্ধ মানিলে সকলকেই ক্রিয়াশূন্য নিরুদ্যম হইয়া বসিতে হয়। যদি প্রারব্ধ সত্য হয়, তবে যাহা মনে করিবার তাহা পাঠক

স্বভাবতঃই মনে করিবেন, এবং তাহার জন্য আমার প্রবন্ধ পাঠের অপেক্ষা থাকিবে না; সুতরাং আমার প্রবন্ধ লেখাও নিষ্প্রয়োজন হইবে। কিন্তু আমি কোন্ ছার, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রবেত্তাগণের পরিশ্রমও নিরর্থক হইবে। প্রারব্ধ মানিলে রোগীর চিকিৎসা করা আবশ্যক হয় না; যোগাভ্যাসকেও বিফল বলিতে হয়। অন্য কি, যাঁহারা প্রারব্ধ মানেন, তাঁহারা সকল সময়ে এক মত রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা একদিকে জন্মপত্রিকা লিখাইবার জন্য জ্যোতির্বেত্তার নিকটে গমন করেন, আবার তাঁহারাই সেই কাগজখানির অন্যথা করাইবার জন্য গ্রহাচার্য্যেরও সেবা করেন। অতএব জিজ্ঞাস্য যে গ্রহগণ শ্রেষ্ঠ না প্রারব্ধ শ্রেষ্ঠ? যদি উভয়ের ঐক্য থাকে, যদি গ্রহগণ কেবল প্রারব্ধের সাক্ষীমাত্র হন, তবে তাঁহাদিগের তুষ্টিসাধনে লাভ কি? লোকে প্রারব্ধের পূজা কখনই করে না। করা বিফল। আর যদি গ্রহগণই প্রকৃত বিঘ্নবিনায়ক হন, তবে প্রারব্ধের আধিক্য কোথায়, আর নারায়ণের প্রাধান্যই বা কিরূপ?

সঙ্কটস্থল এই যে, সর্ব্বভূতময় নারায়ণকে একাধারে স্থিতি এবং প্রলয় উভয়ের হেতু মনে করিলে, অগত্যা প্রারব্ধ মানিতে হয়। প্রলয়, হয় কেবল নারায়ণের সহযোগী নতুবা স্বয়ং নারায়ণের হননকারীও বটে। আর নারায়ণের সহযোগী প্রলয় কার্য্যকে, স্থিতি এবং সৃষ্টির অঙ্গ ব্যতীত মনে করা যায় না। প্রলয় মাত্রেই পরিবর্ত্তন থাকিবে; পরিবর্ত্তন মাত্রই পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী ব্যাপার মধ্যে অন্যথাবিহীন নিয়ত সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি প্রলয় এবং পরিবর্ত্তন মধ্যে বিভেদ থাকে, তবে প্রলয়ের সেই বিশেষ লক্ষণ নারায়ণের পক্ষে সহকারী না বিপ্লবকারী? জগতের স্বভাবসিদ্ধ পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তিতা হইতে যে লয় বা উদ্ভব হয়, তাদৃশ পরিবর্ত্তনের জন্য নারায়ণের চেষ্টা বা স্পৃহার আবশ্যকতা থাকে না; কিন্তু তদ্বহির্ভূত কোন পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহা বিকারবিহীন নারায়ণের সহযোগী বলিয়া গণ্য হইতেপারে না। সুতরাং নারায়ণের সহযোগী প্রলয় এবং জগতের স্বভাবসিদ্ধ পরিবর্ত্তন অভিন্ন, এবং উভয়ই নিয়তির বশতাপন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু নারায়ণের অপেক্ষা না করিয়া সমগ্র প্রলয়ের লক্ষণ চিন্তা করিলে তাহা হইতে তাঁহার লয় ও বর্জ্জিত থাকে না। এতাদৃশ প্রলয় স্বীকার করিলে তাহার আবার নিয়ামক চিন্তা করা আবশ্যক হয় এবং যাহাকে প্রারব্ধ নামে স্বয়ং নারায়ণের নিয়ন্তা বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহাকে সেই শ্রেষ্ঠপদে বরণ করিতে হয়। আমি নারায়ণের লয় এবং তাঁহার নিয়ন্তাস্বরূপ প্রারব্ধ এতদুভয় ভাবনাকেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি।

বাস্তবিক, ধর্ম্ম বিষয়ক যে সমস্ত মতভেদ বিদ্যমান আছে, তাহার অধিকাংশ এই সঙ্কট হইতে উৎপন্ন হয়। আমি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইব না বলিয়া বলিয়াছি যে, সর্ব্ব ভূতান্তর্গত লয় পরিবর্ত্তনাদি মধ্যে যদি নারায়ণের আত্ম-

প্রলয়রূপ কোন প্রকার প্রলয় থাকে, তবে তাহা অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য এবং তাহারই পোষকতার নিমিত্ত পাঠককে প্রারব্ধ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

স্থূল কথা এই যে, যেমন নারায়ণের প্রলয় মনে করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ নারায়ণের কোন নিয়ামক কল্পনা করাও অবৈধ। জগতের স্থিতি ও পরিবর্ত্তন বিষয়ক যে নিয়তি নারায়ণের আনুষঙ্গিক, তাহার প্রতি কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে প্রারব্ধ নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদে বাচ্য, তাহা তাঁহার নিয়ামক স্রষ্টা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াই হউক কিম্বা তাঁহার প্রলয়কর্ত্তা বলিয়াই হউক, উভয় পদেই অগ্রাহ্য হইতেছে। প্রারব্ধ যদি নারায়ণের সহিত অভিন্ন হয়, আর নারায়ণকে যদি সর্ব্বভূতময় বল, তবে প্রারব্ধ সর্ব্বভূতের পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ন্তা হইতে পারেনা। আর যদি প্রারব্ধ সর্ব্বভূতের পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ন্তা হন অথচ তাঁহাকে নারায়ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া মানিতে হয়, তবে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী নিয়মিত বিষয়াদিকে তাঁহা হইতে বিভিন্ন বলিতে হয়। অর্থাৎ নারায়ণ সর্ব্বভূতময় হইতে পারেন না, আর নারায়ণ এবং সর্ব্বভূত সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে হয়। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কেহ কেহ সর্ব্বভূতকে মায়াময় বা কাল্পনিক বলিয়া ব্যক্ত করেন। কিন্তু সর্ব্বভূতের অস্তি-নাস্তি অস্বীকার করিয়া এই মায়া-নামক বুদ্ধির অগম্য তৃতীয় একটী কথা আনিলে বিশেষ বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হয় না।

আবার দেখ, কাল এবং স্থূল (আকাশ?) মহত্তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, স্থূলের-আধেয় সর্ব্বভূৎ অর্থাৎ তন্মাত্র-নারায়ণ। কিন্তু কাল কি পদার্থ? যদি ইহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার কর, তবে সর্ব্বভূতের স্থিতি এবং প্রলয় উভয়কেই কালের অন্তর্ভূত বলা যাইতে পারে। সেই কাল পুরুষপদে মহাকাল এবং প্রলয়কর্ত্তা, আর স্ত্রীপদে কালী করালবদনী আদ্যাশক্তি নামে বাচ্য হন। কিন্তু সত্যই কি কাল, স্থূল হইতে স্বতন্ত্র? স্থূল বস্তুর অন্যান্য লক্ষণ বিবিক্ত করণের (abstraction) ফলমাত্র। এবং কাল আমাদিগের চৈতন্য সমূহ মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ সম্বন্ধ জ্ঞাপক ভিন্ন নহে। অতএব নারায়ণকে সর্ব্বভূতময় বলিলে, কালের স্বাতন্ত্র্য এবং প্রারব্ধ সৃষ্টি ও মহাপ্রলয় সমস্তই ত্যাগ করিতে হয়।

এই সকল কথা ছাড়িয়া সাংসারিক ঘটনাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রারব্ধ ত্যাগের প্রতি বড় কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না। কেবল গ্রহাচার্য্য মহাশয়েরা উত্যক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকদিগের মৃত্যুনিবারণকারিতারও কোন বিঘ্ন হইবেনা এবং হিন্দুধর্ম্মেরও কোন অবমাননা হইবে না। অতএব পাঠক! আমাকে প্রারব্ধের তর্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

এস্থলে পাশ্চাত্য মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য সম্প্রদায় বিশেষের মত স্মরণ করা আবশ্যক। ইদানীন্তন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। এতদ্দ্বারা ইউরোপে নানা নূতন মত উত্থাপিত হইতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটী মত এই যে, ঘটনামাত্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিশেষের অব্যর্থ ফল

মাত্র। আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহা দেহান্তর্গত ও বহির্জ্জগতের ঘটনা সমষ্টির ফল মাত্র। ঐ সকল ঘটনা আবার তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন ঘটনার অনন্য অনুবর্ত্তী। অতএব যত কিছু ঘটনা দেখ, কিছুতেই মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব নাই। আকাশস্থিত ঘুঁড়ির ন্যায় মনুষ্য যেখানে বিচরণ করুন, ঘুঁড়ি যেমন বায়ু, রজ্জু এবং রজ্জুধারীমনুষ্য ইত্যাদি কএকটী বস্তুকে অতিক্রম করিতে পারে না, মনুষ্যও সেইরূপ বৈজ্ঞানিক নিয়মের একান্তানুবর্ত্তী; কস্মিন্‌কালে তাহার একটীও উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্য মণ্ডলী প্রায়ই সকলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা ঈশ্বরকে পুণ্যময়, পাপ-বিমুখ এবং আত্ম প্রতিকৃতি অনুযায়ী নর এবং অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মান্য করেন। সর্ব্বভূতময় ঈশ্বরবাদ, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বিবেচনায় ভ্রান্ত মত। এবং প্রাগুক্ত বৈজ্ঞানিক মত তাঁহাদিগের মধ্যে অভিনব বলিয়া গণ্য। কিন্তু এস্থলে লক্ষিতব্য কথা এইমাত্র যে, যাঁহারা উল্লিখিত মতে বৈজ্ঞানিক নিয়মের পক্ষবাদ করেন, তাঁহারা এখন প্রকারান্তরে সর্ব্বভূতময় ঈশ্বর স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ সর্ব্বভূতময়ত্ব লক্ষণের সহিত প্রারব্ধ বা নিয়তি বিষয়ক মতের অপরিত্যাজ্য সম্বন্ধ। কেবল হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এক প্রান্ত হইতে এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা আর এক প্রান্ত হইতে এই মতের পোষকতা করিতেছেন। অতএব লক্ষণদ্বয়ের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ব্যক্ত করাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যত আক্রমণ হউক না হউক, পাশ্চাত্য মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অসমসাহসী প্রতিকুলাচার হইতেছে বটে।

আমি এস্থলে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে কোন কথা নিবেদন করিতেছি না, সুতরাং যাঁহারা তাঁহাদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার নিকট এতদ্বিষয়ক প্রতিবাদ শুনিতে পাইবেন না। বলিতে কি, তাঁহাদিগের পক্ষে আমার পরিবর্ত্তে, আমার উপদেষ্টাবর্গের হেতুবাদ শ্রবণ করাই বিধেয়। কিন্তু এই অবস্থা অনুধাবন করিলে বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের হৃদ্বোধ হইবে যে, আমি পাশ্চাত্য মণ্ডলীর তর্ক কৌশলে একান্ত বিমুগ্ধ হই নাই।

যাঁহারা নারায়ণকে সর্ব্বভূতময় জ্ঞান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে নরগণের অধিষ্ঠাতৃ বলিতে অসম্মত হইবেন না। অনর-বিষয় নারায়ণবিবর্জ্জিত, এ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। কেবল এই মাত্র বলি যে, যদি সর্ব্বভূতের মধ্যে কোন বিষয় হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন মনে করা যায়, তাহা হইলে নরযোনিকে তাদৃশ বিষয় হইতে বিভিন্ন করা অত্যাবশ্যক। "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান নরের অন্তঃকরণেই সম্ভবে; অনর বিষয়ে কথনই সম্ভবে না। সুতরাং নারায়ণকে মুখ্যকল্পে নরময় বলিলে ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে না। এস্থলে নারায়ণের আত্মপ্রলয়কারিত্ব লক্ষণ ত্যাগকরিবার যে কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা প্রণিধান করা আবশ্যক। তদনুসারে অন্ততঃ নরগণের পক্ষে, নারায়ণমূর্ত্তি হইতে নরযোনির প্রলয়কারী লক্ষণগুলিও পরিত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ পদার্থের রূপান্তর হইলেই তাহার বিনাশ

হয় না এবং মনুষ্যের মৃত্যুতেই যে মহা-কালের আবির্ভাব হয়, একথাও স্বরূপ উক্তি নহে। কিন্তু সমগ্র নরযোনির বিনাশ বিভিন্ন কথা। নরযোনি না থাকিলে নারায়ণকে ধ্যান করিবার পাত্র থাকে না! অন্ততঃ আমরা তাদৃশপাত্র চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং নরের পক্ষে নরযোনিবিচ্ছিন্ন নারায়ণ চিন্তা করা যেরূপ অকিঞ্চিৎকর, নরযোনি প্রলয়কারী নারায়ণের ধ্যান করাও তদনুরূপ। নর ভিন্ন নারায়ণের সাযুজ্য চিন্তা কে করিবে? সুতরাং মানিতে হয় যে, যাহাতে নরনারা-য়ণের সাযুজ্য বিন্দুমাত্র আহত হয়, এরূপ প্রলয়কারী ভাবনা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যিনি চিন্তা করিবেন, তিনি নিজে নর। এস্থলে যাঁহার সমীপগামী হই-বেন, তাঁহাকে নরসাযুজ্যবিমুখ মনে করিলে তাঁহার সামীপ্যলাভ চেষ্টা নিতান্ত অসঙ্গত হয়। একদিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। হয় এরূপ চেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়, নতুবা ঐ চেষ্টার নিমিত্ত বিপরীত ভাবনা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ধর্ম্মার্থে নারায়ণের সাযুজ্য লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নারায়ণকে নরসাযুজ্য বিমুখ মনে করিতে পারেন না। নারা-য়ণ নরের অপরিজ্ঞেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধ্যানান্তর্ভূত নারায়ণ, অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন বিষয়। যিনি ধ্যান করেন, তাঁহার পক্ষে যে চিন্তা অসম্ভাবিত, এতাদৃশ চিন্তার বিষয় মনোমধ্যে আন্দো-লন করা কেবল আত্মবিস্মৃতি মাত্র। নরকর্তৃক নরযোনি প্রলয়কারীকে উপা-সনার্থ ধ্যান করা অসম্ভব এবং সম্ভব হইলেও তাহা আত্ম-বিপর্য্যয়কারী বলিয়া ত্যাজ্য। অতএব সর্ব্বভূতময় নারায়ণের ধ্যান হইতে তদীয় আত্মপ্রলয়কারিত্ব লক্ষণ পরিত্যাগ করা যেমন ন্যায়সঙ্গত, নারা-য়ণের প্রধান অধিষ্ঠানপাত্র নরযোনির প্রলয় বিষয়ে কৃতনিশ্চিত হওয়াও নরের পক্ষে তদনুরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ।

এই প্রণালীতে নারায়ণের ধ্যান হইতে কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিলে, উপাস্য বিষয় কি আকার প্রাপ্ত হইবেন তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। তৎপূর্ব্বে আর একটী কথার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। নর কর্তৃক নারায়ণের ধ্যান উদ্দেশে নরনারায়ণের সাযুজ্যের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক নরমণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের সামীপ্য, হইতে যে সাযুজ্য সম্ভাবিত হয়, নরনারায়ণের সাযুজ্য তাহা হইতে বিভিন্ন নহে। এই কথা বুঝিবার জন্য পাপপুণ্য সংক্রান্ত কএকটী অবান্তর কথার প্রতি কিয়ৎকাল মনসংযোগ করিতে হইবে।

পুণ্যবান্ পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন। পাপিষ্ঠ পুণ্যবান্‌কে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার পাপ বিমোচনের একটী পথ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু স্বভাবতঃ পাপী পুণ্যবান্‌কে দেখিতে পারেনা। অর্থাৎ যেখানে নরগণের মধ্যেও প্রকৃত প্রস্তাবে সামীপ্য বা সাযুজ্যের সদ্ভাব দেখা যায়, সেখানে পুণ্যেরও উদয় এবং বিস্তার হইতে থাকে। আর যেখানে তাহার অসদ্ভাব, তথা হইতে পুণ্যও অন্তর্দ্ধান করে। "অহংব্রহ্ম" ইত্যাকার তত্ত্বজ্ঞানও এই মতের পোষক। তত্ত্বজ্ঞানীর মনে ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। পাপিষ্ঠকে দেখিলে তাঁহার দ্বেষ, ঘৃণা কিম্বা কোন

প্রকার চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না। কিন্তু সেই কারণে যে তিনি স্বয়ং পাপাসক্ত হইতে পারেন, একথাও কেহ মনে করেনা। অতএব সাধু ব্যক্তির আভ্যন্তরিক অবস্থাকে যদি একাগ্রতাবিহীন মনে না করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নারায়ণের সহিত একতা এবং সমগ্র নরমণ্ডলীর সহিত সাযুজ্যভাব অভিন্ন এবং তাঁহরা চরিত্রগত একাগ্রতার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নারায়ণের পক্ষে নর বা সর্ব্বভূতের সহিত সাযুজ্য কিরূপ, তাহা আমাদিগের অপরিজ্ঞেয় বটে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর এইরূপ মানসিকভাব এবং তদনুযায়ী নরমণ্ডলীর সামীপ্য ও সাযুজ্য হইতে আমরা তাঁহার ধ্যানান্তর্গত বিষয় উপলব্ধ করিতে পারি। অর্থাৎ এই প্রণালীতে আমাদিগের উপাস্য বস্তুর লক্ষণ এক প্রকার স্থিরীকৃত করিতে পারি। এতাবত্ সমগ্র নরমণ্ডলীর অন্তর্গত নির্ব্বিকার সাযুজ্য ভাবই নারায়ণের স্বরূপ।

নারায়ণ আত্মপ্রলয়কারী নহেন। সুতরাং যখন তাঁহার অধিষ্ঠানপাত্র নরমণ্ডলী পরস্পরে সাযুজ্য লাভ করে অথবা পরস্পরের সমীপ-গামী হইতে থাকে, ত ন তিনিই যে আপন অংশ নিচয়কে আকর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনাতে বিচিত্র কি? বরং যাহাতে এইরূপ সাযুজ্য কিম্বা সামীপ্যের প্রকৃত ব্যাঘাত হয়, তাহাই নারায়ণের প্রলয়কারী বলিয়া পরিত্যাজ্য হইবে। ফলতঃ নারায়ণের আত্মপ্রলয়কারী লক্ষণ মনোমধ্যে ধারণ করাই অসাধ্য। অতএব নরমণ্ডলীর মধ্যে কোন ভেদোন্মুখ বা প্রলয়কারী লক্ষণ দেখিলে, এই মূলসূত্রের প্রতি দোষারোপ না করিয়া বরং স্থির চিত্তে তাহার তথ্য অনুসন্ধান করাই বিধেয়। অনেক বিষয় আপাততঃ বিভিন্ন কারী, কিন্তু পরিণামে সাযুজ্যের সহায় হইয়া থাকে। বীজ মৃত্তিকাতে বিনষ্ট না হইলে অঙ্কুরের উদ্ভব হয় না। এস্থলে, মৃত্তিকা বীজের প্রলয়কারী নহে। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেই প্রলয় উপস্থিত হয় না; বরং এতদ্বারা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র আলোকিত হইয়া থাকে। অতএব কোন স্থলে সাযুজ্যের অদর্শনে সহসা প্রলয়ের আবির্ভাব মনে না করিয়া বরং তদ্গতচিত্তে নরমণ্ডলীর সাযুজ্য প্রতীক্ষা করা এবং তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া নারায়ণের পালকত্ব স্মরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। ফলতঃ এরূপ করিলে নারায়ণের আত্ম-প্রলয়কারিত্ব লক্ষণের স্থলাভাব না হউক, তাদৃশ স্থল নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব ঐ লক্ষণ ত্যাগ করিতে হইবে, এই পর্য্যন্ত সুস্থির থাকিলেই যথেষ্ট। সর্ব্বদা তাহার আন্দোলনের কোন আবশ্যকতা নাই।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, নরযোনিকেই মুখ্যকল্পে নারায়ণের অধিষ্ঠান পাত্র মনে করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত নর-সাযুজ্যের কথাতে ঐ কথার একটী বিশেষ সারবত্তা লক্ষিত হইবে। নরগণ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ মনের ভাব বুঝিতে ও ব্যক্ত করিতে পারে, নর এবং অনরবিষয় মধ্যে তাদৃশ আলাপ কদাচ সম্ভবে না। সুতরাং নরমণ্ডলীর মধ্যে যে পরিমাণে সাযুজ্য সম্ভাবিত, নর এবং অনর মধ্যে তাদৃশ সাযুজ্য স্থাপনের কোন সম্ভাবনা

নাই। অনরগণ পরস্পরের মধ্যে সাযুজ্যলাভ করে কি না তাহা বলা অসাধ্য। কেননা তাহাদিগের মনের ভাব জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মনুষ্যগণ সাযুজ্য লাভ না করিয়াও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে এবং তাহাতে সামীপ্যের বিলক্ষণ সুযোগ উৎপন্ন হয়। কোন কোন পশু, কীটাদিও ঐ প্রকার সমাজ এবং তদাশ্রিত সংহতি সংস্থাপন করে। তাহাতে যদি কোন সাযুজ্য উৎপন্ন হয়, তবে তাহা নরবিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদিগের পক্ষে গ্রাহ্যযোগ্য নহে। অতএব অনর বিষয় নারায়ণ বিবর্জ্জিত নহে, অথচ নারায়ণের অধিষ্ঠান বিষয়ে নরযোনির সমতুল্য নহে। অর্থাৎ নারায়ণের ধ্যান উপলক্ষে অনর বিষয় গৌণ কল্পনা।

সর্ব্বভূতময় নারায়ণের আত্ম-প্রলয় কারীত্ব লক্ষণ ত্যাগ করা গিয়াছে। ঐ কথার অঙ্গস্বরূপ নরমণ্ডলীর মধ্যে সাযুজ্য ও সমীপগামী ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে নরযোনিকে শ্রেষ্ঠ কল্পে এবং অনর পদার্থকে হীনকল্পে সর্ব্বভূতময় নারায়ণের অধিষ্ঠানপাত্র জ্ঞান করা গিয়াছে। এইরূপ কল্পনা যে যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আর কএকটী কথা স্মরণ করাইয়া দিব।

নারায়ণের অসম্বদ্ধ অনাপেক্ষিক লক্ষণ নরের পক্ষে অপরিজ্ঞেয়। অর্থাৎ নারায়ণের স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না; কেবল মনুষ্যগণ তাঁহাকে যে ভাবে ভাবনা করে তাহাই আমাদিগের আলোচনার বিষয়। এবং নর ও অনরকে যে শ্রেষ্ঠও নিকৃষ্টকল্পে নারায়ণের অধিষ্ঠানপাত্র বলা গেল, তাহাও তাঁহার অসম্বদ্ধ স্বরূপ সম্বন্ধীয় উক্তিনহে। এমন কথা কখনই মনে করি না যে, অনরগণ আপনাদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলে এই কথাতে অভিমত প্রদান করিবে। বরং ইহার বিপরীত কথা তাহাদিগের মনে উদয় হওয়াই সম্ভব। আমি যাহা বলিলাম তাহা নরের চিন্তা সুতরাং তাহা নর সাপেক্ষ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদিগের পক্ষে নরবুদ্ধির বিপ্লবকারী চিন্তা অগত্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এইনিমিত্ত নবসন্নিধানে অনর বিষয়কে গৌণ বলাতে দোষ হয় নাই। পক্ষান্তরে যদি কেহ কল্পনা করেন যে, অমুকঅনর বিষয়ের সহিত নারায়ণের সাযুজ্য অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ়-তর, তবে তাহা এতাদৃশ কল্পনার বিপরীত উক্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সর্ব্বভূতকে নর এবং অনর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে তদ্বিষয়ক চিন্তা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হয়। কেননা এইরূপ বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত সমগ্র নর ও অনর বিষয় একত্র মনোমধ্যে সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের ধ্যান করা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর একটী বিভাগ করা আবশ্যক। নর এবং অনর মধ্যে যে ভেদ করা গিয়াছে, তাহার মূলসূত্র নরসাযুজ্য। এবং ঐ প্রণালীতে বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে যে অনর বিষয়ও নরাশ্রিত এবং নর-বিচ্ছিন্ন, এইরূপ দুটী বিভাগে বিভাজ্য। অশ্ব গবাদি কতিপয় পশু; এবং ধান্য সর্ষপাদি কতকগুলি পদার্থ; ক্ষিতি অপ আদি কোন কোন ধাতু; সূর্য্যচন্দ্রাদি কোন কোন গ্রহ; সর্ব্বা-

ধার মনুষ্যের বাসস্থান পৃথিবী; এই সকল অনর বিষয় যতদূর নরসংস্পৃষ্ট, অন্যান্য অনর বিষয় তাদৃশ নহে। এমন কি, শার্দ্দূল সর্পাদি কোন কোন হিংস্রক জন্তু, কোন কোন ভয়ানক বিষাক্ত বৃক্ষাদি, নরের অগম্য বন ও বালুকাময় স্থান নিতান্তই নরের বিঘ্নকারী। হিন্দুশাস্ত্রে যে পশু-পক্ষিকে একাধারে প্রলয়কর্ত্তা রুদ্র, গণ-দেবতার অধিপতি এবং মঙ্গলালয় শিব বলিয়াছেন, তাহা নিরর্থক নহে। এই সকল বিঘ্ন নিবারণ ব্যতীত সৃষ্টির স্থিতি হয় না। সে যাহা হউক, নর-বিচ্ছিন্ন অনর পদার্থকে সর্ব্বাপেক্ষা গৌণ মনে করিয়া নর এবং নরস্পৃষ্ট অনরকে মুখ্যভাবে নারায়ণের অধিষ্ঠানপাত্র মনে করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। নর-বিচ্ছিন্ন বিষয় সমস্তই নরমণ্ডলীর প্রলয়কারী একথা বলি না, কিন্তু উহার মধ্যেই নরপ্রলয়কারিতা বিদ্যমান আছে। প্রলয়কারিত্ব অপেক্ষা বরং সাযুজ্য ধ্যান করাই বাঞ্ছনীয়। একান্ত নরপ্রলয়-কারী বিষয়কে চিহ্নিত করিলে মনে যে বৈরভাবের উদয় হয়, তাহা বিপ্লবকারী। আর নর-বিচ্ছিন্ন বিষয়কে পৃথক করিলে একদিকে নর ও নরাশ্রিত বিষয় মধ্যে সাযুজ্য বর্দ্ধনে সুযোগ হইবে, আর পক্ষা-ন্তরে নর-প্রলয়কারী বিষয় গুলি বিভিন্ন অথচ গুহ্য ভাবে বিদ্যমান থাকিবে। মনুষ্যগণ ক্রমশঃ যদি এই শ্রেণীস্থ কোন বিষয়ের প্রলয়কারিতা বিমোচন করিতে পারেন তবে তাহারাই আবার নরাশ্রিত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া পরমানন্দের স্থল হইবে। আপাততঃ— নরগণের বর্ত্তমান বুদ্ধি অনুসারে—ঐ সকল বিষয় নর-বিচ্ছিন্ন বলিয়া নারায়ণের অধি-ষ্ঠানক্ষেত্র হইতে বর্জিত থাকিল। আর একটী কথাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। স্থল বিশেষে নরযোনির প্রধান শত্রু নরের আকৃতিতেই দৃষ্ট হয়। নরহিংসক পশুকে নরমাংসের আস্বাদন দিবার মানসে যে খল বনগমন করিয়াছিল, তাদৃশ নর-দেহ-ধারী পশু, নর কিম্বা নর-সংস্পৃষ্ট বিষয়, কিছুর মধ্যেই গণনীয় নহে। অথচ তাহারা কখন কখন সহসা অপূর্ব্ব চৈতন্যলাভ করিয়া পরম পবিত্রভাব ধারণও করিয়া থাকে। তাহাই প্রকৃত পুনর্জন্ম।

অতএব নর এবং নরাশ্রিত বিষয়ে সমষ্টি লইয়াই নারায়ণের ধ্যান করা কর্ত্তব্য। এতদুভয়ের সংযোগ ব্যতীত নরগণ থাকিতে পারে না এবং এইরূপ সংযোগ হইতেই নরগণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হন।

নরযোনিকে নারায়ণের অধিষ্ঠান পাত্র বলিয়াছি। নরগণ পরস্পরের নিকটে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া পরস্পরের সাযুজ্য লাভ করেন। গোত্রের পরিচয় দিয়া পিতৃপিণ্ডের সাযুজ্য সংস্থাপন করে। বর্ণের পরিচয় দিয়া ব্যবসার একতা বা সহকারিতা স্থির করেন। নিবাসের পরিচয় দিয়া সাকুল্য ব্যক্ত করেন। এবং নর-মূর্ত্তি বিকাশদ্বারা এক বসুন্ধরা বাসী-গণ মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিস্তার করেন। কিন্তু নরযোনির আদি অন্ত নরজ্ঞানের বহি-র্ভূত। সমীপবর্ত্তী ভূত ভবিষ্যৎ কাল সকলের নিকটেই পরিচিত বটে। কিন্তু কালের আদি অন্ত সর্ব্বতোভাবে স্মৃতি এবং দূরদর্শিতার বহির্ভূত। ত্রিকাল-ব্যাপী নরযোনির আদি অন্ত নরেরপক্ষে অচিন্ত্য।

অতএব নরাধিষ্টাতৃ নারায়ণের যেরূপ ধ্যান স্থির করা গেল, তাহাতে তাঁহার আদি অন্তের অভাব সম্যক প্রকারে বলবৎ থাকিতেছে। মৃত্যুতে নরবিশেষের বিনাশ হইতে পারে। নরমণ্ডলীর অন্তিম কাল চিন্তা করা অকিঞ্চিৎকর আলস্যের লক্ষণ।

নারায়ণ আত্ম-প্রলয়কারী নহেন। আমরা প্রারব্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি। এবং নরমণ্ডলীকে অনন্তব্যাপী মনে করিয়াছি। কাল, দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে অতএব তাহাতে কালের চক্রাকার পুনর্ভব কল্পনা করা অন্যায়। অর্থাৎ অনন্ত ব্যাপী নরমণ্ডলীর সাযুজ্য অদ্যাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং যিনি এই কালের সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মনুষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন তিনি স্বয়ং অপ্রসিদ্ধ। ঋষিগণ যে স্থল বিশেষে এরূপ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহার বিশিষ্ট হেতু ছিল। ফলতঃ তাঁহারা না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে শিষ্যবর্গের সাযুজ্য লাভার্থে, আপন উপদেষ্টার গৌরব বর্দ্ধন করা আবশ্যক হইয়া থাকে। এইরূপ আশয়ে ঋষিগণ শিক্ষাদানার্থে স্বয়ং জগদীশ্বরকে আপনাদিগের উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন। আর নারায়ণ ভবিষ্যদ্‌বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন এরূপ কল্পনা করিতে গেলে, সহজেই কালচক্র এবং প্রলয়ান্তে সৃষ্টির পুনর্ভব মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু নরান্তর্হিত নারায়ণ কেবল কল্পনা মাত্র। প্রত্যুত এই কল্পনা আত্মপ্রলয়কারী বলিয়া দূষনীয়। অতএব নরান্তর্হিত নরায়ণ যেমন অপরিজ্ঞেয়, কালচক্রে নরযোনির প্রলয় এবং সৃষ্টির পুনর্ভবও সেই প্রকার অকিঞ্চিৎকর কল্পনা মাত্র।

কাল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ভূতকালীন অভিজ্ঞতা দ্বারা নরমণ্ডলীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতা পরিমার্জ্জিত হইতেছে। ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যেমন ভূতকাল হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না ভবিষ্যতও সেইরূপ ভূত ও বর্ত্তমানের সহিত সংযুক্ত। ভূত ও বর্ত্তমান কাল হইতে যে জ্ঞানজ্যোতি বিকাশিত হয়, তাহা ভবিষ্যৎকে ক্রমশঃ আলোকিত করিতেছে। মনুষ্য যত বুদ্ধির প্রাখর্য্য লাভ করিতেছেন, ততই দূরদর্শিতা লাভ করিতেছেন এবং তাহা হইতে উত্তর কালের আয়োজন করিতে শিখিতেছেন। ইহাতে গ্রহবৈগুণ্যের প্রতিবিধান করিতে হয় না; প্রারব্ধের উপর নির্ভর করিতে হয় না অথচ উত্তর পূর্ব্ব পরম্পরের নিয়মাধীন বটে। সে যাহা হউক, ভাবীকালে নানা পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু সর্ব্ব প্রলয় আশঙ্কা নিতান্ত আত্ম বিস্মৃতির লক্ষণ; এবং তাদৃশ আশঙ্কায় বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান কালের প্রতি ঔদাসীন্য করাও যার পর নাই দুর্ব্বুদ্ধির লক্ষণ। যাঁহারা ঐকান্তিক চিত্তে নারায়ণের উপাসনা করেন, যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত, যাঁহারা অযথাভক্তি, কিম্বা অপরিণামদর্শী বিভীষিকা দ্বারা কাহাকেও আন্তরিক উপাসনা হইতে বিমুখ করিতে বাসনা করেন না, তাঁহারা কখনই এরূপ কুতর্ক করিয়া সরলবুদ্ধি সধর্ম্মাদিগকে স্তম্ভিত করিতে অভিলাষ করিবেন না। তাঁহাদিগের মার্জ্জিত বুদ্ধিসহকারে সহ-

জেই বুঝিতে পারিবেন যে কাপুরুষগণের নিশ্চেষ্টতাবর্দ্ধন করা কখনই হিন্দুধর্ম্মের অভিপ্রেত নহে। অতএব ইদানীন্তন পাশ্চাত্যমণ্ডলীর তেজস্বিতার সম্মুখে হিন্দুগণের অধোগতি হেতু হিন্দুধর্ম্মের বিঘ্ন আশঙ্কা করা, মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা বা কল্কি অবতারের বিভীষিকা প্রদর্শন করা কদাচ ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না। হিন্দুগণেব অধোগতিতে অহিন্দুবর্গের কোন খর্ব্বতা দৃষ্ট হয় না। আর নারায়ণকৃত যুগপ্রলয়ে অহিন্দুগণ যে রক্ষা পাইবে এরূপ মনে করাও সম্ভাবিত নহে। বরং পাশ্চাত্যমণ্ডলীর মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সমাদর দেখিয়া এইরূপ মনে কবাই সঙ্গত যে যদি কোন বস্তুর বিনাশ সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে সে কেবল হিন্দুধর্ম্মের কৃত্রিমচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এতাদৃশ পরিবর্ত্তনকে প্রলয় বলিয়া ব্যক্ত করা কেবল স্বদোষ সমর্থন ব্যতীত আব কিছুই নহে।

নরাধিষ্ঠাতৃ নারায়ণ আত্ম-প্রলয়কাবী নহেন; তিনি একান্ত উন্নতিপ্রমুখ। নরসাযুজ্যই তাঁহার প্রধান লক্ষণ। এই সাযুজ্যেব পরিবর্দ্ধন হইতে স্বয়ং নারায়ণের ও সাধন উন্নতি হইবে।

এস্থলে আর একটী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কার্য্যকারণের সম্বন্ধ অতিগূঢ় বিষয়। তাহার আলোচনা করিবার স্থান নাই। কিন্ত মনুষ্য এই সম্বন্ধের উপরে নির্ভর করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অগ্নিতে অন্নপক্ক হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিহীন না হইলে লোকে কাষ্ঠাহরণ বা ধান্ত রোপণ করিতে পারে না। কি নিমিত্ত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ অবিচলিত থাকে তাহার আলোচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে জগতের ঘটনা সমূহ মধ্যে অনন্ত পারম্পর্য্য বুঝিতে পারিলেই লোকে নিশ্চিন্ত হয়। আর এইরূপ সম্বন্ধ ঘটাইতে না পারিলে আমাদিগেব মনের উদ্বেগ নিবৃত্তি হয় না। এই নিমিত্ত অন্যথাসিদ্ধিশূন্য পূর্ব্বানুবর্ত্তিতাই সাংসারিক নিয়মের অনন্তলক্ষণ হইয়াছে। এই নিয়মই তাবৎ ব্যবস্থার মূলীভূত। এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাই আমাদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মের মূলাধার। অগ্নি এবং অন্নেব সম্বন্ধ জানিয়া উভয় সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হয়, আবার সেই ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য সহস্র কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। কিন্তু যত কার্য্য কর, পূর্ব্বোক্ত মূলীভূত নিয়মের অন্যথা হইলে কিছুই দীর্ঘকাল সুসিদ্ধ হয় না। আর যেখানে কার্য্য সমূহ মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে, সেখানে কেবল ঐ অন্যথাসিদ্ধি শূন্য আনুপূর্ব্বিকতামূলক নিয়মানুসাবেই পদে পদে সাংসাবিকব্যবস্থার বর্দ্ধন হইয়া থাকে। নৈসর্গিক ঘটনাই বল, আর লোকাচার বা সামাজিক ঘটনাদিই বল, সর্ব্বত্রই এই কথা সপ্রমাণিত হইবে।

নারায়ণ প্রারব্ধের অধীন নহেন। কিন্তু আমরা যাঁহাকে ধ্যান করি, তিনি মনুষ্যের আভ্যন্তরিক ঘটনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং আমাদিগের সেই ধ্যাতব্য বিষয় ও নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা ঘটিত ব্যবস্থার অধীন। নর—অনর—উভয়েই সেই নিয়মের বাধ্য। আবার নরকর্ত্তৃক সেই ব্যবস্থার

পরিবর্দ্ধনও হইয়া থাকে। মনুষ্য নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে যে সমস্ত ঘটনা হয়, মনুষ্যের চেষ্টা দ্বারা তাহার রূপান্তর হইয়া থাকে অথচ উভয় স্থলেই নৈসর্গিক ঘটনা নিয়ত আনুপূর্ব্বিক বিদ্যমান থাকে। নরাধিষ্ঠাতৃ উন্নতি-প্রমুখ নারায়ণ এইরূপ বিবর্দ্ধনকে উপেক্ষা করেন না। অতএব যেমন নরসাযুজ্যে নারায়ণের আনন্দ প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ নরবুদ্ধিবিকাশিত সর্ব্বভূত-আবৃত নিয়ম ও ব্যবস্থা দ্বারা নারায়ণের পুষ্টিবর্দ্ধন এবং উন্নতিসাধন হয়।

এতদ্বারা বুঝা যাইবে যে নরসমষ্টিকে নারায়ণের অধিষ্ঠান পাত্র বলা যাইতে পারে। তাহাতে আত্ম-প্রলয়কারিত্ব লক্ষণ নাই। মনুষ্যগণ স্নেহসহকারে পরস্পরের সমীপগামী হইলেই নারায়ণের সাযুজ্যসাধনের উপায় হয়। লোকে যত অকৃত্রিমভাবে পরের নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ করিতে অনুরক্ত হয়, ততই পরস্পরের সাযুজ্যলাভে সক্ষম হয়। সর্ব্বভূত মধ্যে সামীপ্য ও সাযুজ্য স্থাপনার্থে অন্যথাসিদ্ধিশূন্য পূর্ব্ববর্ত্তিতা ঘটিত ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

আর, ঐ নিয়মে স্নেহসহকারে পরস্পরের সমীপগামী হইলে যে নির্ম্মল উন্নতি সাধন হয়, তাহা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, আমরা স্বভাবতঃ স্বেচ্ছাচারী। এই স্বেচ্ছাচারিতা হেতু সর্ব্বদাই উল্লিখিত বিধান ভুলিয়া আমরা নানা প্রকারে পরের ক্ষতি করিয়া থাকি এবং তাহা করিলেই পরস্পরের সামীপ্য ভঙ্গ হইয়া আবার অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্ব নিয়মে ব্যবস্থার হানি অর্থাৎ উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি উপস্থিত হয়। কিন্তু কেবল মনে মনে স্নেহ করিবার সংকল্প করিলেই হয় না। আর স্বার্থপর কার্য্য করিবামাত্রই যে সামীপ্যের বিঘ্ন হয়, এমত নহে। নারায়ণের স্বধর্ম্ম এবং নরসাযুজ্যের প্রসাদে লোকে পরস্পরের স্বার্থপরতা বিলক্ষণ বুঝিয়া থাকে। কিন্তু একজনের স্বার্থপরতা হেতু অন্যের ক্ষতি হইলে অর্থাৎ কেহ স্নেহস্বত্বে নিশ্চেষ্ট থাকিলে অথবা সংকল্প ও কার্য্য মধ্যে বৈপরীত্য ঘটিলে উন্নতির বিঘ্ন ঘটে এবং স্বয়ং নারায়ণ বেদনা প্রাপ্ত হন। অতএব এই স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলতা নিবারণার্থে সংকল্প স্থলে একাগ্রতা সহকারে স্বার্থপরতা ভুলিতে চেষ্টা করাই বিধেয়। কেননা তাহা হইলে সাধনের অসম্পূর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইতে পারে। এই নিমিত্ত জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিবার সংকল্প করাই শ্রেয়।

তদ্ভিন্ন আভ্যন্তরিক স্নেহ কেবল যত্নে প্রতিপালন করিলেই হয় না। পরস্পরের সামীপ্য ও সাযুজ্যের নিমিত্ত জানা আবশ্যক, কাহার মনোগত ভাব কিরূপ। সবিতৃ সেবক সত্যবান্ না হইলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়। বিশ্বাস ব্যতীত স্নেহের উদয়ই হয় না। এই জন্য নিরন্তর ব্যক্তভাবে আচরণ করাই কর্ত্তব্য।

অতএব উল্লিখিত প্রণালীতে নারায়ণকে ধ্যান করিলে এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার সাযুজ্য কামনা করিলে মনুষ্যগণের কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিধান সহজেই বিকাশিত হইবে। এবং উপাসনাস্থলে নিশ্চেষ্ট

ভাবে কেবল মূর্ত্তি ভাবনা না করিয়া তাহার সঙ্গে ঐ বিধানকে জপমালা করিলে অসঙ্গত কার্য্য হইবে না। এতাবতা এই বীজমন্ত্র উদ্ধার হইতেছে যে স্নেহই আমাদিগের ধর্ম্মধাতু, ব্যবস্থা মূলাধার, এবং উন্নতি উদ্দেশ্য। জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিও। নিরন্তর ব্যক্তভাবে আচরণ করিও।

শ্রীযো

রঘুবংশ।

আমরা অদ্য কালিদাসের রঘুবংশ সমালোচনা করিব। অনেকে মনে করেন রঘুবংশই কালিদাসের কাব্য সমূহের মধ্যে অপকৃষ্ট। কেহ বলেন উহা কাব্যই নহে। কেহ বলেন উহা পুরাণ, কেহ বলেন উহা ইতিহাস। একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে রঘুবংশ কালিদাসের কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি; প্রথম দিলীপস্বদক্ষিণা, তাহার পর রঘুদিগ্বিজয়, তাহার পর অজেন্দুমতী, তাহার পর দশরথের মৃগয়া, তৎপরে রামায়ণ, তৎপরে কুশোপাখ্যান, তাহার পর অতিথির রাজনীতি ও সর্ব্বশেষে অগ্নিবর্ণের দুশ্চরিত্র—এই কয়েকখানি কাব্য কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন, শেষ কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ জুড়িয়া একখানি কাব্য আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ কোন মতেই মত দিতে পারিনা। আমাদের মতে রঘুবংশ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, ইহা কাব্য সংগ্রহ নহে, একখানি কাব্য। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় ইহার উদ্দেশ্য আছে, একতা আছে, উপদেশ আছে, এবং গভীর অর্থ আছে। রঘুবংশের দৈর্ঘ্যই উহার নিন্দার কারণ। এই সুদীর্ঘ কাব্য অনেকে পড়িয়া উঠিতে পারেন না। দুই চারি সর্গ পড়িয়াই শেষ করেন, ও একটা যাহয় সমালোচনা করিয়া বসেন। কালিদাসের রঘুবংশ যত অধিক দূর পড়িবে, ততই উহার সার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ সর্গ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার এরূপ দীর্ঘ কাব্য যত অধিক পড়িবে ততই উহার নির্ম্মাণ কৌশল অবগত হইতে পারিবে। ফলতঃ যখন প্রথম পড়িবে, তখন সব ছাড়া ছাড়া লাগিবে। দ্বিতীয়বারে কতক বোধ হইবে উহার একতা আছে।

তৃতীয় বারে একতা ও গূঢ়ার্থ স্পষ্ট প্রতিভাতহইবে। রঘুবংশ সমালোচনা সম্বন্ধে এইরূপ নানা মুনির নানা মত আছে বলিয়াই কালিদাসের অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা রঘুবংশের সমালোচনা অধিক প্রয়োজনীয়।

আমাদের বিশ্বাস রঘুবংশই কলিদাসের শেষ লেখা, আমরা সর্ব্বগ্রে এই কথাটী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। এই কথাটী বুঝিতে পারিলেই রঘুবংশের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ রঘুবংশের রচনায় গাম্ভীর্য্য ও বৃদ্ধজনোচিত অলঙ্কারবাহিত্য দৃষ্টি গোচর হয়। কুমারসম্ভবে অলঙ্কার ও ভাব (sentiment) রাশিরাশি পরিলক্ষিত হয়। রঘুবংশের সর্ব্বত্র কবিকল্পনার ধীরতা ও কুমারে প্রাখর্য্য দেখা যায়। প্রায়ই দেখাযায়, যখন বয়স অল্প থাকে, তখনই কল্পনার দৌড় অধিক হয়। বর্ণনার কড়াকড়ি অধিক হয়, ভাষার নানারূপতা হয়। তখন বহুদর্শিতা অল্প, হঠাৎ মনোহরণের চেষ্টা অধিক হয়, অলৌকিক বর্ণনাব প্রয়াস অতিরিক্ত হয়। লোকের মনে উন্নতভাব উদয় করিবার চেষ্টা, উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা, ওঅদ্ভুত নূতন পদার্থ গঠনের চেষ্টায়ই কবি ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকেন। কুমারসম্ভবে এই সকলগুলিই লক্ষিত হয়। কল্পনার দৌড় হিমালয় বর্ণনা। হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কবি স্বভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। পার্ব্বতীর রূপ বর্ণনায় ও কবি স্বভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, নিজের কল্পনায় সন্তুষ্ট না হইয়া, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে বলিলেন,

"সর্ব্বোপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন
যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাৎ
একস্থ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব।"

ইহার অর্থ এই যে, হায় আমি আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। বয়স হইলে কল্পনার এত তীব্রতা দেখা যায় না। যুবক কবির অতৃপ্ততা কুমারের প্রতি পত্রে অঙ্কিত। বর্ণনার বাড়াবাড়িও অল্প বয়সের গুণ। অজবিলাপ ও রতিবিলাপ তুলনা কর। রতিবিলাপের বিষয় অল্প,ভাব অধিক; বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। কবি একবার রতিকে নিরস্ত করাইলেন, আবার বসন্তকে আনাইয়া খানিক কাঁদাইলেন! পার্ব্বতীর বিবাহবর্ণনা দেখ। রঘুবংশ ও কুমারে অনেক গুলি শ্লোকই এক; কিন্তু কুমারে বিবাহবর্ণনা অনেক অধিক। রঘুতে কয়েকটী মাত্র শ্লোক, কিন্তু যেমন রঘুবংশের বিবাহটা বড় জাঁকাল ব্যাপার, কুমারের বিবাহটা যেন তেমন নয়। কুমারের বিবাহটা বেশী বড় বলিয়া যেন একটু বিরস বিরস। কুমারের ভাষাও নানা স্থলে নানারূপ। অনেক জায়গায় যেন শক্ত শক্ত। অনুষ্টুপ ছন্দের সর্গগুলিতে যেন কিছুই নাই। শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইব চেষ্টাটাও যেন অধিক। কিন্তু রঘুতে সেরূপ নহে, ভাষা প্রায়ই সর্ব্বত্র সমান সরল। তাহার উপর আবার বিষয়মাহাত্ম্যে কখন উঠিতেছে কখন পড়িতেছে। কুমারে যেখানে সোজা সেখানে খুব সোজা, যেখানে কঠিন সেখানে অভিধান নহিলে চলে না। একেবারে হঠাৎ মনোহরণের চেষ্টাটাও কুমারে অধিক। একটী উদাহরণ দিব। কুমারের হিমালয় বর্ণনায় "স্থিতঃ পৃথিব্যা

ইব মানদণ্ডঃ” এই কথার ভাবে আর রঘুতে সমুদ্র বর্ণনায় “বিক্ষো রিবাস্যা নবধারনীয়ং ঈদৃক্ তয়া রূপমিবত্তয়ারা” এই কথার ভাবে একবার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, কুমারের একটা অভূতপূর্ব্ব পদার্থের উৎপ্রেক্ষা করিয়া ধাঁদা দিবার চেষ্টা, আর রঘুতে ধীরভাবে উপমাদ্বারা স্বরূপ বর্ণনা। অলৌকিক বর্ণনার প্রয়াসও অল্প বয়সের প্রয়াস। কুমারসম্ভব ময় অলৌকিক বর্ণনা, মহাদেব কল্পনাতীত পরব্রহ্মস্বরূপ, পার্ব্বতী স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপিনী; তাহার পর ইন্দ্র অলৌকিক, মদন অলৌকিক, রতি অলৌকিক সবই অলৌকিক। যখন বহুদর্শিতা অল্প, অথচ কল্পনা মহীয়সী, অলৌকিক বর্ণনাটা সেই সময়েরই বর্ণনা। রঘুতে অলৌকিকের এত বাড়াবাড়ি নাই, লোকে যাহা দেখে, লোকে যাহা শুনে, লোকে যাহা শিখে, তাহার উৎকৃষ্ট বস্তু লইয়া রঘুবংশ। উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদানের চেষ্টা বাল্যবয়সের কবিদের এক রোগ। সেটা প্রথম পড়িলেই বুঝিতে পারাযায়। অলৌকিক প্রণয়ের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইবার জন্যই কুমারসম্ভবের সৃষ্টি হইয়াছিল। পার্ব্বতী সমস্ত ত্যাগ করিয়া-পিতামাতা ভ্রাতাবন্ধু সমস্ত আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া-নিজের জীবন তৃণতুল্য তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ প্রণয়ের প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর পদার্থ অনুশীলনে রত। তিনি প্রথমে পার্ব্বতীকে লক্ষ্যের মধ্যেই গণ্য করিলেন না, তাহার পর তাঁহার প্রথম প্রণয়োদয় সময়েই প্রণয়ে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু পার্থিব, যাহা কিছু জঘন্য তৎসমুদয়ের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ মদন ভস্ম হইয়া গেল—কালিদাস দেখাইলেন যে প্রণয়ে মদন ভস্ম হয় সেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা, তাহা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমহাদেব এই সার মর্ম্ম বুঝিয়া তত্ত্বচিন্তা ত্যাগ করত পার্ব্বতীর সেই অতুল প্রেমে মগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় লোকের এতদূর দৌড় থাকে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, রঘুবংশ কালিদাসের শেষ কালের লেখা। রঘুবংশের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক সময়ের লেখা। ইহার সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জীবে সহানুভূতি জাজ্জ্বল্যমান। যে কয়েকটী রাজার বর্ণনা করা হইয়াছে, সকলেই অতি উদারচিত্ত। একজন লোককে সর্ব্বগুণময় করিয়া বর্ণনা করিতে গেলে, হয় অত্যুক্তি হয়, না হয়, একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়। কালিদাস একথা বুঝিয়া মনুষ্যশরীরে যত গুণ থাকা আবশ্যক রঘুবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সেই সমুদয় যথাযথরূপে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মবল, ক্ষত্রবল ও দৈববল এই তিনে রঘুবংশের উৎপত্তি। বশিষ্ঠের উপদেশ মতে সুরভি কন্যার আরাধনায় মহারাজাধিরাজ দিলীপের রঘুনামে সন্তান হইল, নন্দিনীর বরে তিনি বংশপ্রবর্ত্তক হইলেন; কারণ রাজা বর চাহিলেন “বংশস্য কর্ত্তার মনন্তকীর্ত্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে।” তিনি বাল্যকালে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার দশবিধ সংস্কারকার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি কিশোর অবস্থায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃকৃত অশ্ব-

মেধযজ্ঞ সমাপন করাইলেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিলেন। ভূমণ্ডল জয় করিয়া সমস্ত ধন বিতরণ করত বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। পরে মৃণ্ময়পাত্র মাত্র যখন সম্বল, তখন এক ব্রাহ্মণ চৌদ্দ কোটী স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিল, রাজা কুবেরের নিকট অর্থ আনিতে যাইতেছেন, কুবের স্বয়ং আনিয়া টাকা তাঁহার রাজকোষে রাখিয়া দিল। কালিদাস বলিলেন এইরূপ লোকেই বংশপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন? ইনি দয়াবীর, দানবীর, যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মবীর। কালিদাস ইহাঁর হৃদয়ের ভাব সকল দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইহাঁর পুত্রবাৎসল্য, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রমণীপ্রণয় কালিদাস বর্ণনা করেন নাই। কালিদাস রঘুর পুত্র অজের জন্য সেগুলি সমস্ত তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। অজ সকল বিষয়েই ঠিক পিতার ন্যায় "প্রবর্ত্ততো দীপ ইব প্রদীপাৎ।" অজ একেশ্বর সমবেত রাজন্যবর্গের পরাজয় সাধন করিলেন। সুতরাং তিনি বীর। তিনি সমস্ত রাজমণ্ডলীর মধ্যে রূপবান্। তাই ইন্দুমতী মালা দিলেন। তিনি অতি মায়াবী। পিতা যখন রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে চাহিলেন, অজ সেটী সহ্য করিতে পারিলেন না। "শিরসা বেষ্টন শোভিনা সুতঃ অপরিত্যাগ মযাচতাত্মনঃ" পিতাকে কাছে রাখিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। রঘুর বংশ লইয়া রঘুবংশ, তাই রঘুকে কালিদাস পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শেষও রঘু অতি প্রাচীন বয়সে যোগ সমাধিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতৃবিয়োগ দুঃখ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে রাজা অজ উদ্যান বিহারে গমন করিলেন; তথায় তাঁহার এত সাধের প্রণয়িনী ইন্দুমতী প্রাণ পরিহার করিলেন। অজের কোমল হৃদয় আর সহিতে পারিল না। তিনি যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে পত্নী বিয়োগ সন্তপ্ত ব্যক্তিগণ কতক কতক বুঝিতে পারেন। আজিও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পত্নীবিয়োগের ভয়ে অজ বিলাপ পাঠ করেন না। তাঁহার কোমল হৃদয় সেই দুঃখেই মিলাইয়া যাইত। কিন্তু পুত্র নাবালক এখন আত্মহত্যা অন্যায়; অতএব পুত্রের সাবালকতা পর্য্যন্ত আট বৎসর কাল জীবন ধারণ করিয়া মহারাজ অজ,—মূর্ত্তিমান্ প্রণয়-তীর্থজলে শরীর ঢালিয়া দিলেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা দশরথ। কালিদাস দশরথের বনবিহার মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন দশরথ বড় মৃগয়াপ্রিয়; উন্মত্ত হইয়া অনবধান ক্রমে একজন ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রাণ নাশ করেন। এই পবিত্র বংশে প্রথম দোষ প্রবেশ করিল। রাজা সুশাসিত; সমস্ত সচ্ছল; রাজা দশরথ আর কাজ না পাইয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ান। তিনিও পিতৃপিতামহবৎ অশেষ গুণময়; কিন্তু মৃগয়া দোষ; মৃগয়ায় আসক্ত বলিয়া পবিত্র বংশে দোষ প্রবেশ করিল। প্রথম ঘুণ ধরিল।

এই সময়ে ভগবান নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি রঘুবংশেই জন্মগ্রহণ স্থির করিলেন। রাজাও অনেক দিন সন্তান সন্ততি না হওয়ায় নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণের প্রীতি উৎপাদন করিতে

ছিলেন। সুতরাং নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইলেন। রঘুবংশের রামচন্দ্রই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রাজা। এই রঘুবংশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি। বাল্মীকির রাম (ideal) মনুষ্য; সদ্গুণময় মনুষ্যের চরম উৎকর্ষ। কালিদাস বাল্মীকির রামটী চুরি করিয়া লইলেন; অর্থাৎ দেখাইলেন রঘু অজও দশরথ বংশে যে রাজা হইবেন তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। রামায়ণের রাম আর রঘুবংশের রাম কিছুতেই ইতর বিশেষ নাই। কেবল এই যে রামায়ণের রাম একখানি ছবিতে একটী প্রতিকৃতি; আর রঘুর রাম একখানি আলেখ্যে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির মধ্যে সকলের চেয়ে ভালটী। সুতরাং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে রামায়ণ অপেক্ষা রঘুবংশে সমধিক কারুগরী আছে। রামের মৃত্যুর পর রাজত্ব ভাগ হইয়া গেল। অযোধ্যা নগর আর রাজধানী রহিল না। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অন্যত্র রাজধানী করিলেন, অযোধ্যা ক্রমে ভগ্নাবশিষ্ট নগরীতে পরিণত হইতে লাগিল। মহারাজ কুশ অত সুন্দর নগরীর দুর্দ্দশা দেখিতে না পারিয়া আপন রাজধানী অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিলেন। বংশক্রমাগত গুণ অপেক্ষা তাহার সুন্দর পদার্থের প্রতি অনুরাগ অধিক। তিনি অযোধ্যায় অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। কালিদাস তাঁহার রাজত্বের আর একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, সে জলক্রীড়া। যখন রাজা নগর সাজাইতে আর জলক্রীড়ায় মত্ত হইলেন, তখন দশরথের সময় যে ঘুণ ধরিয়া আসিয়াছিল; তাহাই বাড়িয়া উঠিল। শক্রহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে মহারাজ কুশের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র অতিথি পণ্ডিত ছিলেন; তিনি রাজ্যশাসনের পরম সুব্যবস্থা করিলেন অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে যাহা আছে তাহাই রাখিয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ। রাজার মনে যখন এরূপ ভাবনা উদয় হয়; সে রাজ্যের আর শ্রীবৃদ্ধি হয় না। অতিথির পর এক এক করিয়া অনেক গুলি রাজা হইলেন। কিন্তু কালিদাস তাহাদের আর বিশেষ বর্ণনা করিলেন না। ইঁহারা পৈতৃক নামে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। শেষ রাজা নাবালক হইলেন। নাবালক রাজা মন্ত্রিগণের নিকট বেশ শিক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু অল্প দিনেই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার পুত্র অগ্নিবর্ণ রাজা হইয়া অত্যন্ত ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্ত হইলেন। এবং রাজযক্ষ্মরোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার গর্ভবতী ভার্য্যার গর্ভকে অভিষেক করিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। রঘুবংশ শেষ হইল। কেহ বলেন রঘুবংশের আর তিন সর্গ আছে। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহাদের বোধহয় কাব্যালোচনা শক্তি নাই। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে অগ্নিবর্ণের পর আর রঘুবংশ বর্ণনার প্রযোজনই নাই। তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

কালিদাস কুমার লিখিলেন, শকুন্তলা লিখিলেন, মেঘদূত লিখিলেন, আরও অনেক গ্রন্থ লিখিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ রহিল; যে কোথাও সমস্ত ভুবনের একটী একীকৃত বর্ণনা করিতে পারিলেন না। আর তাঁহার ক্ষোভ রহিল যে সকল কাব্যেই সুখে শেষ করিতে হয় না করিলে সামাজিকেরা ভাল বলে না। বিয়োগান্ত

কাব্য হইতে পারে, এটা এদেশীয় সামাজিক দিগের বিশ্বাসই ছিল না। সুতরাং সংসারে যথার্থ চিত্র দেওয়া হয় না। সামাজিক দিগকে অবজ্ঞা করিয়া বিয়োগান্ত নাটক লেখা সুবিধা নয়। তাহাতেই একটী বংশের অদৃষ্ট সম্যক রূপে বর্ণনা করিয়া মনুষ্য অদৃষ্টের যথার্থ চিত্র দেখাইলেন। আর একখানি কাব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের অনুকরণ দেখাইলেন। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে রঘুবংশ কালিদাসের উৎকৃষ্ট কাব্য এবং নানা কারণে উহা তাঁহার শেষ লেখা ও অনেক বহুদর্শিতার ফল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিত মালা।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্, এ, প্রণীত।

কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি দ্বারা প্রকাশিত।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে শ্রীবামাচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৮৮৩, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

পুস্তক খানি ভূদেব বাবুর অনুরোধে ছেলেদের জন্য লিখিত। যোগেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিতের পক্ষে ইহা সামান্য কার্য্য এবং পুস্তক খানি বেশ দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। নিম্নশিক্ষাবিভাগে বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় দুর্দ্দশা —ছাই পাঁশ যাহা কিছু চলিয়া যায়। এরূপ গ্রন্থের আদর হইলে শিক্ষাবি ভাগে সে কলঙ্ক ঘুচিতে পারিবে।

আত্মোৎসর্গের ভাষা আর একটু সরল এবং দুই এক স্থলের ভাব আর একটু বালক বুদ্ধির অধিগম্য হইলে ভাল হইত। সুশিক্ষিত অনেক শিখিয়া পড়িয়া যে সব চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, বালক একেবারে তাহার বিকাশশৃঙ্খল বুঝিতে পারিবে, এরূপ মনে করা বড় ভুল। আর এক কথা। এ গ্রন্থে এত বৈদেশিক চরিত্রের ছড়াছড়ি কেন? যে কয়টা দেশীয় চরিত্র দেখিলাম, তাহাও বড় সংক্ষিপ্ত। ইহার অনিবার্য্য ফল এই যে শিশুকাল হইতে ছেলেরা শিখিয়া রাখে যে মনুষ্যত্বে আমরা বড় হীন। সুযোগ্য গ্রন্থকার মুখবন্ধে বুঝাইয়াছেন যে ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে। কিন্তু

চেষ্টা করিলে স্মরণাতীত কালের না হউক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনেক দেশীয় লোকের চরিত্র তিনি "আত্মোৎসর্গে" স্থান দিতে পারিতেন।

এগ্রন্থে মহাদেবের দেবত্ব লোপ পাইয়াছে—তিনি নরাকারে হিন্দু শিশুর সম্মুখে উপস্থিত! শিক্ষিত যুবকের পক্ষে এ দৃশ্যে দোষ নাই থাক, কিন্তু বালকের পক্ষে ইহার ফল আমাদের মতে বিষময়। কোন শিক্ষা না হইতেই পিতৃপুরুষের ধর্ম্মে অবিশ্বাস জন্মিলে হিন্দু সমাজের বড় দুর্ভাগ্য।

বাল্যসখা। প্রথম ভাগ। কলিকাতা, ৬ নং কলেজস্কোয়ার, বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

এ খানিও ছেলেদের পাঠ্য। এ সম্বন্ধে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের সার্থকতা অধিকতর এবং লেখকের কুশলতা সেই পরিমাণে প্রয়োজনীয়। "বালককে কাব্য পড়াইবার এক মাত্র উদ্দেশ্য * * * কাব্যের উন্নত ভাবের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি। ইহা কেবল পদ্যের দ্বারা সিদ্ধ হয় না—কবিত্বের প্রয়োজন।" বাল্যসখায় কবিত্বের বড় অভাব, কিন্তু স্থানে স্থানে বর্ণনার বেশ জমাট আছে। পুস্তকের মধ্যে "মাতাল" শীর্ষক একটী পাঠ আছে। তাহা পড়িলে বালকের মনে মাতালের প্রতি যে বিশেষ ঘৃণা জন্মিবে, এমন বোধ হয় না। বরং বোধ হয় যে বালক মাতালকে একটী কৌতুকাবহ পদার্থ মনে করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবে। বস্তুতঃ কদর্য্য জিনিসের প্রতি বালকের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলাই সম্ভব। কিন্তু বালক দিগের জন্য রচিত পুস্তকে প্রায়ই সেইরূপ করা হয়। আমাদের মতে সেটী বড় সুবিবেচনার কাজ নয়। যাহাতে প্রলোভন আছে, তাহা অপ্রস্ফুটিত দুর্ব্বলমতি পাঠকের সাম্‌নে ধরা উচিত নয়। গ্রন্থে "হিঁয়ালী" শীর্ষক আর একটী পাঠ আছে, ঈশ্বরকে লইয়া সেই হিঁয়ালী রচিত। ঈশ্বর চিরকালই হিঁয়ালী বটে, কিন্তু হালকা বুদ্ধি বালকের কাছে ঈশ্বর লইয়া হিঁয়ালী বাঁধিলে বালকের ঈশ্বরজ্ঞান বড় একটা মজবুৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের ইচ্ছা যে পুস্তকখানি উত্তমরূপে সংশোধিত হইয়া যেন বালকের হস্তে প্রদত্ত হয়।

বঙ্গদর্শন।

১০৪ সংখ্যা।

পশুপতি-সম্বাদ।

প্রথম ভাগ।

১

সকলেই জানেন যে কলিকাতার অনতিদূরে গোধনপুর নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রাম খানি খুব ছোটও নয়, খুব বড়ও নয়—অধিবাসীর সংখ্যা ৮শতের অধিক নয়, কিন্তু সেন্‌সস্ রিপোর্টে ২৫০০ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহারা ঐ রিপোর্টের লিখিত সংখ্যা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা করুন, আমরা করিব না। আমরা এক বৎসর গোধনপুরের মাঠে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই চড়কডাঙ্গায় উপস্থিত ছিল। আমাদের বোধ হইল যে, গ্রামের কুলবধূ যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে বাহির হন না এবং যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ প্রয়োজনে লজ্জাধিক্য বশত অপ্রকাশ্যভাবে বাহির হইয়া থাকেন, তাঁহাদের শুদ্ধ ধরিলে অধিবাসীর সংখ্যা আমরা যা বলিয়াছি, তাহার বেশী হইবে না। অতএব কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা ৮ শতকে ২৫ শত বলিতে অস্বীকৃত হইলাম।

গোধনপুরের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবি এবং গোয়ালা। ব্রাহ্মণ বিশ পঁচিশ ঘরের বেশী নয়; কায়স্থ প্রায় চল্লিশ ঘর। কৃষিজীবিরা চাষ করে, ধান বেচিয়া জমিদারের খাজনা দেয়, খাজনা দিয়া যাহা থাকে তাহাতে কোন রকমে দিনপাত করে, বড় একটা হাহাকার করে না। কলিকাতার কল্যাণে গোয়ালাদের আজকাল জোর পড়তা। গোধনপুরের গোয়ালারা কলিকাতার বাবু মহলে জলকে দুধ বলিয়া বিক্রয় করিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করে, বাবুদের ছেলে মেয়ের কফ কাশী সারে না, কিন্তু গোয়ালাদের গৃহিনীরা ভাল ভাল সোণার গহনা পরিয়া দশমহাবিদ্যার ন্যায় দশ দিকে দশ রকম মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গোকুল গোধনপুরের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে দেয় না।

গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের মধ্যে কেহই ধনশালী নয়, সকলেই সামান্য গৃহস্থ। সাবেক প্রথামত সকলেরই কিছু কিছু চাস আছে, চাসের ধানই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। কেবল ব্রাহ্মণঠাকুরদের মধ্যে কাহারো দুই এক ঘর যজমান, কাহারো দুই এক ঘর

শিষ্য আছে। কিন্তু আজকাল গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের আর পূর্ব্বের মত সুখ শান্তি নাই। গ্রামের গোয়লিনীদের গায় সোণা দানা দেখিয়া তাঁহাদের আর খাইয়া পরিয়া সুখ হয় না। তাঁহারা চোক বুজিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করেন বটে, কিন্তু সাবিত্রীর পবিত্র জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি না দেখিয়া কেবল সাবিত্রী, গায়ত্রী, দামিনী যামিনী প্রভৃতি গোপবালাদিগের মোটা মোটা কালকোলো হাতের মোটা মোটা সোণার তাগা, বড় বড় স্ক্রুপাকের বাঘমুখ বালা দেখিয়া থাকেন। রাত্রে শয়ন করেন বটে, কিন্তু ঘুমের সহিত আর বড় একটা সম্পর্ক নাই, গৃহিনীদিগের বক্তৃতা শুনিতেই রাত্রি কাবার হইয়া যায়। কাহারো গৃহিণী বলেন—"দেখ, কাল অবধি আমি খোকার জন্য দুধ লইব না।" কর্ত্তা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'—অমনি গৃহিনী ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া চোক্ ঘুরাইয়া বলিলেন—"কেন, কিছু জাননা? দেখলে না, আজ সকালে তরঙ্গিনী ছুঁড়ী দুধ দিতে এসে আমার হাতে পিতলের বালা দেখে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'হ্যাঁগা মাঠাকুরুণ, তোমার ও কয় গণ্ডা টাকার বালা গা? তা এ ত দুধ দিতে আসা নয়, আমাদিকে অপমান করতে আসা। আমি কাল থেকে আর দুধ লব না, তা তোমার ছেলে বাঁচুক আর মরুক, তুমি যা জান করিও।" কাহারও সুন্দরীর কাঁচা বয়স, সন্তানাদি হয় নাই, তিনি স্বামীকে শাসাইয়া বলেন—"দেখ, তোমাদের বাগ্দী গোয়ালার দেশ, এখানে বাগ্দিনী গোয়ালিনীদের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না, ইচ্ছা হয় একটা বাগ্দীর মেয়ে কি একটা গোয়ালার মেয়ে লইয়া থেক, আমি কাল কলিকাতায় আমার ভগ্নীপতির বাসায় চলে যাব" এইরূপ এখন গোধনপুরের ভদ্রপল্লীতে প্রতি ঘরেই হইয়া থাকে। অতএব এত কালের পর গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের সুখশান্তি ঘুচিয়া গেল। এত কালের পর, ইংরাজের ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহাকেন্দ্র কলিকাতার প্রসাদে যেমন অন্যান্য অসংখ্য গ্রাম-উপগ্রামের, তেমনি এই ক্ষুদ্র গোধনপুরের ভদ্রসন্তান আজ সোণারূপার জন্য অস্থির। সোণারূপাকে দেবতা ভাবিয়া সেই দেবতার বিদ্যুতপ্রভ হাসি-মুখখানি দেখিবার জন্য জমিজমা, যজমান শিষ্য, পাঁজিপুথি ছাড়িয়া কলিকাতারূপ মহাতীর্থাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। এমন তীর্থযাত্রা ভারতবাসী আর কখন করে নাই! তীর্থপ্রধান কলিকাতার কাছে কাশী, গয়া, প্রয়াগ, পুষ্কর, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেকেলে তীর্থ অতি তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর। আজ সে সব তীর্থ ভুলিয়া ভারতবাসী কলিকাতারূপ মহাতীর্থাভিমুখে প্রধাবিত। বল দেখি, আজ ভারত জগতে ধন্য কি না? যদি বল না, আমি বলিব—তুমি Civilization-এর অর্থ এখনও বুঝ নাই—প্রকৃত reli-

gion কাহাকে বলে তাহা তোমার এখনও শিখিতে বাকি আছে। প্রকৃত religion-এর পুরুষোত্তম London, Paris তাহার বৃন্দাবন, কলিকাতা তাহার গয়া। সেই নূতন গয়াধামে হিন্দুমাত্রই আজ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছেন।

২

গোধনপুরে উমাপতি ভট্টাচার্য্যের বাস। ব্যাকরণানুসারে উমাপতির স্ত্রীর নাম উমা হওয়া উচিত। কিন্তু বোধ হয় যে ব্যাকরণের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বড় একটা সদ্ভাব ছিল না। তাই শত্রুকে জ্বালাতন করিয়া গোধনপুর হইতে তাহাকে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে উমাপতি ঠাকুর আপনার ব্রাহ্মণীকে উমা বলিয়া না ডাকিয়া দুর্গামণি বলিয়া ডাকিতেন। পৌরাণিক ইতিহাসানুসারে দুর্গা ও যে, উমা ও সে। অতএব স্ত্রীকে দুর্গামণি না বলিয়া উমা বলিয়া ডাকিলে ইতিহাস উমাপতির কাছে সম্মানিত বই অপমানিত হইত না। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই জানেন যে যেখানে শত্রুতা, সেখানে ইতিহাসের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে,—যেমন মিলের হাতে ভারতের ইতিহাসের শ্রাদ্ধ, আর মার্শমানের হাতে বাঙ্গালার ইতিহাসের শ্রাদ্ধ। অতএব শত্রুতা বশত উমাপতি ও ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিলেন, দুর্গামণিকে কোন ক্রমেই উমা বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। নাই হউন—দুর্গামণি সাধ্বী—তিনি মনের দুঃখ মনে রাখিয়া দুর্গামণি নামেই উমাপতি ভট্টাচার্য্যের ঘর আলো করিয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং সে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল কর্ত্তব্য পালনে তিনি যে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ অতি শীঘ্র শুভদিনে শুভক্ষণে আপনার গর্ভরূপ অসীম বাগীচা হইতে পুত্ররূপ একটী ফল পাড়িয়া পতির হস্তে দিলেন। ফল পাইয়া পতি আহ্লাদগদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আহা! ভগবান এত দিনে আমাকে ফলবতী করিলেন!" সূতিকাঘর হইতে "ক্ষীণাবলবৎ" স্বরে দুর্গামণি বলিলেন—"তা শুধু আমোদ কল্লে হবে না, আপনি যেমন পণ্ডিত, ছেলেটিকেও তেমনি পণ্ডিত করিতে হইবে"। উমাপতি কিছু বেশী গদগদ স্বরে বলিলেন "হ্যাঁ তা করবো বই কি, তা করবো বই কি, আমরা পুরুষানুকম্প পণ্ডিত।"

৩

গোধনপুরে অনেক গোয়ালার বাস, অতএব গোধনপুরের মাঠে অনেক চতুষ্পদ বিচরণ করিয়া থাকে। বোধ হয় সেই কারণ বশত, পুত্র বংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন এইরূপ ভাবিয়া, উমাপতি পুত্রের নাম রাখিলেন—পশুপতি ভট্টাচার্য্য। বংশধর সম্বন্ধে এরূপ ভাবিবার কারণও ছিল। পশুপতি ভট্টাচার্য্যের কোষ্টিতে আচার্য্য লিখিলেন যে, কালে পশুপতি একজন মহাপরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হইবে। উমাপতি

এবং তাঁহার ব্রাহ্মণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা যথাকালে পশুপতিকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পশুপতির পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগ। সে প্রত্যহ লিখিবার তালপাতা ছিঁড়িয়া ফেলে; ফেলিয়া, লিখিবার সময় না লিখিয়া তালগাছে তালগাছে তালপাতা কাটিয়া বেড়ায়। প্রত্যহ চারি পাঁচটা করিয়া কলম ভাঙ্গিয়া ফেলে, বাপ মাকে বলে "লিখে লিখে কলম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে," তারপর পাঠশালায় যাইবার নাম করিয়া বাঁশবনে গিয়া কঞ্চি কাটিয়া বেড়ায়, আর কঞ্চিতে আমের আটা মাখাইয়া আটাকাটি করিয়া টীয়াপাখী ধরে। প্রত্যহ এক এক দোয়াত কালি কাপড়ে ঢালিয়া বাড়ীতে আসিয়া বলে যে, "লিখিয়া লিখিয়া কালি ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ কালি তৈয়ার না করিলে কাল পাঠশালায় যাওয়া হবে না।" মা আহ্লাদে আটখানা হয়ে মুঠা মুঠা চাল বাহির করিয়া দেন, ছেলে এক বেলা ধরিয়া তাই সিদ্ধ করে, আর কাল হাঁড়ির ভুষা লইয়া কালি প্রস্তুত করে। গুরুমহাশয় সব ছেলের কাছে চাল, দাল, তামাক, বড়ি প্রভৃতি আদায় করেন, কেবল পশুপতির কাছে পারেন না। অতএব পশুপতিকে জব্দ করিবার জন্য তিনি একদিন উমাপতিকে বলিয়াদিলেন যে, "পশু প্রায়ই পাঠশালায় আসে না, যে দিন আসে সেদিন আপনিও ভাল করিয়া লেখাপড়া করে না, অপর ছেলেকেও লেখা পড়া করিতে দেয় না।" কথাটা উমাপতির বড় বিশ্বাস হইল না। পণ্ডিতের বংশে জন্মিয়া ছেলে পড়াশুনা করে না, এও কি কথা? তথাপি সোণার চাঁদকে ডাকিয়া একবার বলিলেন—"পশুবাবা, তোমার গুরুমহাশয় বলেন যে তুমি ভাল করিয়া লেখা পড়া কর না—লেখাপড়া করিও, বাবা, দেখ যেন আমাদের বংশের অপকলঙ্ক না হয়।" পশুপতি ভাবিল যে গুরুমহাশয়কে জব্দ করিতে হইবে। অতএব সেই দিন হইতে প্রত্যহ বাড়ীতে দুই ছিলিম করিয়া তামাক চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দিতে আরম্ভ করিল। তখন গুরুমহাশয়ের মুখে পশুপতির বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা আর ধরে না। পশুপতিও দিন পাইয়া গুরুমহাশয়ের মাথায় চড়িতে আরম্ভ করিল। সে একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিল যে গুরুমহাশয় গ্রামের প্রান্তে একখানা ভাঙ্গা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও সেই ঘরে প্রবেশ করিল। উভয়ে প্রবেশ করিলে পর স্ত্রীলোকটার গায় একটা ঢিল পড়িল। 'এখন যাও, কে টের পেয়েছে' এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকটা হন্ হন্ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। দূরে পশুপতি চেঁচাইয়া উঠিল—'সাবিত্রী দিদি কোথা যাচ্চিস্?' আর এক দিন গুরুমহাশয় ধৌত বস্ত্র পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছিলেন, পথের ধারে গাছের উপর

থাকিয়া পশুপতি তাঁহার গায় একরাশি ধূলা এবং এক প্রকার সুগন্ধি জল ঢালিয়া দিয়া গাছের পাতার ভিতর লুকাইয়া রহিল। অন্ধকার হইলে সে প্রায়ই গুরুমহাশয়ের কাছা ধরিয়া টানে, গুরু-মহাশয় ধূলায় পড়িয়া দেশের ছেলের পিতা মাতার সম্বন্ধে নানা প্রকার মিষ্ট কথা কহিতে থাকেন, সেই অবসরে পশুপতি উচ্চৈস্বরে চেঁচাইতে চেঁচাইতে পলায়ন করে—

আয়রে সব দেখ্‌বি আয়
বুড় গরু ধূলা খায়।

পাঠশালা গুরুমহাশয়ের রাজ্য। পাঠশালার ছেলে সে রাজ্যের প্রজা। রাজার কৃপায় সে সকল প্রজার মধ্যে কাহারো কখন চাকুরির অভাব হয় না। কেহ রাজার পা টিপিয়া দেয়, কেহ রাজার পাকাচুল তুলিয়া দেয়, কেহ রাজার রন্ধনের নিমিত্ত কাঠ কুড়াইয়া দেয়, কেহ রাজাকে বাতাস দেয়, কেহ রাজার বাসন মাজে, কেহ রাজার হুঁকা-বরদার, কেহ রাজার গামছাবরদার, কেহ রাজার জুতাবরদার, কেহ রাজার গোয়েন্দা। গোধনপুরের গুরুমহাশয়েরও দুই একজন গোয়েন্দা ছিল। তাহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিল যে, সে দিন পশুপতি সাবিত্রী গোয়ালিনীব গায় ঢিল ফেলিয়া মারিয়াছিল। শুনিয়া গুরুমহাশয়ের ভয় হইল, পাছে পশুপতি সাবিত্রী-সম্বাদটা বেশী প্রচার করিয়া দেয়। তিনি সেই দিন অবধি পশু-পতিকে কিছু বেশী আদর করিতে লাগি-লেন। অতএব পশুপতি যা লেখা পড়া করিত, তাও আর এখন করে না। সমস্ত দিন খেলাইয়া ও গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ঠেঙ্গাইয়া বেড়ায়; এক আধ বার যখন পাঠশালায় যায়, তখন গুরুমহাশয়ের কোলে বসিয়া গুরুমহাশয়ের প্রদত্ত মুড়কীর মোয়া খায়। আবার মধ্যে মধ্যে, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না, সাবিত্রী গোয়ালিনী তাহাকে ধরিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া মোটা মোটা দুধের সর আর বড় বড় ক্ষীরের লাড়ু খাওয়ায়। মনের আনন্দে এবং খাওয়ার সুখে পশুপতি যথার্থই দিব্য কান্তি পুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। তাহাকে ফাঁপিতে দেখিয়া গুরুমহাশয়ের ভয় বাড়িতে লাগিল, আর সাবিত্রী গোয়ালিনীর আপ্‌সস্‌ বাড়িতে লাগিল, যে, এমন ছেলেটা দশ বৎসরের না হইয়া যদি বাইশ বৎসরের হইত! তা সাবিত্রীকে নরকে পাঠাইয়া একবার আমাদিগকে গোধনপুরের পাঠশালায় যাইতে হইতেছে। সেখানে আজ একটী ঘটনা ঘটিতেছে, যাহার ফল পশুপতির অদৃষ্টচক্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে অনুভূত হইবে। পশুপতি গুরুমহাশয়ের মোয়া খাইবার জন্য পাঠশালায় আসি-য়াছে। গুরু মহাশয়ের কোলে বসিয়া মোয়া খাওয়া শেষ হইলে পর, গুরুমহা-শয় পশুপতির দাড়ি ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন :—"পশুবাবা, তুমি

আমার সোণার চাঁদ, তোমার মতন ছেলে কখন জন্মায় নাই। তা, বাবা, আজ একবার তোমার বাপের এক ছিলিম তামাক আনিয়া আমাকে খাওয়াও দেখি।" পশুপতি গুরুমহাশয়ের কলিকাটি লইয়া বাড়ী গেল। বাপের তামাক এক ছিলিম চুরি করিয়া সাবিত্রী গোয়ালিনীর ঘরে বসিয়া দিব্য করিয়া তাহা খাইল। পরে খালি কলিকা লইয়া পাঠশালার পিছনে বসিয়া খানিক ক্ষণ কি করিল কেহ দেখে নাই, কেবল একটী গোয়েন্দা ছেলে আড়ালে থাকিয়া দেখিল। তারপর কলিকায় একটু আগুণ দিয়া পাঠশালায় গিয়া গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিল। কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া তদ্‌গত চিত্তে গুরুমহাশয় হুঁকায় টান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক টান দিলেন, কিন্তু ধূমোদ্গম হইল না। দশ বারটা দম দিলেন, তবুও ধূমোদ্গম নাই। তখন ভট্টাচার্য্য পাড়ার পঞ্চানন ন্যায়বাগীশের কাছে এক দিন যে ধূম-বহ্নি সম্বন্ধীয় ন্যায় শাস্ত্রের শ্লোক শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন যে, যখন ধূম নাই তখন বহ্নিও নাই। কিন্তু কলিকা নামাইয়া দেখিলেন যে আগুণ গণ্ গণ্ করিতেছে। তখন মনে মনে বুঝিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রটা সমস্তই মিথ্যা। তা ন্যায়শাস্ত্র মিথ্যা হইলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু তামাক ছিলিমটা যে বৃথা হইল এ বড় দুঃখের কথা। সে দুঃখ চাপিয়া রাখিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়া গুরুজী ভয়ে ভয়ে পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা পশু, কেমন তামাক সাজিয়াছিলে বাবা?" পশুপতি সজোরে বলিল—"কেন মহাশয়, খুব এক ছিলিম তামাক সাজিয়াছি।" তখন সেই গোয়েন্দা বালকটী উঠিয়া বলিল "না মহাশয়, ও ত তামাক সাজে নাই, ও শুকনা পেঁপে পাতা সাজিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া পাঠশালার সমস্ত ছেলে একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক আর সৌভাগ্যক্রমেই হউক, সাবিত্রী গোয়ালিনী সেই সময় গুরুমহাশয়কে দুধ দিতে আসিয়াছিল, সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাবিত্রীকে হাসিতে দেখিয়া গুরুমহাশয়ের কিছু রাগ হইল। তিনি চোক রাঙ্গাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পশুপতি, তুই বড়ই দুষ্ট হইয়াছিস্, এইখানে চারিহাত জমি মাপিয়া নাকে খত দে।" পশুপতি কোন কথাটি না কহিয়া দশ হাত জমি মাপিল। মাপিয়া পরিধেয় বস্ত্রখানি খুলিয়া রাখিল। রাখিয়া, যেন নাকে খত দিতেছে এইরূপ ভঙ্গি করিয়া, নাকে খত না দিয়া এছেলে ও ছেলের পানে চাহিয়া দিব্য করিয়া হাসিয়া লইল। তারপর দুই চারি হাত জমি বাকি থাকিতে একটা প্রকাণ্ড ডিগ্‌বাজী খাইয়া একেবারে গুরুমহাশয়ের মাথা ডিঙ্গাইয়া তাঁহার পিছনে দশ হাত তফাতে গিয়া

দাঁড়াইল। পাঠশালার সমস্ত ছেলে আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাবিত্রী ঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে দেখিলেন যে, গুরুমহাশয় ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। ডিগ্‌বাজী খাইবার সময় পশুপতি তাঁহার মস্তকোপরি যে অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্যই নাই। সাবিত্রী দেখিয়া বলিল—"যাও, আর একবার নেয়ে এসগে।" যেন চটকাভাঙ্গা হইয়া গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, আবার নাইব কেন?" সাবিত্রী বলিল—"দেখ, মুখে কি গড়াইয়া পড়িতেছে।" তখন 'রাম, রাম' বলিয়া গামছা লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গুরুমহাশয় স্নানে গমন করিলেন। পাঠশালার সমস্ত ছেলে হৈ হৈ করিতে করিতে তাঁহার পিছে পিছে চলিল। এদিকে সাবিত্রী ঠাকুরাণী পশুপতিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার কচি ঠোঁটে সজোরে চুমো খাইতে খাইতে আপন বাড়ীতে চলিয়া গেল।

৪

দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই অপূর্ব্ব ডিগ্‌বাজী-বার্ত্তা সমস্ত গোধনপুর গ্রামে প্রচারিত হইল। অতএব উমাপতি ভট্টাচার্য্য এবং দুর্গামণি দেবী ও যথাসময়ে সে সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। সম্বাদ পাইয়া উমাপতির প্রথমে পুত্রের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জন্মিল এবং ডিগ্‌বাজীর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া গুরুমহাশয়ের যেরূপ ভয় হইয়াছিল, তাঁহারো মনে কিয়ৎপরিমাণে সেই রূপ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি আস্তে আস্তে দুর্গামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি ও ব্রাহ্মণি, ছেলেটা কিছু খারাপ হয়েছে বোধ হইতেছে না?" ব্রাহ্মণী, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী, ভাতের হঁড়ির কাটিটা আস্ফালন করিয়া সদর্পে, উত্তর করিলেন—"কেন খারাপ আবার কিসে দেখ্‌লে? একটা ডিগ্‌বাজী খেয়েছে বৈ ত নয়। তা ওর ঠিকুজিতে ত লেখাই আছে যে ও খুব বীর হবে। এ ত আহ্লাদের কথা।" ঠিকুজীকোষ্ঠী সত্বে ও তত বড় ডিগ্‌বাজীতে উমাপতি বড় একটা আহ্লাদের কারণ দেখিতে পাইলেন না। অতএব ডিগ্‌বাজীর ভয়ের উপর আবার ব্রাহ্মণীর ভাতের কাটির ভয় উপস্থিত হইল। অতএব পাছে গৃহিণীর হস্তস্থিত ভাতের কাটিটাও ডিগ্‌বাজী খাইয়া ফেলে সেই ভয়ে একটু official রকম হাসি হাসিয়া, উমাপতি উত্তর করিলেন—"হাঁ, তুমি যা বলিতেছ তাই বটে, তাই বটে।" সেইদিন বৈকালে গ্রামের বিজ্ঞ এবং প্রাচীনেরা ও দুর্গামণির মত সমর্থন করিলেন। ভবদেব ঘোষ মহাশয়ের শিবের মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় ডিগ্‌বাজী-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন যে "সত্যযুগে পবননন্দন হনুমান লম্ফ দিয়া সাগর পার হইয়া স্বর্ণময় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমাদের গুরু-

মহাশয় জলের সাগর না হউন, বিদ্যার সাগর বটে”—শ্রোতারা বলিয়া উঠিলেন, “তা বটেই ত, তা বটেই ত, এই সে দিন তিনি, সাবিত্রী গোয়ালিনীর কয়টা গরু, না দেখিয়াই বলিয়া দিলেন”—ন্যায়বাগীশ মহাশয় বলিতে লাগিলেন—“তা, এই যুগশ্রেষ্ঠ কলিযুগে উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র পবননন্দনের অবতার। সে অক্লেশে গুরুমহাশয়রূপ বিদ্যার সাগর লম্ফ দিয়া পার হইয়াছে। অতএব সে স্বর্ণময় কলিকাতায় গিয়া প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করিবে।” উপরে দেখা গিয়াছে যে, আজ কাল গোধনপুরে যুগবিপ্লব ঘটিয়াছে; আজকাল গোধনপুরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই সোণা-রূপার জন্য লালায়িত। অতএব পণ্ডিত প্রধান ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ডিগ্‌বাজী-তত্ত্বের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা সকলেরই মনে লাগিল। সকলেই বলিলেন—“ন্যায়বাগীশ মহাশয় যাহা বলিতেছেন তাহা কি কখন মিথ্যা হয়? মুড়াগাছার জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পর ওঁর মতন পণ্ডিত ত আর ভারতে জন্মায় নাই। উনি ঠিকই বলিয়াছেন। বলি ও উমাপতি, ছেলেটিকে কলিকাতায় রাখিয়া কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শেখাও। ও হতে তোমার মুখ উজ্জল হবে, তোমার বংশ উদ্ধার হবে।” উমাপতি বাড়ীতে গিয়া গৃহিণীকে এই সকল কথা জানাইলেন। গৃহিণী বলিলেন—“তা, আমিও ত তাই বলিতেছিলাম। এখন এক কাজ কর, আর দেরি করিও না, শীঘ্র পশুপতিকে কলিকাতার একটা ইস্কুলে পড়িতে দেও।” তখন শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমতী দুর্গামণি দেবী উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পটলডাঙ্গায় কাঙ্গালিচরণ চক্রবর্ত্তী নামক তাঁহাদের যে একজন যজমান আছেন, তাঁহাকেই পশুপতিকে লেখাপড়া শেখাইবার ভার অর্পণ করিবেন।

৫

পর দিবসেই উমাপতি ভট্টাচার্য্য কাঙ্গালিচরণের বাসায় আবির্ভূত হইয়া কাঙ্গালিচরণকে এবং কাঙ্গালিচরণের পিতা, পিতামহ প্রভৃতিকে তেত্রিশ কোটী দেবতার উপরে আসন প্রদান করিয়া নিজ ব্যক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। এবং কাঙ্গালিচরণকে ইহাও বলিলেন,—“আমার পশুপতির পণ্ডিতের বংশে জন্ম, তাহার মেধা অসাধারণ, তাহাকে লেখাপড়া শেখাইতে অধিক ব্যয়ও হইবে না, অধিক সময়ও লাগিবে না। অতএব, বাপু, তুমি যদি কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া আমার ছেলেটিকে মানুষ করিয়া দেও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চিরকাল আশীর্ব্বাদ করিব এবং তুমিও তোমার সেই পুণ্যবলে তুচ্ছ দেবলোক ত্যাগ করিয়া দেবদুর্ল্লভ দৈত্যলোক প্রাপ্ত হইবে।” কাঙ্গালিচরণ উমাপতির ন্যায় পণ্ডিত নন, অতএব দৈত্যলোকের মাহাত্ম বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ

কাল হাঁ করিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিলেনঃ—"দেখুন, আমার সময় এখন বড় ভাল নয়, বিশেষ আপনি জানেন যে সম্প্রতি যে মেয়েটীর বিবাহ দিয়াছিলাম, সেটি বিধবা হইয়াছে। সে জন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত কাতর আছি। আবার দুইচারি মাসের মধ্যে ছোট মেয়েটির বিবাহ দিতে হইবে। তাহাতেও সমূহ ব্যয়। তা, আমি আপনার ছেলেটিকে আমার বাসায় রাখিব এবং তাহার খোরাক পোষাক দিব, আপনি কিন্তু অনুগ্রহ কবিয়া তাহার ইস্কুলের বেতন এবং পুস্তক ইত্যাদির ব্যয় কোন রকমে সংগ্রহ করুন"। উমাপতি ভট্টাচার্য্য মুর্খ ও সঙ্গতিহীন বটে, কিন্তু সচরাচর তাঁহার ন্যায় মুর্খ ও সঙ্গতিহীন ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা দাতার দুঃখের কথায় আপন আপন কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া নিজের দুঃখের কথা দাতার কর্ণে যেমন গুঁজিয়া গুঁজিয়া দেন, তিনি তেমন করিলেন না। তিনি কিছু ভাল মানুষ। অতএব কাঙ্গালি বাবু যতটুকু সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণকুলতিলক শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঙ্গালি বাবুর বাটী হইতে বাহির হইয়া অনতিদূরে একটা অতি অপকৃষ্ট এবং অপযশদূষিত পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। কাহার নিকট গেলেন তাহা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না। এই পর্য্যন্ত বলিব যে, দুই ঘণ্টাকাল পরে পেট্‌টি বেশ উচ্চ করিয়া এবং মোটা ঠোঁট দুইটা খুব লাল টক্ টকে করিয়া শ্রীযুক্ত উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় কাঙ্গালি বাবুর বাসায় আবির্ভূত হইয়া কাঙ্গালি বাবুকে জানাইলেন যে "আমার একটি প্রাচীনা এবং সঙ্গতিপন্না ব্রাহ্মণী শিষ্যা ইস্কুলের মাহিয়ানা এবং পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় করিবার খরচ দিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন"। শুনিয়া কাঙ্গালি বাবু বলিলেন—"তবে আপনার যে দিন ইচ্ছা হয় সেই দিন পশুপতিকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন"।

দ্বিতীয় ভাগ।

১

পশুপতি, কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার লেখাপড়ায় পূর্ব্বেও যেমন মন ছিল এখনও তেমনি মন। সে প্রাতে নয়টার পূর্ব্বে ইস্কুলে গিয়া কপাটি খেলে, ইস্কুল বসিলে পর এক আধ বার কেলাশে যায়, বাকি সময় মালীর ঘরে বসিয়া মিঠাই ও তামাক খাইয়া কাটাইয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে গোধনপুরে যায় আর সাবিত্রী গোয়ালিনীর নিকট হইতে টাকা আনিয়া মনের সাধে খায় আর থিয়েটর দেখিয়া বেড়ায়। এইরূপে আটবৎসর

কাটিয়া গেল। তারপর পশুপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিল। পরীক্ষাগৃহে তাহার পাশে একটী ভীরুস্বভাব ও ক্ষীণকায় বালক বসিয়া লিখিতেছিল। তাহাকে মারপিটের ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট যত পারিল তত জানিয়া লইয়া এবং বাকি লুক্কায়িত পুস্তক দেখিয়া লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। শুধু উত্তীর্ণ হইল তা নয়, একটী ছাত্রবৃত্তিও পাইল। তখন কাঙ্গালি বাবুর পরামর্শে উমাপতি ভট্টাচার্য্য পুত্রের একটী বিবাহ দিলেন। কন্যাটী পরম রূপবতী এবং গুণবতী। কন্যার পিতার অবস্থা বড় ভাল নয়। তথাপি 'পাস'করা জামতা পাইলেন বলিয়া ঋণ করিয়া কন্যাকে কতকগুলি সোণারূপার অলঙ্কার এবং কন্যার শ্বশুরকে কিছু নগদ টাকাও দিলেন। উমাপতি ভট্টাচার্য্যের এবং তাঁহার ভার্য্যা শ্রীমতী দুর্গামণি দেবীর জন্ম সার্থক হইল।

২

এদিকে শ্রীমান্ পশুপতি ভট্টাচার্য্য দেখিলেন যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে এবং তিনি একটা 'পাস' ও করিয়াছেন। অতএব তিনি এখন একটা মানুষ—একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিলেই হয়। অতএব আর পড়াশুনা অনাবশ্যক, বৃথা valuable সময় নষ্ট করা বই নয়। বাবু যে কখনও পড়াশুনা করিয়াছিলেন তা নয়। তবে আগে কাঙ্গালি বাবুর ভয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে একটুকু আধটুকু বিড় বিড় করিতেন, এখন তাও বন্ধ করিলেন। এখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পান, মনে করিলেই স্বয়ং বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে পারেন, অতএব আর কাঙ্গালি বাবুকে ভয় করেন না। তবে যে এখনও কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি এখন সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। পরোপকার করিতে হইলে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া পরকে দিতে হয়, ইহা তিনি পুরাণ ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে রামচন্দ্র বালিরাজার রাজ্য আপনি না লইয়া সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন; ক্ষুধার্থ অলফ্রেদ আপনি রুটীখানি না খাইয়া পরকে খাইতে দিয়াছিলেন; এবং তৃষ্ণাতুর সর্ ফিলিপ সিদ্‌নি আপনি জল টুকু না খাইয়া অপরকে খাইতে দিয়াছিলেন। অতএব ঐতিহাসিক প্রথামত পরোপকার ব্রত পালনার্থ, তিনি আজকাল আপনাকে লেখাপড়ায় বঞ্চিত করিয়া, কাঙ্গালি বাবুর হিতার্থ তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীভ্রষ্টা (কেন না পতিহীনা) কুঞ্জকামিনী দেবীকে অধিক রাত্রে গোপনে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোপনে লেখাপড়া শেখাইবার কারণ এই যে, সকলকে জানাইয়া পরোপকার করিলে ধর্ম্ম নিষ্কাম না হইয়া স্বার্থদূষিত হয়। এ রকম দুই

চারিটা বড় বড় নীতি সূত্র পশুপতি বাবুর সংগ্রহ করা ছিল, কেন না তিনি যে শ্রেণীর patriot, তাহাদিগের মধ্যে ঐরূপ সংগ্রহ করা আজ কাল একটা পাকা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরের বাহিরেও পশুপতি বাবু এখন সেই পরোপকার ব্রতে ব্রতী। অতএব স্বয়ং পড়াশুন করা ঘোর selfishness মনে করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থ বক্তৃতা আদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশের যাহাতে উন্নতি হয় প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমত পাড়ার কতকগুলি ছেলে লইয়া একটা Debating Club করিলেন। সেখানে প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্ম বিষয়ক, নীতি বিষয়ক, ইংরাজ রাজার দৌরাত্ম্য বিষয়ক, বাল্যবিবাহ বিষয়ক, অবরোধ-প্রণালী বিষয়ক, বিধবা-বিবাহ বিষয়ক, এবং আরো অনেক বিষয় বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইতে লাগিল, এবং প্রবন্ধ পাঠ হইলে পর ভূমিতে পদাঘাত, টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত এবং কপালে করাঘাত সহকারে মহা তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। এক একটা বক্তৃতা দীর্ঘই বা কত! বক্তৃতায় এক একটা শব্দ দীর্ঘই বা কত! বক্তৃতা করিতে করিতে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস দীর্ঘই বা কত! আবার সকলের অপেক্ষা পশুপতি বাবুর দৈর্ঘ্যের দিকে বেশী দৃষ্টি। তিনি একদিন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস খুব বড় করিতে গিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ রাঙ্গা করিয়া চোক কপালে তুলিয়া ধড়াস্ করিয়া টেবিলের উপর সুদীর্ঘ হইয়া পড়িলেন। তিনি যেমন পড়িলেন, অমনি ক্লবের অপর সমস্ত সভ্য সজোরে টেবিলে হাত চাপড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল :—"Capital! Capital! we have at last got the man we were wanted for. We unanimously make Babu Pasupati Bhattacharya President of the Pataldanga Debating Club" একজন চিন্তাশীল দর্শক একাকী ঘরের এক কোণে বসিয়াছিলেন। তিনি এই সময় এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন—'*encore* পশুপতি বাবু, *encore*!'

৩

এইরূপে দুই এক মাস তর্কের পরেই সভ্যগণ প্রায় সকল বিষয়েই স্থিরসিদ্ধান্ত হইলেন। প্রায় সকল বিষয়েই সে সিদ্ধান্তের অর্থ—উদ্ধার। ধর্ম্মের উদ্ধার, নীতির উদ্ধার, জাতির উদ্ধার, দেশের উদ্ধার, বালবধূর উদ্ধার, বালবিধবার উদ্ধার, সমস্ত ভারতমহিলার উদ্ধার, বিদ্যার উদ্ধার, অবিদ্যার উদ্ধার, উদ্ধার, উদ্ধার, উদ্ধার। এখন হইতে সেই মহাবল-মহাকায়-পশু-পরিচালিত, অসীম-মহিমাময় Pataldanga Debating Club এ উদ্ধার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না—এখন হইতে সেখানে উদ্ধার ভিন্ন আর কিছু কলিকা পায় না। এক দিন পশুপতি বাবুর ক্লবে

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে পর, ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্যদেশের চিরপ্রচলিত, অতএব অগম্মান্য, প্রথামত পশুপতি বাবুর আমন্ত্রণে সভ্যেরা নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন—"আমার মতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত।"

আর এক জন অমনি বলিলেন—"আমারও সেই মত।"

তখন এক এক জন করিয়া সমস্ত সভ্য বলিলেন—"আমাদের সকলেরই সেই মত।"

শুনিয়া পশুপতি বাবু উঠিয়া বলিলেন:—

"সভ্য মহাশয়গণ, আপনারা আপনাদের দেশপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণতা এবং বাগ্মিতা পুরঃসর যে মত প্রকটন করিলেন, আমিও সেই মতের মতানুযায়ী। দেখুন, বঙ্কিম বাবুর লেখা কত খারাপ। তাঁহার চন্দ্রশেখর নামক নবন্যাস খানি এক রকমে অতি উত্তম, কেননা উহা সুদৈর্ঘ্য-সম্পন্ন। কিন্তু উহার বহির্দ্দেশ মনলোভা হইলে কি হইবে, উহার অন্তঃপুর অতি শোচনীয় রূপে জঘন্য। (Hear, hear). আপনারা একবার বিগলিতচিত্তে কায়মনোবাক্যে ভাবিয়া দেখুন বঙ্কিম বাবু ঐ নবন্যাসে কি ভয়ঙ্কর ধর্ম্মের এবং নীতির এবং মনুষ্যত্বের বিপ্লব এবং বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সেই সুশীলা, শোকাতুরা, জগজ্জনতাড়িতা, কুসুমিতা, কান্তরতা শৈবলিনীকে একবার করাল হিন্দু zenanaর কবলিত কণ্ঠ হইতে মহামতি, পরহিতৈষী Foster সাহেবের দ্বারা নিষ্কোষিত করিয়া পুনরপি তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন।" (Hear, hear, এবং উচ্চৈস্বরে Shame! shame! এই সময়ে অনেকের চক্ষু বড় হইয়া ঘুরিতে লাগিল, অনেকে দাঁতখামাটি মারিয়া ঘুসি ওঁচাইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল—কোথা সে, কোথা সে—উঁঃ—উঁঃ—কাঁটালপাড়া। কাঁটালপাড়া। Shame এবং alas! alas!) বিক্ষুব্ধ সিন্ধু কিঞ্চিৎ প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে পর, সভাপতি মহাশয় পুনর্বার বলিতে লাগিলেন:—

"আবার দেখুন, বিষবৃক্ষে বঙ্কিম বাবু কি বুদ্ধির ধ্বজা উড়াইয়াছেন! চিত্তশালিনী, দুঃখিনী, পতিবিয়োগিনী জননী সূর্য্যমুখীকে সেই নরকযন্ত্রণাময়, নিদারুণ, নিষ্পীড়ন, নির্বিঘ্ন, অবরোধময় zenana হইতে নিষ্ক্রান্ত দিয়া আবার তাহাকে তাহারই হৃদয়াভ্যন্তরে পূরিয়া রাখিলেন। (Hear hear)। সভ্যমহাশয়গণ, বঙ্কিম বাবুর আরো কিছু পরিচয় দিব। তিনি হীরা দাসীকে কতই না যন্ত্রণা দিয়াছেন! সে বালুকা-বিধবা! তাহার physiological want কত! তা সে করিয়াছিলই বা কি? তথাপি সেই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নিশানবাহী, নিষ্কলঙ্ক বঙ্কিম, পরিচারিকা প্রধান, পতিব্রতাচূড়ামণি হীরা মন্মোহিনীকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছেন! হায়! হায়! উঃ আর সহ্য হয় না! বুক

ফাটিয়া যায়! (Hear, hear, এবং উচ্চৈস্বরে, বুক ফাটিয়া যায়! এবং সজোরে বুকে করাঘাত), আবার সেই রমণীকুল-রত্ন, চিরদুঃখিনী, বিধবা-গরবিনী রোহিণী সুন্দরীকে চিত্তপটে আনয়ন কর। বঙ্কিম বাবু কি না সেই অতুলজ্যোতি, পতিতপাবনী, পুণ্যবতীকে সুখী করিয়া আবার গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন! তাহাকে উদ্ধার করিয়া আবার বধ করিলেন! সভ্যমহাশয়গণ! বঙ্কিম বাবুর দ্বারা দেশের উদ্ধার হইবেনা। তিনি হিন্দুরমণীর শত্রু—হিন্দু বিধবার শত্রু! তিনি আমার শত্রু, তোমার শত্রু, আমার স্ত্রীর শত্রু, তিনি তোমার স্ত্রীর শত্রু, তিনি শত্রুময়! তিনি দেশের শত্রু, তিনি ভারতের শত্রু, তিনি ভারতমাতার শত্রু! তাঁহার গ্রন্থাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের কলঙ্ক। তাঁহার গ্রন্থাবলী পোড়াইয়া ফেল।" (সকলে চেঁচাইয়া উঠিল—'পোড়াইয়া ফেল, পোড়াইয়া ফেল'—ঘরে একটা তাকে বঙ্কিম বাবুর কতক গুলা পুস্তক ছিল, তৎক্ষণাৎ সভ্যেরা সেই গুলা পোড়াইয়া ফেলিল। পোড়াইয়া বুক বাজাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—We are practical men—আমরা যা বলি তাই করি।) পশুপতি বাবু আবার বলিতে লাগিলেন:—"বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠই বা কি? তাহাতে দুই একটা উদ্ধারের কথা আছে বটে। কিন্তু সে গ্রন্থখানা ভীষণ কুসংস্কারময়। তাহাতে কেবল দুর্গা কালীর কথা আর ন্যাঙটা বৈরাগীর হরেকৃষ্ণ আছে। ভারতোদ্ধার ন্যাঙটা বৈরাগীর কাজ নয়। নিরামিষ ভাত আর নিরামিষ জল খেয়ে লড়াই করা যায় না। ভারতোদ্ধার আমাদের কাজ।"

তখন সমস্ত সভ্য দাঁড়াইয়া টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল "আমাদের কাজ, আমাদের কাজ"। এমন সময় একজন সভ্য দ্রুতপদে আসিয়া বলিল—"মামা, মামা, ভুলিয়া গিয়াছ"। অমনি সেই ক্রোধাগ্নিপ্রজ্জ্বলিত যুবকবৃন্দ বুক চাপড়াইয়া "আমাদের কাজ, আমাদের কাজ" বলিয়া আরো চীৎকার করিতে করিতে মহাবেগে ক্লব-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। আমরা তখন সেখানে ছিলাম। কিছু ভয় পাইয়া সেই চিন্তাশীল দর্শকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইহারা এইমাত্র বঙ্কিম বাবুর বই গুলি পোড়াইল, এখন কি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুকে পোড়াইতে গেল নাকি?" দর্শক একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া ঘরে একটি ঘড়ি ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছেন না, রাত্রি নয়টা বাজে?" আমরা বলিলাম—"তাতে হ'ল কি?" দর্শক বলিলেন—"ও দিকে যে দোকান বন্ধ হয়!"

৪

কি দুর্ভেদ্য এবং রহস্যময় নির্ব্বন্ধবলে দিনের পর দিন আইসে বলিতে পারি না, কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া গিয়া আবার কলিকাতায় শনিবার আসিল,

আবার সেই কলিকাতা নগরস্থ Pataldanga Debating Club এর অধিবেশন হইল, আবার পশুপতিবাবু প্রভৃতি সেই সকল সভ্য ক্ষত এবং অক্ষত শরীরে সমবেত হইলেন, আবার সেই হতভাগ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা উত্থাপিত হইল। পশুপতিবাবু বলিতে লাগিলেন ;—

"দেখুন, সভ্য মহাশয়গণ, আগত শনিবার আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে একমতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, সেই সকল গ্রন্থ অতি অপকৃষ্ট এবং অপদার্থ, যে হেতু তাহাতে উদ্ধারের কথা নাই এবং উদ্ধারের প্রতিকূলে অনেক উজ্জ্বলময় উদাহরণ উদ্ঘাথিত হইয়াছে। আজ আমি বলিতে চাই যে বঙ্গে, মূর্খ, মেধাবতী মেষপালগণ যে হেমচন্দ্রকে কবিবর বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন, সে হেমচন্দ্র কবিবর নন, তিনি কপিবর (করতালি এবং হাস্য)। দেখবেন, মহাশূরগণ, আপনারা গূঢ় বিচক্ষণ করিয়া দেখবেন যে, হেম বাবুর পুস্তকেও উদ্ধারের কথা নাই। বঙ্কিমবাবুর ন্যায় হেমবাবু ও উদ্ধার বিনাশী। শুধু তাই নয়, হেমবাবুর ন্যায় ভয়ানক, ভীষণ, ভীরু, ভূষণ্ডি ভূভারতে ভ্রমে ও ভ্রূণহত্যা করিতে ভয় করে নাই। বলিতে লজ্জা হয়, যাঁহাকে আমরা বঙ্গের কপিবর বলিয়া আস্ফালন করি, তিনি কি ভীরু, কি কাপুরুষ! (Shame ! shame ! এবং মুষ্ট্যাস্ফালন) তিনি তাঁহার প্রথমভাগ কবিতাবলীতে একটি অতি সঙ্গতময়, সাহসময়, সম্ভ্রমসমুত্থান কবিতা ছাপাইয়া ছিলেন। আহা ! সেই ভারত-সঙ্গীত নামক সমুন্নত কবিতায় তিনি ভারতমাতার উদ্ধারের জন্য কত কান্নাই কাঁদিয়া ছিলেন। (সকলের ক্রন্দন।) কিন্তু হায় ! সে কবিতা এখন কোথায় ? বলি, স্বয়ং হেমবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে কবিতা এখন কোথায় ? তিনি কি দুষ্ট, দুর্দান্ত, দুর্ম্মতি, দুরভিসন্ধি, দুর্ব্বল সাহেবের ভয়ে তাহা চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখেন নাই ? চুরি করিয়া না রাখিলে হেমবাবুর দ্বিতীয় সংস্কারে তাহা দেখিতে পাইনা কেন ? আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, হেমবাবু চোর (Hear, hear). আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি হেমবাবু চোর। (সকলে সমস্বরে—হেমবাবু চোর, হেমবাবু চোর)। তার পরে হেমবাবু আর উদ্ধারের কথা মুখেও আনেন নাই। বরং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় একবার উদ্ধার করিয়া আবার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। সভ্যমহিষগণ, হেমবাবুর সেই বৃত্রসংহার স্মরণ করুন। ইন্দ্রের অন্তঃপুর অবরুদ্ধা, সন্তাপিতা, শোচনীয়া শচী যদি বা সেই ভীষণ অন্তঃপুররূপ কারাগার হইতে পালাইয়া অরুচির মুখে একটুকু আধখুকু চাটনি দিবার পথ করিলেম, অমনি উদ্ধারবিলাসী হেমবাবু আসিয়া তাঁহাকে আবার সেই imprisonment করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টাই করিলেন। কেন, সে শোচনীয়া সতী হেমবাবুর কি করিয়াছিল যে তাহার উপর তাঁহার এত রাগ ?

আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে সে হেমবাবুর কুৎসিত, কদর্য্য, করুণাময় অনুরোধ রক্ষা করে নাই বলিয়া সেই বাল বিধবা শচীর উপর তাঁহার এত রাগ। এখনকার বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তারা Lord Byron এর ন্যায় আপনাদের গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। (এক জন সভ্যকে কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চিৎ করিতে দেখিয়া)—"কেন, আপনি কি এ কথা স্বীকার করেন না? তবে আরো অকাট্য প্রমাণ দিতেছি শুনুন। হেমবাবু সম্প্রতি দশমহাবিদ্যা নামক যে একখানি কাব্য ছাপাইয়াছেন তাহা কি? আপনারা কি জানেন না যে, সেই কাব্যে তিনি দশজন বারবিলাসিনীর কথা লিখিয়াছেন? লিখিয়া পাঠকের চোকে ধূলা দিবার জন্য বেদান্ত সংহিতার অবিদ্যা শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি না? কিন্তু তিনি কি আমাদিগকে এমনি বোকা মনে করিয়াছেন, যে অবিদ্যা শব্দের যে একটা বারবিলাসিনী অর্থ আছে তাহা আমরা জানি না? হায়! কি কুসংস্কার! কি স্পর্দ্ধা! তা সভ্যমনুষ্যগণ বিবেচনা করুন, হেমবাবু এত বারবিলাসিনীর কথা কেমন করিয়া জানিলেন? অবশ্যই তাঁহার বারবিলাসিনীর সহিত কুৎসিত, কদর্য্য—আর না, সভ্য মহাশয়গণ, *আর না, আর বলিতে পারি না, কে যেন পেটের ভিতর থেকে আমার জিব টানিয়া ধরিতেছে, O it is the আঁকুশি of my pure virtuousness!—অতএব আর না! তবে এইমাত্র বলিব যে বারবিলাসিনীর সহিত আমরাও আলাপ করিয়া থাকি, শুধু আলাপ কেন, প্রণয়ও করিয়া থাকি, এবং সুবিধা দেখিলে তাহাদের সহিত ঘরকন্নাও করি। কিন্তু আমাদের কথা এক, হেমবাবুর কথা আর। আমরা বারবিলাসিনীদিগকে উদ্ধার করিব বলিয়া তাহাদের সহিত প্রণয় করি। হেমবাবু কি জন্য তাহাদের সহিত প্রণয় করেন? তিনি উদ্ধারের যত প্রয়াসী, তাহা ত দেখাই গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, এখনকার বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। সভ্যমহাশয়গণ এখন অবশ্যই বোধগম্য করিয়াছেন যে হেমবাবু একজন উদ্ধারবিনাশী, গণিকাবিলাসী, গর্হিত, গর্দ্দভ, গোবেচারা মানুষ (Hear hear, এবং বারম্বার করতালি)।

তারপর পশুপতি বাবু, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সকল কথা লিখিবার আমাদের স্থান নাই—সে জন্য আমরা বড় দুঃখিত। কারণ, পশু মহাশয়ের ন্যায় সুবিজ্ঞ সু-

পণ্ডিত, সুরুচিসম্পন্ন সমালোচকের সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে কাজ দেখিত। অতএব তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, যত সংক্ষেপে পারি তাঁহারই কথায় তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"নবীন বাবুর নবীন বয়সে কিছু তেজ ছিল ; এখন তিনি প্রাচীনের দলে পড়িয়াছেন। অতএব তাঁহার দ্বারা আর কাহারো বা আর কিছুরই উদ্ধার হইবার প্রত্যাশা নাই। তাঁহার বঙ্গমতী পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি এখন কেবল পূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিতে সক্ষম।

কালীপ্রসন্ন বাবু এ জন্মটা চিন্তা করিয়াই কাটাইলেন—প্রমাণ "প্রভাত চিন্তা" এবং "নিভৃতচিন্তা"। কিন্তু আমাদের moral courage আছে, চিন্তার বিষয় ত আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা কাজ খুঁজি। কালী প্রসন্ন বাবু কোন কাজই করিলেন না। আমরা practical men, কাজ চাই।

দ্বিজেন্দ্রবাবু ঠিক্ একটি সেকেলে দ্বিজবর—কূটকচালে' দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। তাঁহার নিকট উদ্ধারের কোন আশা নাই। তাঁহাকে যদি উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়, তবে আগে তাঁহাকে দর্শন পথ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। সে ভয়ানক উদ্ধারকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে যত প্রয়াস আবশ্যক, তাহার এক শতাংশ প্রয়াসে সহস্র হতভাগিনী বারবিলাসিনীকে উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমরা practical men, অতএব আমরা শেষোক্ত উদ্ধার কার্য্যেই নিযুক্ত হওয়া শ্রেয় মনে করি।

অক্ষয় বাবু খুব চোট্‌চাট্ বলিতে পারেন বটে। কিন্তু তিনি অতি নির্ব্বোধ। তিনি এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর তাড়াইয়া দিতে চান—তাঁহার সাধারণী কেবল সেই কথা লইয়াই ব্যস্ত। তিনি বুঝেন না যে, যে দেশে লোকের উদ্ধারের দিকে মন নাই, সে দেশ ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন হওয়াই উচিত। অক্ষয় বাবু প্রকৃত দেশহিতৈষী নন। প্রকৃত দেশহিতৈষী হইলে, তিনি সাধারণীতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অমন অনিষ্টকর আর্টিকেল না লিখিয়া বঙ্গদর্শনে দাবা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, প্রভৃতি যথার্থ হিতকর বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিতেন।

রবীন্দ্র বাবুকে কেহ কেহ কবি বলে। যে বলে সে বলুক, আমরা বলিব না। তিনি এই অল্প বয়সে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু বলিতে গেলে তাঁহার কোন কবিতাতেই 'স্বদেশ', 'ভারত', 'ভারতমাতা', 'উদ্ধার', প্রভৃতি কোন শব্দই দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গে যতদিন patriot আছে, ততদিন কেহই রবীন্দ্রবাবুর কবিতাকে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিবে না। তবে বঙ্গের যে রকম অবনতি চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে বিশ পঞ্চাশ বৎসর পরে বঙ্গে আর patriot দেখা যাইবে

না। বোধ হয় তখন রবীন্দ্র বাবু কবি নাম লাভ করিতে পারেন। রবীন্দ্রবাবু ছেলে মানুষ—ভরসা করা যাইতে পারে যে প্রকৃত মানুষশূন্য বঙ্গে তিনি বৃদ্ধ বয়সে কপীন্দ্ররূপে শোভা পাইবেন।

রামদাস বাবু এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর কথা বেশী বলিতে ইচ্ছা হয় না। কেন না তাঁহারা প্রায় চিরকালটা গয়াতে পিণ্ডদান করিয়াই কাটাইলেন। তাঁহাদের পোড়া প্রত্নতত্ত্বে কেবল প্রেত্যা উদ্ধার হয়, কখনও মানুষ উদ্ধার হইতে দেখা যায় না।

চন্দ্রশেখর বাবু একজন অতি unpractical অকর্ম্মণ্য লোক—প্রমাণ, তাঁহার "উদ্ভ্রান্তপ্রেম"। মরা মানুষকে আবার ভালবাসা কি? আমরা যাহাকে ভাল বাসি, সে মরিয়া গেলে আর তাহাকে ভাল বাসি না। ভালবাসা যত প্রচারিত হয় ততই দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, বিশ্বের মঙ্গল। সেই জন্য আমরা বিবাহ করিয়া একটি রমণীতে ভালবাসা গুটাইয়া রাখিতে চাই না, অসংখ্য রমণীতে ভালবাসা ছড়াইয়া দি। চন্দ্রশেখর বাবুকে এবার দেখিতে পাইলে, তাঁহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব।"

এইরূপে আরো অনেকগুলি গ্রন্থকর্ত্তার গুণকীর্ত্তন করিয়া পশুপতি বাবু শেষে বলিলেন :—

"সভ্যমহাশয়গণ, দেখিলেন যে বঙ্গসাহিত্যরূপ বিস্তীর্ণ ময়দানে কেবল গরু চরিয়া বেড়ায়, মানুষ প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু দুঃখিত হইবেন না, ক্ষুব্ধ হইবেন না, আমাদের দেশের সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লজ্জাবনতমুখী হইবেন না—"

এই সময় একজন সভ্য একটী পাশের ঘর হইতে মুখ মুছিতে মুছিতে সভাগৃহে আসিয়া গান ধরিলেন :—

লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আবরি—

শুনিয়া পশুপতি বাবু কাতরস্বরে বলিলেন "I say Hem, তোমার পায় পড়ি, ভাই একটু থাম, আমার হ'ল বলে।" হেম বাবু চুপ করিলেন, পশু বলিতে লাগিলেন :—

"আমাদের সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আপনারা লজ্জিত হইবেন না"—

এবার হেম বাবু একটু গুণ গুণ স্বরে গাইলেন :—

লাজে অবনতমুখী—

পশুপতি বাবু তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে বলিলেন :—

"অকূল সমুদ্রে যেমন ধ্রুব তারা, গঙ্গায় যেমন Hughli Bridge, গড়ের মাঠে যেমন মনুমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট হাউসে যেমন গম্বুজ, সোণাগাছিতে যেমন স্বর্ণবাই, যুবতীর পায় যেমন মল, গরুর ডাবায় যেমন জাব, পুরুষের প্রস্রাবে যেমন কড়ি, বঙ্গীয় গ্রন্থরাশির মধ্যে তেমনি ইন্দ্রনাথ বাবুর "ভারতোদ্ধার"—বঙ্গের patriot-

দিগের একমাত্র Bible "ভারতোদ্ধারে" যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে কার্য্য কর, মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিবে ভারতমাতা উদ্ধার হইয়াছেন, ভারত উদ্ধার হইয়াছে, বিদ্যা উদ্ধার হইয়াছে, অবিদ্যা উদ্ধার হইয়াছে, সব উদ্ধার হইয়াছে। "ভারতোদ্ধার" বাঙ্গালা সাহিত্যের মুকুট —এমন গ্রন্থ এদেশে এখন ও লিখিত হয় নাই।" (Hear, hear এবং সমস্বরে—"ভারতোদ্ধার' বাঙ্গালার এক মাত্র গ্রন্থ—it is our Bible).

এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে এক জন ছাড়া সমস্ত সভা গত শনিবারের ন্যায় বাহিরে না গিয়া, পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। রাত্রি তখন ১১ ঘণ্টা। পশুপতি বাবু কাহাকে কিছু না বলিয়া যেন পার্শ কাটাইয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু কাঙ্গালি বাবুর বাড়ীর দিকে না গিয়া আর এক দিকে গেলেন। কোথায় গেলেন তাহা এখন বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার দ্রুত পাদবিক্ষেপ দেখিয়া বোধ হইল যেন একটা খুব জাঁকাল রকম কাজে যাইতেছেন।

ধূমকেতু ও উল্কাপাত।

"Mysterious visitant,———
* * *
Infinity is written on thy beams ;
And, thought in vain would through the pathless sky
Explore thy secret course. Thy circle seems
Too vast for time to grasp."

Conder.

"Oft shalt thou see, ere brooding storms arise,
Star after star glide headlong down the skies,
And, where they shot, long trails of lingering light,
Sweep far behind, and gild the shades of night."

Virgil.

গগনে ধূমকেতুর উদয় হইলে কিংবা আকাশ হইতে উল্কাপাত ঘটিলে জগতে যে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটে, এবিশ্বাস প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে এক প্রকার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বেত্তারা এই বিশ্বাস-

চারী পদার্থ পুঞ্জের প্রকৃত তথ্য একাল পর্য্যন্ত যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহা লোক সাধারণকে বুঝাইয়াও তাহাদের চিরন্তন বিশ্বাসের সম্যকপ্রকারে অপনোদন করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আমাদের দেশে জনসাধারণের হৃদয় হইতে এ সংস্কার যে একেবারে দূর হয় নাই, তাহা এক প্রকার স্থির। বিগত বৎসর সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন পূর্ব্ব গগনে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর উদয় আরম্ভ হইয়াছিল, তখন ভয়াকুল ভারতবাসীদের অনেকে কল্পনা বলে পশ্চিম আকাশে আর একটি রণবেশী মূর্ত্তির উদয় দেখিতে পান। পাঠক বর্গের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে, সেই সময়ে একটি জনরবও উঠিয়াছিল, যে পশ্চিম আকাশে যে রণবেশী পুরুষের উদয় হইতেছিল, তিনি আপনার দক্ষিণ হস্তস্থিত করাল করবাল দ্বারা ভারতবাসীদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহার সহচর পূর্ব্বগগনবাসী ধূমকেতু আপনার সুদীর্ঘ সম্মার্জ্জনী সদৃশ ধূমবৎ পুচ্ছ দ্বারা সেই শব সমষ্টি কুড়াইয়া লইয়া যাইবেন। অন্তঃপুর চারিণীরাই বিশেষতঃ, আকাশে এরকম অনৈসর্গিক ব্যাপার দেখিয়া আপন আপন স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতির অমঙ্গলের ভয়ে, অভীষ্টদেবকে প্রশমিত করিবার মানসে নানা প্রকার ব্রতাদির উদ্যোগ করেন। অনেকে আবার বৈদ্যনাথের ও কালীঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেব দেবীর নিকট মানসিক করিতেও বিরত হয়েন নাই। এবৎসর অনাবৃষ্টি, রোগবৃদ্ধি ও ধান্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেকে বিগত বৎসরের আকাশ পর্য্যটক ধূমকেতুর উপর দোষারোপ করিতেছেন। উল্কাপাত কিংবা ধূমকেতুর উদয় যে দুর্নিমিত্ত, তাহা আমাদের পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য নাটকাদিতেও নির্দ্দেশ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শুম্ভবধ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে :—

ততঃ প্রসন্নমখিলং
হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ
নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ।
উৎপাতমেঘাঃ সোল্কাযে
প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।

সেই দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হইলে আকাশ প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল, সমস্ত জগৎ সুস্থ হইল, এবং উল্কাযুক্ত মেঘ সকলও তিরোহিত হইল।

কুরুবংশধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে, ভাবী অমঙ্গল সূচক ধূমকেতুর উদয় ও উল্কাপাতের বিষয় মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বেও বর্ণিত রহিয়াছে। যথা,

ধূমকেতু মহাঘোরঃ
পুষ্যাঞ্চাক্রম্য তিষ্ঠতি।
সেনয়োরশিবং ঘোরং
করিষ্যতি মহাগ্রহঃ॥
****
পতন্ত্যুল্কাঃ সনির্ঘাতাঃ
শক্রাশনি সমপ্রভাঃ।

মহাঘোর ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, উহা উভয় পক্ষের সৈন্যকুল ক্ষয় করিবে। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট উল্কা সকলও সশব্দে নিপতিত হইতেছে। মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে প্রজাপীড়ক তারকাসুরকে জগতের অনিষ্টকারী ধূমকেতুর সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরি বোত্থিতঃ।"

উত্তর চরিতে ভবভূতি রামচন্দ্রকে "পৌলস্ত্য কুল ধূমকেতু" বলিয়াছেন।

উল্কাপাত ও ধূমকেতুর উদয়ে শাস্ত্রকারেরা আবার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকর কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে নিষেধ করেন। যথা,

ধূমকেতৌ সমুৎপন্নে
গ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
গ্রহাণাং সঙ্গরে চৈব
নকুর্য্যান্মঙ্গলক্রিয়াং॥
উল্কাপাতে চ ত্রিদিনং
ধূমে পঞ্চ দিনানিচ।
বজ্রপাতে দিনঞ্চৈকং
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।" গর্গবচনং

ইউরোপ প্রদেশেও যে ধূমকেতু জগতের উৎপাত মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা তদ্দেশবাসী কবিদের গ্রন্থের অনেক স্থলে অতি পরিস্ফুটরূপে পরিলক্ষিত হয়। যথা—

"Incensed with indignation, satan stood
Unterrified, and like a *comet* burn'd,
That fires the length of Ophiucus huge
In the arctic sky, and from h's horrid train
Shakes pestilence and war."

Milton.

"————The blazing star,
Threat'ning the world with famine, plague, and war;
To princes death; to kingdoms many curses;
To all estates inevitable losses;
To herdsmen rot; to ploughmen hapless seasons;
To sailors storms; to cities civil treasons."

Shakespear.

"A pathless comet, and a curse
The menace of the universe."

Byron.

এমন কি পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও ধূমকেতুকে সর্ব্বথা নিরাপদ মনে করিতেন না। জে বার্নুলি (J. Bernoulli) স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সমগ্র ধূমকেতু না হউক, উহার বিপুল পুচ্ছ সম্ভবতঃ বিধাতার ক্রোধ ব্যঞ্জক। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা কেপলার (Kepler) বলিয়া গিয়াছেন, গভীর জলধি মধ্যে মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল যেমন বিচরণ করিতে থাকে; বিপুলকায় বিমানচারী ধূমকেতু পুঞ্জও তদ্রূপ যথেচ্ছ অনন্ত আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন এ সকল অমূলক ত্রাস নিরাকৃত হইতে লাগিল, তেমনি আবার নূতন প্রকারের আতঙ্ক পণ্ডিত মণ্ডলীকে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিল। বিজ্ঞানবিৎ বাফুন (Baffon) যখন জগতে প্রচার করি-

লেন যে, ধূমকেতুর আঘাতে সূর্য্যের কিয়দংশ স্খলিত হওয়ায় আমাদের পৃথিবীর উৎপত্তি হয়, তখন ধূমকেতুর বিপুলত্ব ও অভাবনীয় পরাক্রমের বিষয় লোক সমাজে অনবিদিত রহিল না। তখন মানুষের মনে আর একটি নূতন ভয় জন্মিল। সকলে ভাবিতে লাগিলেন যদি ধূমকেতুর আঘাতে সূর্য্যের অংশ স্খলিত হইতে পাবে, তবে না জানি ধূমকেতুর সংঘাতে আমাদের পৃথিবীর দশা কি হইবে? পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে কেহ সিদ্ধান্ত করিলেন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে ধূমকেতু ও পৃথিবীর পরস্পর সংঘাত একান্ত সম্ভবপর; কিন্তু ইহার পরিণাম যার পর নাই ভয়াবহ। এরূপ ঘটিলে, বিশ্বব্যাপী জলপ্লাবনে, প্রলয় হুতাশন সন্ধুক্ষণে, কিংবা আঘাত বল প্রকোপে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হইতে পারে। পৃথিবীর বিলোপে উহার অধিবাসী জীবাদির যে কি দশা হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এ ঘোর অনিষ্টাপাত না হইলেও পৃথিবী স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত আকাশের সূর্য্য-সম্পর্ক-শূন্য চির-তুহিনাবৃত কোনও এক প্রদেশে গিয়া জীব সম্পর্ক শূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে। এতদূরও না হইয়া উল্লিখিত ধূমকেতু কেবল মাত্র আমাদের চন্দ্রটিকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া আমাদিগকে তাঁহার মনোহর আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে।*

আবার কেহ বা প্রচার করিলেন যে, ধূমকেতু ও পৃথিবী পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট হইলে যে কেবল অনিষ্টাপাতই হইবে এমন নহে, ইহাদ্বারা বিলক্ষণ ইষ্ট ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। সত্য বটে, ধূমকেতুর সংঘর্ষণে পৃথিবীর কিয়দংশ চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এ প্রকার স্থলে ধূমকেতুর ভগ্নাবশেষ পৃথিবীতে রহিয়া যাওয়া সম্ভব; এবং কে বলিবে যে ইহার মধ্যে হীরকাদি মহামূল্য রত্ন লুক্কায়িত থাকিবে না। আবার এতদুভয়ের সন্নিকর্ষণে সংঘর্ষণ না হইলে আমাদের পৃথিবীর কোনও অনিষ্ট আশঙ্কা নাই। বরং উহা একাধিক চন্দ্রদ্বারা সুশোভিত হইতে পাবে, এবং সম্ভবতঃ উহাতে চিরবসন্ত বিরাজ করিতে পারে।†

মানব হৃদয় অনিষ্টাপাত ভয়ে যেমন ভীত হয়, ভাবী মঙ্গলাশায় কখনই তেমন আশ্বস্ত হয় না। এজন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে ধূমকেতু সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ উহাকে বিঘ্ন সঙ্কুল মনে করিতে লাগিল; এবং যখনই আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়, তখনই মনে করে বুঝি এই বারই ধূমকেতুর সংঘর্ষণে আমাদের পৃথিবীর বিনাশ হইবে। যখন সমগ্র ইয়ুরোপ খণ্ডে মানব হৃদয়ের ভাব এইরূপ

*See Lambert's *Lettres Cosmologiques* as quoted in Guillemin's Comets.

† Maupertuis.

অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তখন জ্যোতির্ব্বেত্তারা গণনা করিয়া বলিলেন যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়রোপ খণ্ডে যে ধূমকেতুর উদয় হইবে, তাহার সহিত সম্ভবতঃ পৃথিবীর সংঘর্ষণ ঘটিবে। আপামর সাধারণ সকলেই অতিশয় ভীত হইল এবং ঘোর নৈরাশ্যে পৃথিবীর বিনাশ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সকলের মৃত্যু প্রতীক্ষায় অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিল। সে গণনায় বাস্তবিক ভুল ছিল। পণ্ডিতেরা পুনর্ব্বার যে গণনা করেন তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু পৃথিবীর সন্নিকট আসিবে বটে, কিন্তু উহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; অন্ততঃ এতদুভয়ের মধ্যে দুই কোটি ৫০ লক্ষ ক্রোশ ব্যবধান থাকিবে। কিন্তু মানব হৃদয়ে যখন একবার সন্দেহ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তখন উহার মূলোৎপাটন করা বড় সহজ নয়। ফরাসী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা আরাগো (Arago) সেই সময়ে জনসাধারণের হৃদয়ের সন্দেহ নিরাকরণ মানসে এই বিষয়ের একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন; কিন্তু তিনি যে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। অনন্তর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে সত্য সত্যই ধূমকেতু আকাশে উদিত হইল, কিন্তু পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। তখন জনসমাজ প্রকৃতিস্থ হইল।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ধূমকেতু পৃথিবীকে স্পর্শ করে নাই সত্য; ১৮৬১ সালে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, পৃথিবীর সহিত তাহার যে কেবল সংস্পর্শ হইয়াছিল এমন নহে; পৃথিবী এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমরা উহার বিপুল পুচ্ছের অভ্যন্তর দিয়া গমন করিয়াছিলাম! কিন্তু কই কি হইল? সমগ্র পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইল না, জল প্লাবিত হইল না, ভস্মীভূত হইল না, স্বস্থান ভ্রষ্ট ও হইল না; কিন্তু উহার পুচ্ছাভ্যন্তর দিয়া গমন কালে পৃথিবী উহার কিয়দংশ অবশ্যই ছিঁড়িয়া রাখিল। যদি পণ্ডিত প্রবর মপারটুইস্ (Maupertuis) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে ধূমকেতুর ছিন্ন পুচ্ছ মধ্যে প্রচ্ছন্ন হীরক খণ্ড না পাইয়া অবশ্যই বড় বিষন্ন হইতেন!

ধূমকেতুর উদয় এবং উল্কাপাত যে আমাদের দেশে দুর্নিমিত্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যেও যে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধূমকেতু মহা আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছে, তাহাও এক প্রকার বিবৃত করা গেল। উল্কাপাতকে ইয়রোপীয়েরাও মহান্ অনর্থকর মনে করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ নবেম্বর রজনী যোগে ভিয়ানা নগরে যে দীর্ঘকালস্থায়ী উল্কাপাত হয়, তাহা দেখিয়া তথাকার শ্রমোপজীবীরা এতদূর ভীত হয়, যে সকলে স্ব স্ব

বিষয় কর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে এক সঙ্গে মরিবে বলিয়া সেই রাত্রিতেই গৃহাভিমুখে গমন করে।

এক্ষণে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্যার সাহায্যে পণ্ডিতেরা ঐ সকল ব্যোমাবলম্বী পদার্থপুঞ্জের প্রকৃতি, স্বরূপ ও কার্য্যাদি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উহাদের দ্বারা জগতের কথনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। পাঠক শুনিলে চমৎকৃত হইবেন যে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন ধূমকেতুর সহিত উল্কাপাতের অতি নিকট সম্বন্ধ; এবং এই কারণেই আমরা এই প্রস্তাবে একসঙ্গে উভয়ের অবতারণা করিলাম। আমরা অগ্রে উল্কাপাত ও উল্কাপিণ্ডের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠক বর্গের গোচর করিয়া ধূমকেতুর সবিশেষ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা আকাশপতিতাগ্নিকে উল্কা শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,

বৃহৎ শিখাচ সূক্ষ্মাগ্রা
রক্ত নীল শিখোজ্জ্বলা।
পৌরুষীয় প্রমাণেন
উল্কানানাবিধাস্মৃতা॥

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও উল্কার এই লক্ষণ দিয়া থাকেন। ইহাকে চলিত কথায় নক্ষত্রপাত কহে। এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের ইংরাজি নাম (Shooting stars) স্যুটিংষ্টারস্। আপাততঃ দেখিতে গেলে বাস্তবিকই যেন বোধ হয়, উল্কাপাত আকাশ-স্খলিত নক্ষত্রের পতন। কিন্তু নক্ষত্র সকল এক একটি অতি বৃহৎ তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য। নৈসর্গিক নিয়ম প্রভাবে উহারা স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং উহাদের পতন কথনই সম্ভবে না। তবে উহারা কি প্রকার পদার্থ, কত দূরই বিস্তৃত, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আকাশে ভাসিয়া বেড়াইয়া জগতের কি কার্য্যই বা সাধন করিতেছে? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু মানুষ সর্ব্বদাই ঐ সকল বিষয় জানিতে উৎসুক। পণ্ডিতেরা রসায়ন, খনিজবিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাহায্যে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার বিচার কেবল ভবিষ্যতের নবাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। আপাততঃ এবিষয়ে তাঁহারা যতদূর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই পাঠককে বুঝাইলাম্।

সহৃদয় পাঠক! একবার আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী ছাড়িয়া কল্পনার সহায়তায় বিপুল ব্রহ্মাণ্ড কতদূর বিস্তৃত, তাহা ভাবিয়া দেখুন। ভাবিলে, কূল কিনারা পাইবেন না। সৌর জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া নক্ষত্র জগতে গমন করুন। নাক্ষত্রিক জগৎও একটি নয়,—অসংখ্য। এই অসংখ্য নাক্ষত্রিক জগ-

ন্তের আধার অনন্ত আকাশের সর্ব্বত্রই উল্‌কাপিণ্ড অবস্থিতি করে, আজ কাল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। তাঁহারা আরও বলেন, এ সকলেই আদিম কালীন জড় পদার্থ। পার্থিব পদার্থের স্তায় উহারা জলে ধৌত বা অগ্নিতে শোধিত হয় নাই। ইহাদের সম্মিলনেই আদিতে সূর্য্য নক্ষত্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান কালেও উহাদের সম্পাতে সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পুষ্টি লাভ করিতেছে। অনন্ত জগতে যে ঐ সকল জড়ের সম্মিলনে নূতন গ্রহ নক্ষত্রাদির উৎপত্তি হইতেছে না, তাহাই বা কে বলিবে? নির্দ্দিষ্ট অথচ অতি জটিল পথ দিয়া অনন্ত আকাশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ কালে উহারা যখনই যে নক্ষত্র বা গ্রহের আকর্ষণ পথে পতিত হইতেছে, তখনই তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া এবং তাহাতে পতিত হইয়া সেই নক্ষত্র বা গ্রহের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, এক সঙ্গে অসংখ্য উল্‌কাপিণ্ড একত্রে পরিভ্রমণ করে। সৌর জগতে উহারা সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া একটি চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতে থাকে; এবং পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ কালে যখন সেই উল্কাচক্রের (Meteoric ring) নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই প্রভূত পরিমাণে পৃথিবী বক্ষে উহাদের পতন হয়। সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া যে উল্‌কাচক্র অবস্থিতি করিতেছে, পৃথিবী ১০।১১ আগষ্ট এবং ১২।১৩ নবেম্বর তারিখে তাহার অতি নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া, ঐ ঐ সময়ে রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে উল্কাপাত নয়নগোচর হয়। উহাদের নিজের আলোক বা তাপ কিছুই নাই; কিন্তু উহারা অতি প্রবল বেগে গমন করে বলিয়া বায়ুবর্ত্ম (Atmosphere) মধ্যে প্রবেশ মাত্র, বাতাসের সহিত সংঘর্ষণে, উহারা আলোকিত ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং এজন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রজ্জ্বলিত উল্কাপিণ্ড আবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া নিবিয়া যায়, সুতরাং আমরা আঁর দেখিতে পাই না। অতি বৃহৎকায় অনেক উল্কাপিণ্ড একেবারে ভস্মাবশেষ না হইয়া "নির্ঘাত" সহকারে ফাটিয়া উঠে, এবং তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল ভূতলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; অনেক সময়ে আবার ফাটিয়া না গিয়া বৃহৎ শিলাখণ্ডের আকারে পৃথিবী বক্ষে পতিত হয়। প্রোফেসর নিউকম্বি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ন্যূনকল্পে (১,৪৬,০০০) এক লক্ষ ছ চল্লিশ হাজার উল্কাপিণ্ড ভূবক্ষে অবতরণ করে। যাবতীয় ভূপতিত উল্কাপিণ্ড শিলাময় বা ধাতুময় হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যত উল্কাপিণ্ড ভূতলে দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডে যেটি কয়েক বৎসর হইল পতিত হইয়াছে, সেইটী অতি বৃহৎ। উহা ওজনে প্রায় ১৫টন অর্থাৎ প্রায় ৪২০মণ ভারি। বিলাতের যাদুঘরে যেটি আছে, তাহা ওজনে ৩ টনের অর্থাৎ ৮৪মণের অধিক ভারি নহে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি উল্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর নিকট সম্বন্ধ। পণ্ডিতেরা বিস্তর গবেষণা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে আকৃতি, প্রকৃতি, এবং কার্য্যাদিতে উহারা একই প্রকার পদার্থ। এমন কি সৌর জগতে উল্কাচক্রের পরিভ্রমণ পথ ব্যতীত অন্যত্র ধূমকেতু দৃষ্টি গোচরই হয় না। এই সকল কারণে অনেক ধূমকেতুর সমষ্টিকে উল্কারাশি সমুত্থিত এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন। উহাদিগকে তাঁহারা উল্কার মেঘ (clouds of meteorites) বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা আরও বলেন যে ধূমকেতু নিজে আলোকময় বা তেজস্বান পদার্থ নহে। উল্কারাশির পরস্পর সংঘাতে যে আলোকের ও তেজের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই ধূমকেতু সমূহকে আলোকিত ও তেজস্বিত করিয়া তুলে। ধূমকেতু সকল যে সর্ব্বতোভাবে বায়বীয় পদার্থ, তাহা আজ কাল প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন। সূর্য্যকিরণ প্রভাবে উহারা বস্তুতঃ আলোকিত ও তেজস্বিত হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে উহাদের নিজেরও যে আলোক ও তেজ আছে তাহা অনেকে অনুমান করেন। এ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে উল্কাপিণ্ড সমুৎপন্ন মনে না করিয়া উল্কাপিণ্ডের সহিত উহাদের জাতিত্ব সম্বন্ধ স্থির করেন। তাঁহারা বলেন ধূমকেতু সকলও উল্কাপিণ্ডের ন্যায় আদিমকালীন জড়পদার্থ। সূর্য্য,* নক্ষত্র, গ্রহাদি হইতে উহাদের উৎপত্তি সম্ভব। এমন কি যে সকল ধূমকেতু সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া নক্ষত্র জগতে যাইতে পারে না তাহারা নিঃসংশয়ে গ্রহোৎপন্ন ধূমকেতু। এবং যে সকল ধূমকেতু অনন্ত আকাশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই সূর্য্য বা নক্ষত্রোৎপন্ন। ধূমকেতু সকল যে প্রকারেই উৎপন্ন হউক না, উহাদের অবয়ব অত্যল্প মাত্র পদার্থ দ্বারা সংগঠিত। এজন্য আকারে সূর্য্যাপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে বৃহৎ হইলেও সূর্য্য কিংবা সৌরজগতের গ্রহাদি দ্বারা উহা আকৃষ্ট হইয়া কখন স্থান ভ্রষ্ট, কখন বা আকর্ষক গ্রহবক্ষে নিপতিত হয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণে কাহাকে ধূমকেতু বলে এবং আকাশে কত ধূমকেতু আছে, তাহা পাঠক বর্গের গোচর করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আর্য্য শাস্ত্রে ধূমকেতুর যে লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে, তাহা এই—

'কেতবশ্চ শিখাবন্তি জ্যোতীংষি।
দ্বিত্রিচতুশ্চলো মৃত্যুকরঃ।"

শিখাযুক্ত নক্ষত্র সকলের নাম ধূমকেতু। দুইটি, তিনটি বা চারিটি পুচ্ছযুক্ত ধূমকেতু মৃত্যুকর। অমরকোষে ধূমবৎ আভাযুক্ত তারকাকে ধূমকেতু শব্দে

* আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে দ্বাদশটি মাত্র ধূমকেতু সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যথা 'দ্বাদশাদিত্যসম্ভবাঃ।'

উল্লেখ করা হইয়াছে। ধূমকেতুর শিখাকে উহাদের চুল বা পুচ্ছ বলা হইয়া থাকে। কোন কোন ধূমকেতুর একটি মাত্রও পুচ্ছ লক্ষিত হয় না, কোন কোনটিতে আবার একাধিক পুচ্ছ ও দৃষ্টিগোচর হয়। এ লক্ষণের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী প্রদত্ত লক্ষণের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের মতে "A comet appears most frequently as a star, the nucleus of which is surrounded with a nebulosity more or less brilliant, to which ancient astronomers gave the name of hair. Independently of this nebulosity, the body is frequently accompanied by a train, the length of which varies in each comet, or in the same comet at different times; this luminous train is called its *tail.* This tail is in some divided into many branches, as if the body had in reality several distinct tails."

আকাশে কত ধূমকেতু আছে, তাহা লইয়াও পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে অল্প বাদানুবাদ হয় না। শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ বলেন, আকাশে (১০১) একশত একটি মাত্র ধূমকেতু আছে; কেহ বলেন উহার সংখ্যা(১০০০)এক সহস্র; এবং নারদমুনি বলেন, একটি মাত্র ধূমকেতু হইতেই রূপভেদে বহুবিধ হইয়াছে। *

পণ্ডিতপ্রবর আরাগো বলেন, জলে যত মৎস্য আছে, আকাশে তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যক ধূমকেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, জলের মৎসের ন্যায় আকাশের ধূমকেতু গণনাতীত। সত্যবটে, এপর্য্যন্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ও পণ্ডিত মণ্ডলী ৬০৭। ৬০৮ টির অধিক ধূমকেতু দেখিতে পান নাই। কিন্তু অনন্ত আকাশে উহার সংখ্যা কত কে বলিবে?

পাঠক! এই বার একবার ভাবিয়া দেখুন, যে সকল পদার্থ পুঞ্জকে অজ্ঞান মানব মন জগতের বিঘ্ন সঙ্কুল মনে করিয়া আসিতেছে, তাহারা তদ্বিপরীতে ব্রহ্মাণ্ডের কত ইষ্ট বিধান করিতেছে। আপাততঃ দেখিলে যদিও উহাদের গতি বিধির কোনও নিয়ম আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে না, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ নিয়ম পরম্পরার নিয়মাধীনে থাকিয়াই উহারা চর স্বরূপ তাঁহার মঙ্গল ময় বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্র গতায়াত করিয়া বেড়াইতেছে। উহাদেরদ্বারা এক জগৎ হইতে অন্য জগতে অহরহঃ সংবাদ আসিতেছে; সূর্য্য, নক্ষত্রাদির জীবনী শক্তি বা তেজ সংরক্ষিত হইতেছে; গ্রহনক্ষত্রাদির কলেবর বর্দ্ধিত হইতেছে এবং প্রাচীন ও জীর্ণ জগতের ভগ্নাবশেষ

* শতমেকা ধিক লোকে
সহস্রমপরে বদন্তি কেতুনাং।
বহুরূপ মেকশেব
প্রাহ মুনির্ণারদঃকেতুং॥

সংগৃহীত হইয়া নূতন জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। কে জানে উহারাই আবার জগতের জীবদিগকে লোকান্তর কালে এক লোক হইতে অন্য লোক লইয়া যাইতেছে না! *

* "Comets are the spirits or souls of illustrious men, who for many years have acted the part of guardian angels, and being at last ready to die, celebrate their last triumph by voyaging to the firmament as flaming stars."

Bodin.

দেবী চৌধুরাণী।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। যে দিন প্রফুল্লকে বাগদীর মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেদিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভাল গেল না। দেশের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী-সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকা-ইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতে-ছিল, ডাকাতে তাহা লুটিয়া লইল। সে বার দেবীসিংহের খাজানা দেওয়া হইল না। দেবীসিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবীসিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা, মন্দ ছিল না। হেষ্টিংস সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্ম্মচারী দেবীসিংহের আজ্ঞাবহ, বেচা কেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত তাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকার মূল্যের তালুক খানা আড়াই শত টাকায় দেবীসিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকিখাজানা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবীসিংহের পীড়াপীড়িতে

কয়েদের আশঙ্কায়, হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এ সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল। কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না —বুনিয়াদি চাল খাটো করা যায় না। সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন এক দিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন, "মা! তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।" হরবল্লভ তাহারই এক জন। দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়া কর্ম্ম, দান ধ্যান, লাঠালাঠি, পূর্ব্ব মতই হইতে লাগিল—বরং ডাকাতে চালান লুটিয়া লওয়া অবধি লাঠিয়ালের খরচটা কিছু বাড়িয়াছিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারি খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয় আশায় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে আসল ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এদিকে দেবীসিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না—শেষ হরবল্লভরায়কে গ্রেপ্তার করিবার জ পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরাজের আইন হয় নাই। সব তখন বেআইন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বড় ধূম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছেন। কোন শ্বশুর বাড়ী, তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ী। তখনকার দিন একটা জামাই আসা সহজ ব্যাপার ছিলনা। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুর বাড়ী সচরাচর আসে না। পুকুরে পুকুরে, মাছ মহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল—জেলের দৌরাত্মে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে মাগীদের হাটাহাটিতে পুকুরের জল কাদা হইয়া যাইতে লাগিল; মাছ চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া দিল। দই দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইশের জ্বালায়, গোয়ালার মাথা বেঠিক হইয়া উঠিল, সে কখন এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারীর কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পা ব্যাথা হইয়া গেল; কাহার ও পছন্দ হয় না কোন্ ধূতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়ে মহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহার গহনা আছে

তারা সে সকল সারাইতে, মাজিতে ঘসিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁকা কিনিয়া, সোনা রূপা চাহিয়া চিন্তিয়া একরকম বেশ ভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল—নহিলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাহাদের রসিকতার জন্য পশার আছে—তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাসা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন; যাহাদের পশার নাই, তাহারা ভাবিতে লাগিল, "কি করিয়া পশার করিয়া তুলি।" কথার তামাসা পরে হবে—খাবার তামাসা আগে। তার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল। বহুতর কৃত্রিম আহার্য্য, পানীয়, ফল ফুল প্রস্তুত হইতে লাগিল। মধুর অধর গুলি মধুর হাসিতে ও সাধের মিশিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু যার জন্য এত উদ্যোগ, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ আহ্লাদের জন্য শ্বশুবালয়ে আসেন নাই। বাপের গ্রেফ্‌তারির জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে—রক্ষার উপায় নাই। কেহ টাকা ধার দেয়না। শ্বশুরের টাকা আছে—শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারে। তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছেন।

শ্বশুর বলিলেন, "বাপু হে, আমার যে টাকা, সে তোমারই জন্য আছে—আমার আর কে আছে বল? কিন্তু টাকাগুলি যত দিন আমার হাতে আছে, তত দিন আছে;—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাক্‌বে? মহাজনে খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "হৌক—আমি ধনের প্রত্যাশী নই। আমার বাপকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।"

শ্বশুর রূক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "তবে আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।"

তখন সাগরের পিতা, দুইচক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর ও কড়া কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর, তল্পী তল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন, জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তার পর সাগরের পালা।

বধূ, শ্বশুর বাড়ী আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া সেকালে যতটা দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা নয়।

সাগরের সঙ্গে নিভৃতে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। সাগর ব্রজেশ্বরের পায়ে পড়িল, বলিল—আর একদিন থাক—আমিত কোন অপরাধ করি নাই?”

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। রাগের সময়ে শারীরিক ক্রিয়া সকল বড় জোরে জোরে হয়, আর হাত পায়ের গতিও ঠিক অভিমত রূপ হয় না। একটা করিতে, বিকৃতি জন্য আর একটা হইয়া পড়ে। সেই কারণে, আর কতকটা সাগরের ব্যস্ততার কারণ পা সরাইয়া লইতে প্রমাদ ঘটিল। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণির ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল,

“কি আমার লাথি মারিলে?” বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না,—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোক মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল,—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন,

“যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড় মানুষের মেয়ে. কিন্তু পা আমার —তোমার বড় মানুষ বাপও এ পা এক দিন পূজা করিয়াছিলেন।”

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল। বলিল, “ঝকমারি করিয়াছিলেন। আমি আর প্রায়শ্চিত্ত করিব।”

ব্র। পাল্‌টে লাথি মারিবে না কি?

সা। আমি তত অধম নহি। কিন্তু তোমাকে দিয়া আমার পদসেবা করাইয়া লইব। নহিলে আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে নহি।

ব্র। আমারও সেই কথা। যতদিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, ততদিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না। আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।”

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলেন। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। এমত সময়ে সাগর যে ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘরের দ্বার দেশে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা কহিল না। সাগর আপন মনে কাঁদিতেছিল, সে দিকে নজর করিল না। কিন্তু একজন পরিচারিকা, যে ব্রজেশ্বর গেলে পর, সাগরের কি অবস্থা হইয়াছে ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, এখন ছুতালতা করিয়া দুই একটা কাজ করিতেছিল, সে ঐ স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি কে গা?”

তখন সাগর চাহিয়া দেখিল—সাগরও জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা?”

তখন সে স্ত্রীলোক বলিল, “তোমরা কি কেউ আমায় চেন না?”

সাগর বলিল, “না—কে তুমি?” তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর করিল, “আমি দেবী চৌধুরাণী।”

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁপিতে কাঁপিতে আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। কাঁকালের কাপড় খসিয়া পড়িল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিল—সাগরের মুখেও কথা ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে বুড়ো কে না শুনিয়াছিল? সে নাম অতি ভয়ানক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতাঃ নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে, কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর,—স্রোতে,আবর্ত্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে,গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়ায় পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া, তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর তর কল কল পত পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে,সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিনীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ, একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে, একটা বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর এক খানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানা বর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত- রকম মূরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল দাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিলটি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিলটিকরা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—একজন মানুষ!—অপূর্ব্ব দৃশ্য।

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচা খানি চারি আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল—গোলাব ফুলের তোররা তাহাতে চিত্রিত। গালিচার উপর

বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার— পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরমা সুন্দরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যে দুই একটা দোষ আছে। যে সুন্দরীকে কালিদাস "সৃষ্টি রাদ্যৈব ধাতুঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার রূপ বর্ণনায় প্রথমেই তাঁহাকে "তন্বী" * বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তনুতা যদি সৌন্দর্য্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তবে এ স্ত্রী সুন্দরী নহে। এ কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। তবে যদি বড় পীড়াপীড়ি কর, তবে স্থূলাঙ্গী বলিব। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোলকলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে—ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর ধর, এ খর্ব্বাকৃতা বালিকা নহে—বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমনউন্নত বলিয়াই, স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন বর্ষার চারিপোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পুরিয়া, টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। তাতে একটু একটু দোষও ঘটিয়াছে। হাতের আঙ্গুল গুলা একটু মোটা মোটা বোধ হয়—গালে কিছু মাংস লাগিয়াছে—আবার পীবরাংস। তা, তোমরা যদি স্থূলাঙ্গী বলিতেচাও, তা না হয় স্বীকার করিলাম—কাজিয়া বাধাইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এমন পূর্ণায়ত শরীর না হইলে, তত বড় চোখ মানাইত না—সেই ঘনকৃষ্ট, স্থূলরেখ ভ্রূযুগ মানাইত না। আর তেমন গণ্ডদ্বয় নহিলে সে বিদ্যুদ্দীপ্তি হাসি কোথায় খেলিত।

যেমন জাঁকের শরীর, সুন্দরীর তেমনি বেশভূষার ঘটা। এখন ঢাকাই কাপড়ের মর্য্যাদা নাই—কিন্তু একশত বৎসর আগে কাপড় ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার, মিহি ঢাকাই ধুতি,সাড়ী নহে। তাহার ভিতরে হিরা মুক্তা খচিত কাঁচুলি, ঝকমক করিতেছে। হীরাপান্নামতিসোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝকমক করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির, নদী জলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর তাতে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। সেকালের প্রথামত অলঙ্কারে শরীর বোঝাই ছিল না। ইনি খোঁপা বাঁধিতে জানিতেন কি না বলিতে পারি না—কিন্তু এখনত খোঁপা বাঁধা

* তন্বী শ্যামা শিখর দশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী ইত্যাদি।

নাই। চুল, আলুলায়িত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায়, পৃষ্ঠে, অংশে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে। তাহার সুগন্ধি তৈলের গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। একছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সম্বেষ্টন করিতেছে।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্ন মণ্ডিতা রূপবতী, যাহা করিতেছিলেন—তাহা বলিলে অনেক পাঠক চটিয়া যাইবেন। আমি কি করিব? সত্য কথা লিখিতে হয়। এক সেতার লইয়া আপনার মনে বাজাইতে ছিলেন। চন্দ্রের আলোয়, জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই সেতারের মৃদুমধুর ধ্বনিও মিশিতেছে। যেমন জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে—যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছিল, এ বন্যকুসুমসুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর সকলে সেই সেতারের শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দ্রিম দ্রিম দারা দারা বলিয়া সেতার কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। সেতার কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, গর্জ্জিয়া উঠে,—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, শাহানা বাগীশ্বরী, কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ কুসুমের মালার মত নদী কল্লোল স্রোতে ভাসিয়া গেল। তার পর দুই একটী পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া, সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া সেতারের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথার সাপের মত চুলের গোছা সব নাড়িয়া উঠিল—সেতারে নট রাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন, যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল।

এ ব্যক্তি পুরুষ; বয়স চাল্লিস বৎসর হইবে। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন; ভারি রকমের এক যোড়া চৌগোঁপ্পা আছে। গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল, "দেখিতে পাইতেছনা?"

পুরুষ বলিল, "কিছুনা। আসিতেছে কি?"

গালিচার উপর একটা ছোট দুরবীণ পড়িয়াছিল। দুরবীণ তখন ভারতবর্ষে নূতন আমদানি হইতেছিল। দুরবীণ লইয়া, সুন্দরী ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দুরবীণ চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিল। শেষ,

একস্থানে আর এক খানি বজরা দেখিতে পাইয়া বলিল,

"দেখিয়াছি—টেঁকের মাথায়—আধ ক্রোশ তফাৎ হইবে—ঐ কি?"

উ। এ নদীতে আজ কাল আর কোন বজরা আসিবার কথা নাই।

পুরুষ, পুনর্ব্বার দূরবীণ দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবতী সেতার বাজাইতে বাজাইতে বলিল,

"রঙ্গরাজ?"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "আজ্ঞা?"

"দেখ কি?"

"কয়জন লোক আছে তাই দেখি।"

"কয়জন?"

"ঠিক ঠাওর পাই না। বেশী নয়। খুলিব?"

"খোল—ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও। পিছন হইতে।"

তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, "ছিপ খোল"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বজরার কাছে তেঁতুল গাছের ছায়ায় আর একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিপ্—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশী চৌড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশজন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশজন একেবারে উঠিয়া বসিল। বাঁশের চেলা তুলিয়া সকলেই এক এক গাছা সড়কিও এক এক খানা ছোট ঢাল বাহির করিল। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না—সবাই আপনার নিকট চেলার উপরে সাজাইয়া রাখিল। রাখিয়া সকলেই এক এক খানা "বোটে" হাতে করিয়া বসিল।

নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগাইল। রঙ্গরাজ তখন নিজে পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময়ে, যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল,

"রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন।"

"মনে আছে।" বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এদিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীণে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খরস্রোতে তীব্র বেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশী উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইলে, ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশ খানা বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, সেই বজরার ছাদের উপর আট জন হিন্দুস্থানী রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে, কেহ রাত্রিকালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত

না। আটজনের মধ্যে, ছুইজন হাতিয়ারবন্ধ হইয়া মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া, ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয়জন মধুর দক্ষিণ বাতাসে, চাঁদের আলোতে কাল দাড়ি ছড়াইয়া, সুনিদ্রায় অভিভূত ছিল। যাহারা পাহারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমত হাঁকিল

"ছিপ তফাৎ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "তোর দরকার হয় তুই তফাৎ যা।"

প্রহরী দেখিল বেগোছ। ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। রঙ্গরাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, "কি পাঁড়ে ঠাকুর! একটা ছররাও নাই। ধার দিব?"

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তার পর বন্দুক নামাইয়া বলিল, "তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।" এই কথা বলিতে বলিতে রঙ্গরাজ বন্দুক রাখিয়া তীর ধনু লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ী উড়িয়া গেল। প্রহরী "রাম রাম!" শব্দ করিতেলাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশবারজন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার সমেত বজরার উপর উঠিয়া পড়িল। যে ছয় জন হিন্দুস্থানী নিদ্রিত ছিল, সে বন্দুকের আওয়াজে জাগ্রত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারিরা তাহাদিগকে নিমেষ মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। যে ছুইজন আগে হইতে জাগ্রত ছিল, তাহারা কিছু লড়াই করিল কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণ কারিরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুর বাড়ী হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ। এ কেবল তাঁহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! দ্বার খুলুন।"

ভিতর হইতে সদ্য নিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল,

"কে? এত গোল কিসের?" রঙ্গরাজ বলিল, "গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাত পড়িয়াছে।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পরে ডাকিতে লাগিল "পাঁড়ে! তেওয়ারি! রামসিংহ!"

রামসিংহ ছাদের উপর হইতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! শালা লোগ সব কোইকো বাঁধকে রাখা।"

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীর পুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, ডাকাইতের এ বড় ভ্রম! ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।"

শুনিয়া রঙ্গরাজও ঈষৎ হাসিল। বলিল, "আমারও সেই মত। এখন দ্বার খুলিবেন বোধ হয়।"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

রঙ্গরাজ। আমি একজন ডাকাত মাত্র। দ্বার খোলেন এই ভিক্ষা।

"কেন দ্বার খুলিব?"

রঙ্গরাজ। আপনার সর্ব্বস্ব লুটপাট করিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ী ওয়ালা পাইলে? আমার হাতে দোনলা বন্দুক আছে—তৈয়ার। যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রাণ লইব।"

রঙ্গরাজ। একজন প্রবেশ করিবনা—কয়জনকে মারিবেন? আপনিও ব্রাহ্মণ—আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে। মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কি?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে পাপটা না হয় আমিই স্বীকার করিব।"

এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়্ মড়্ শব্দ হইল। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া একজন ডাকাত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই সময়েই রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুইবার পদাঘাত করিল। কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমত সময়ে রঙ্গরাজ তাঁহার হাতহইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুইজনেই তুল্য বলশালী, তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। ব্রজেশ্বর ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতেই রঙ্গরাজ বন্দুক কাড়িয়া লইল। ব্রজেশ্বর তখন, দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমুদয় বলের সহিত রঙ্গরাজের মাথায় এক ঘুষি তুলিল। রঙ্গরাজ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। বজরার একদিকে অনেক অস্ত্র ঝুলান ছিল। এই সময়ে ব্রজেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্য হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর ব্রহ্মহত্যায় আমার ভয় নাই"।—এই বলিয়া রঙ্গরাজকে কাটিতে তরবারি উঠাইল। সেই সময়ে আর চারি পাঁচ জন দস্যু মুক্তদ্বারে কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহার উপর পড়িল। উত্থিত তরবারি হাত হইতে কাড়িয়া লইল। দুইজনে দুই হাত চাপিয়া ধরিল—একজন দড়ি লইয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "বাঁধিতে হইবে কি?" তখন ব্রজেশ্বর বলিল,

"বাঁধিওনা। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। কি চাও বল—দিতেছি?" রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার যাহা কিছু সঙ্গে আছে সব লইয়া যাইব। কিছু ছাড়িয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু যে কিল তুলিয়াছিলে—আমার মাথায় লাগিলে মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত—এক পয়সা ও ছাড়িব না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।"

ব্রজেশ্বর একথা বলিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা জিনিস পত্র বজরা হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন প্রায় ২৫জন লোক বজরায় উঠিয়াছিল। জিনিস পত্র বজরায় বিশেষ কিছু ছিলনা, কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ-মাত্র। মুহূর্ত্তমধ্যে সকল ছিপে তাহারা তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী রঙ্গরাজকে বলিল, "সবজিনিস লইয়াছ—আর কেন দিক্‌কর—এখন স্বস্থানে যাও।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "যাইতেছি কিন্তু আপনাকে ও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ব্র। সে কি? আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গরাজ। আমাদের রাণীর কাছে।

ব্র। তোমাদের আবার রাণী কে?

রঙ্গ। আমাদের রাজরাণী?

ব্র। তিনি আবার কে? ডাকাতের রাজরাণী কখন শুনি নাই।

রঙ্গ। দেবী রাণীর নাম কখন শুনেন নাই?

ব্র। ওহো! তোমরা দেবীচৌধুরাণীর দল?

রঙ্গ। দলাদলি আবার কি? আমরা রাণীজির কারপরদাজ।

ব্র। যেমন রাণী, তেমন কারপরদাজ! তা, আমাকে রাণী দর্শনে যাইতে হইবে কেন? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় ত কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।

ব্র। আমার ও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজরাণী একটা দেখবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি নাকি যুবতী?

রঙ্গরাজ। তিনি আমাদের মা—সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্র। চল তবে ভগবতী দর্শনে যাই।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর, রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে বজরার মাঝিমাল্লা সকলে, ভয়ে জলে পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন,

"এখন তোমরা বাজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও—তোমাদের জান ও মান ও দৌলত ও ইয়াৎ সব বজায় আছে। তোমরা বড় হুসিয়ার!"

মাঝিরা তখন একে একে বজরায়

উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আমার দ্বারবানদের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি ?"

রঙ্গরাজ বলিলেন, "আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া, আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখনই আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।"

ব্রজেশ্বর দ্বারবানদিগকে সেই রূপ বুঝাইয়া দিলেন। আর ভরসা দিলেন, যে তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহাদের ডাল রুটির বরাদ্দ বাড়িবে। তখন ব্রজেশ্বর ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, যে, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাক। কোথাও যাইও না বা কিছু করিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন। ছিপের নাবিকেরা "দেবী রাণি কি জয়" হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

আর্য্যকালে রত্ন-পরীক্ষা।

এক খণ্ড ক্ষুদ্র হীরকের প্রভূত মূল্য কেন? ভাবিয়া দেখিলে তৎসম্বন্ধে সমৃদ্ধিশালিতার স্বভাব বা সভ্যতাভিমানের মহিমা ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। মানবমণ্ডলীর আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে, আদিম মনুষ্যেরা প্রথমে যত্র তত্র বসি, অকৃষ্টপচ্য শস্য, স্বচ্ছন্দজাত ফল মূল, আরণ্য পশুর মাংস, বৃক্ষের ত্বক্‌ ও পশুর চর্ম্ম পরিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিত,—পশ্চাৎ কালসহকারে তদ্বংশধরেরা ক্রমে সুসভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়া মণিমুক্তাদির প্রতি সমাদর স্থাপনপূর্ব্বক আত্মার সুখাভিমান চরিতার্থ করিত। একজন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, একদা এক ভীলকন্যা একটী রক্তম্রক্ষিত গজমুক্তা পাইয়া প্রথমে বদরীজ্ঞানে আহ্লাদিত হইয়াছিল—পরে যখন দেখিল, প্রাপ্ত বস্তু বদরী নহে তখন সে বিষণ্ণ হইয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। * অনভিজ্ঞ ও অসভ্য ভীলকন্যার নিকট যেমন গজমুক্তার অনাদর দৃষ্ট হয়—তেমনি আদিম মনুষ্যের নিকটেও মণি রত্নের অনাদর ছিল, ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। সমৃদ্ধিশালিতা ও আহার্য্য শোভাপ্রিয়তা যে সভ্যতার অনুগামী, তৎপক্ষে কোনও সংশয় নাই। মনুষ্য যতই সভ্যতাভিমানে পূর্ণ হয়, যতই সমৃদ্ধ হয়, ততই তাহাদের রুচি আহার্য্য শোভায় আসক্ত হয়; সুতরাং তখন তাহারা মণি মাণিক্যের উপর রত্নতা স্থাপনপূর্ব্বক আত্মাভিমান বা সমৃদ্ধাভিমান চরিতার্থ করিতে থাকে। অতএব, মণি মাণিক্যের সমাদর সমৃদ্ধশালিতার একটি প্রধান জ্ঞাপক। মণি রত্নের সমাদর যদি সমৃদ্ধশালিতাও সভ্যতার জ্ঞাপক হইল, তবে আমরা তদ্দ্বারা বিনা ক্লেশে একটী অভিনব অব্যভিচারী অনুমানের উল্লেখ করিতে পারি। তাহা কি? না পুরাকালের সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালিতা। যে দেশের লোকেরা সর্ব্বাগ্রে মণি রত্নের আদর করিতে শিখিয়াছিল, সেই দেশই সর্ব্বাগ্রে সভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল, ইহা অখণ্ডনীয় অনুমান।

ভারতবর্ষই আদিম সভ্যস্থান, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন; পরন্তু আমাদের বিবেচনায়, অন্য কোন প্রমাণের প্রয়াস না পাইয়া একমাত্র রত্ন শাস্ত্র দেখাইয়া দিলেই তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। কেননা

---

*"সিংহ ক্ষুন্ন করীন্দ্রকুম্ভ পতিতং রক্তাক্ত মুক্তা ফলং।
কান্তারে বদরী ভ্রমাৎ দ্রুত মগাৎ ভিল্লীরপত্নীমুদা।
পানিভ্যামবগৃহ্যশুক্ল কঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহৌ।
* * * ।"

রত্নের আদর, রত্নের প্রশংসা, রত্নের গুণ দোষ নির্ব্বাচন ও রত্নের পরীক্ষা, এই ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশের লোকেরা শিক্ষা করিয়াছে ; ইহা সম্পূর্ণ-রূপে সপ্রমাণিত করা যাইতে পারে। কোন্ দেশের কোন্ ভাষায় পঞ্চসহস্রাধিক বর্ষের রত্ন শাস্ত্র আছে ? যদি থাকে ত সে দেশ এই ভারতবর্ষ এবং সে ভাষা এই ভারতবর্ষের সংস্কৃত।

ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আছে কি না, সন্দেহ। তাদৃশ ঋগ্বেদকেও আমরা রূপক বিধায় ও দৃষ্টান্তক্রমে রত্নের সমাদর করিতে দেখিতেছি। * সুতরাং ঋগ্বেদের সময়ও যে ভারতে সভ্যতাও সমৃদ্ধিশালিতার সঞ্চার হইয়াছিল, তৎ-পক্ষে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

যোগ শাস্ত্রের মধ্যে একটা সূত্র দৃষ্ট হয়। যথা—

"অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে সর্ব্বোরত্নোপস্থা-নম্।" এই সূত্রটী বহু পুরাতন। ইহার দ্বারাও সপ্রমাণ করা যায় যে, এদেশে যোগ চর্চ্চার সময়েও রত্নশাস্ত্রের প্রচার ছিল।

মহাভারত এদেশের অতি পুরাতন বস্তু। সেই মহাভারতে ব্যাসদেব বৃহস্পতি ও অসুর-গুরু শুক্রকে প্রধান ও পুরাতন নীতি শাস্ত্রকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছেন। † সেই ব্যাস-মান্য পুরাতন শুক্র নীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহাতে একাংশে রত্নশাস্ত্রের বিষয়গুলি অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যে, রত্ন শাস্ত্রটী এদেশের কত পুরাতন।

"অগস্তি মতম্" নামক অন্য এক খানি রত্নশাস্ত্র আছে, তাহা অগস্ত্য মুনি কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ এই গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া-ছেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থখানিও বহু পুরাতন।

অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি আর্যগ্রন্থেও রত্নের গুণ দোষ নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা প্রণালী অভি-হিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ আধু-নিক নহে। অতি প্রাচীন হেমাদ্রি প্রভৃতি প্রাচীন নিবন্ধকারেরা ও উক্ত গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

বৃহৎ সংহিতা নামক এক জ্যোতি-গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে রত্ন পরীক্ষা উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানি ১৪০০ শত বৎসর পুরাতন।

ভোজকৃত যুক্তি কল্পতরু গ্রন্থ প্রাচীন ও প্রামাণিক। এতদ্গ্রন্থে অশেষ বিশেষ

* "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।" [ঋগ্বেদ
"অন্নপানেন মণিনা প্রাণ স্যুত্রেণ পৃশ্নিনা।" ঋক্]
"মণিনা রত্ন ভূতেন আত্মনা ইতি তদ্ভাষ্যম্।"

† "এবং শুক্রোঽব্রবীদ্ধীমানাপৎসু ভরতর্ষভ !"
"উশনাশ্চৈব গাথেমে প্রহ্লাদায়া ব্রবীৎ পুরা।"
"অপিচোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।"
"গাথাশ্চোনসা গীতা ইমাঃ শৃণু ময়েরিতা।"
"ইত্যেতা হ্যুশনোগীতা গাথা ধার্য্যা বিপশ্চিতা।"
"কাব্যাং নীতিং মা শৃণোষ্যল্প বুদ্ধিঃ।"
মহাভারত।

প্রকারে রত্নতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতেও সর্ব্বপ্রকার রত্নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল পর্য্যালোচনায় দ্বারা স্থির হয় যে, মণি-শাস্ত্র এদেশের বহুপ্রাচীন এবং অন্যূন পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালিতা ছিল। সমধিক উন্নতির সময় ব্যতীত যখন শাস্ত্র প্রচার সম্ভব হয় না, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মণিশাস্ত্র প্রচারের অনেক পূর্ব্বে এদেশ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ছিল।

রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী ঋষিরা যখন প্রস্তর-পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশ সমধিক উন্নত। তৎকালে তাঁহারা দক্ষিণে সিংহল, পশ্চিমে তুরুষ্ক, উত্তরে হিমালয়-পার্শ্ব প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের বহুদর্শনের পর স্থির হইয়াছিল যে, সর্ব্বসমেত চতুরশীতি প্রকার প্রস্তর জাতি আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাণ্যঙ্গজ, কতকগুলি উদ্ভিজ্জ-জাত এবং অবশিষ্টগুলি ভূমিজ। স্থান বিশেষের মৃত্তিকায়, বেণু (বাঁশ) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ পদার্থে এবং শঙ্খ শুক্তি প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গে প্রস্তর জন্মিয়া থাকে। এই সকল প্রস্তরের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ন। অবশিষ্ট নগণ্য বা সামান্য পাথর। *

কোন শাস্ত্রকার স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুকেও রত্ন বলিয়া গণ্য করেন। সেই জন্যই আমরা পঞ্চ রত্ন ও নবরত্ন প্রভৃতির মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্যের প্রবেশ দেখিতে পাই। †

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও অগ্নিপুরাণের মতে ধারণের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রস্তর—যাহা রত্ন আখ্যা লাভের যোগ্য, তাহার—সংখ্যা ৩৬ এবং সে সকলের নাম এই বজ্র (১), মরকত (২), পদ্মরাগ (৩), মুক্তা (৪), ইন্দ্রনীল (৫), মহানীল (৬), বৈদূর্য্য (৭), গন্ধসংজ্ঞক (৮), চন্দ্রকান্ত (৯), সূর্য্যকান্ত (১০), পুলক (১১), কর্কেতন (১২), পুষ্পরাগ (১৩), জ্যোতীরস (১৪), স্ফটিক (১৫), রাজাবর্ত্ত বা রাজপট্ট (১৬), রাজময় (১৭), সৌগন্ধিক (১৮)' গঞ্জ (১৯), শঙ্খ (২০), ব্রহ্মময় (২১), গোমেদক (২২), রুধিরাখ্য(২৩), ভল্লাতক(২৪), ধূলীমরকত (২৫), তুল্যক (২৬), সীস (২৭), পীলু (২৮), প্রবাল (২৯), গিরিবজ্র (৩০), ভুজঙ্গমণি (৩১), বজ্রমণি (৩২), তিত্তিভ (৩৩), পিত্ত বা পিন্ত (৩৪), ভ্রামব (৩৫), উৎপল (৩৬)। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-গ্রন্থকার এই ৩৬ প্রকার প্রস্তরের উল্লেখ করিয়া ইহার প্রত্যেককেই "বজ্র" সংজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু অগ্নিপুবাণ ইহাদিগকে মাত্র রত্ন

---

* "ভেকাদিষ্টাপি জায়ন্তে মণয়ঃ স্ফুটবর্চ্চসঃ।"
"রত্নং মণির্দ্বয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি।"

† "কনকং কুলিশং নীলং পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।"
এতানি পঞ্চরত্নানি রত্নশাস্ত্রবিদো জগুঃ॥"
"সুবর্ণং রজতং মুক্তা রাজাবর্ত্তং প্রবালকম্।
পঞ্চরত্নকমাখ্যাতং শেষং বস্তু প্রচক্ষতে॥"
"মুক্তাফলং হিরণ্যঞ্চ বৈদূর্য্যং পদ্মরাগকম্।
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা।
প্রবালযুক্তান্যুক্তানি মহারত্নানি বৈনব॥"

সংজ্ঞাই দিয়াছেন অন্য কোন আখ্যা দেন নাই। *

এই সকল প্রস্তর জাতির ভাষা নাম কি? তাহা আমরা সমস্ত জ্ঞাত নহি। আধুনিক মণিকারেরা অর্থাৎ জহুরীরাও সমস্ত প্রস্তরের ভাষা নাম জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা যাহা জানেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। †

উপরে ৩৬ প্রকার প্রস্তরের নাম লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে বৃহৎ সংহিতাকার বজ্র, ইন্দ্রনীল, মরকত, কর্কেতন, পদ্মরাগ, রুধিরাখ্য, বৈদূর্য্য, পুলক, বিমলক, রাজমণি (রাজাবর্ত্ত ও প্রভৃতি) স্ফটিক, চন্দ্রকান্ত, সৌগন্ধিক, শঙ্খ, মহানীল, পুষ্পরাগ, ব্রহ্মমণি বা বজ্রমণি, জ্যোতীরস, সস্যক বা গন্ধসস্যক, মুক্তা ও প্রবাল— এই কএকটী রত্নের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। ‡

ভিন্ন ভিন্ন রত্ন-শাস্ত্রবক্তা এই সকলের মধ্য হইতে কেহ পাঁচটী, কেহ নয়টী, কেহ দশটী, কেহবা ১১টী একত্রিত করিয়া পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, দশরত্ন ও একাদশরত্ন নাম দিয়াছেন এবং কেহ কোনটী মহারত্ন, কেহ বা সেটীকে উপরত্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। শুক্রনীতিকার বজ্র, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, পাচি অর্থাৎ মরকত ও মাণিক্য—এই কএকটীকে মহারত্ন বলিয়াছেন। ¶

মহর্ষি অগস্ত্য পুষ্পরাগ, বৈদূর্য্য, গোমেদ, স্ফটিক ও প্রবালকে উপরত্ন বলিয়াছেন। §

এরূপ মতভেদের কারণ কি? এবং কিরূপ গুণাগুণ লইয়াই বা তাঁহারা

---

* "বজ্রংমরকতঞ্চৈব পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্। ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্য্যং গন্ধসংজ্ঞকম্। চন্দ্রকান্তং সূর্য্যকান্তং স্ফটিকং পুলকং তথা। কর্কেতং পুষ্পরাগঞ্চ তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ। স্ফাটিকং রাজবর্ত্তঞ্চ তথা রাজময়ং শুভম্। সৌগন্ধিকং তথাগঞ্জং শঙ্খং ব্রহ্মাময়ং তথা। গোমেদং রুধিরাখ্যঞ্চ তথা ভল্লাতকং দ্বিজ! ধূলীমরকতঞ্চৈব তুল্যকং সীসমেবচ। পীলুং প্রবালকঞ্চৈব গিরিবজ্রঞ্চ ভার্গব। ভুজঙ্গম মণিশ্চৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ। তিত্তিভঞ্চ তথা পিণ্ডংভ্রামরঞ্চ তথোৎপলং। বজ্রানোক্তানি সর্ব্বানি ধার্য্যান্যেব মহীভৃতা।" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর। অগ্নিপুরাণোক্ত রত্নগণনার সহিত এই বচন গুলির ঐক্য আছে।

† হীরাকনান্, হীরাওলন্দাজী, হীরা পরব, (১) চুনী কড়া, চুনী নবম, চুনী—শামখেৎ, চুনী মাণিক (২) পান্নাপুরাতন থান্, পান্না নয়াথান (৩) পোকরাজ (৪) তরমুনী ৫। নীলা ৬। নেশনীয়া ৭। শোনেলা ৭। গোমেদক ৯। ওপেল ১০। সংশেড়াপ ১১। সংগেশম ১২। হেকীক ১৩। নীরেষ্টোন ১৪। জরবজৎ ১৫। সোলেমানী ১৬। গোরি ১৭। পীটোনীয়া ১৮। দানে চিনি ১৯। ধনেনা ২০। পীরজা ২১। গোদন্তা ২২। এমনী ২৩। কয়কেতক্ নাজবরৎ ২৪। মুগা ২৬॥

‡ "বজ্রেন্দ্রনীল মরকত কর্কেতন পদ্মরাগ রুধিরাখ্যাঃ। বৈদূর্য্য পুলক বিমলক রাজমণি স্ফটিক শশিকান্তাঃ সৌগন্ধিক গোমেদক শঙ্খ মহানীল পুষ্পরাগাখ্যা। ব্রহ্মামণি জ্যোতীরস গন্ধসস্যক মুক্তা প্রবালানি॥

¶ বজ্রং মুক্তা প্রবালঞ্চ গোমেদশ্চেন্দ্রনীলকঃ। বৈদূর্য্যঃ পুষ্পরাগশ্চ পাচির্মাণিক্যমেবচ। মহারত্নানি চৈতানি নবপ্রোক্তানি সূরিভিঃ।"

§ পুষ্পারাগঞ্চ বৈদূর্য্যং গোমেদঃ স্ফটিকপ্রভম্। পঞ্চোপরত্নমেতেষাং প্রবালং—।"

রত্নের মহত্ব, মধ্যমত্ব ও স্বল্পত্ব নির্ণয় করিতেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তৎ-সম্বন্ধে আমাদের অনুভব এই যে, যিনি যাহাকে সুন্দর বা ভাল বলিয়া জানিতেন, তিনি তাহাকে মহত্ব পদ প্রদান করিতেন।

পৌরাণিক মতে এদেশে দুইখানি মহারত্ন ছিল। তাহার একখানির নাম "কৌস্তুভ," অপর খানির নাম "স্যমন্তক"। এই দুই মহারত্নের বিষয় পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান "কহিনুর" নামক হীরকই পূর্ব্বকালের "স্যমন্তক"। এ অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, ঐ দুই মহামণি সমুদ্রে পাওয়া গিয়াছিল। প্রথমখানি অতি আদিম কালের সমুদ্র-মন্থন হইতে উত্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উরোভূষণ হইয়াছিল; দ্বিতীয়খানি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা সত্রাজিৎ সমুদ্র-তটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালের মণিকারেরা হীরার পরিকর্ম্ম বা কর্ত্তনক্রিয়া (কট) জ্ঞাত ছিলেন না। পরন্তু মণিশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের উল্লিখিত ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। প্রত্যেক মণিশাস্ত্রেই রত্নের পরিকর্ম্ম করিবার কথা আছে। মহর্ষি অগস্ত্য রত্নের "ছেদন" ও "উল্লেখন" করণের কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। * সে সকল দেখিলে কোন্ অজ্ঞান না রত্নশিল্পের প্রাচীনতা স্বীকার করিবে?

মুক্তার বেধ ও রত্নের পরিকর্ম্ম বা পাকা পাথর কাটা সামান্য শিল্পের বিষয় নহে। ইচ্ছা করিলেই উহা সম্পন্ন করা যায় না। কোন্ মহাপুরুষ যে সর্ব্বাগ্রে মুক্তার বেধ ও পাকা পাথর কাটিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। ফল, উক্ত কৌশল যে অন্যূন দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা জ্ঞাত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে "টঙ্ক" নামক পাষাণ বিদারণ যন্ত্রের বর্ণনা আছে। সেই টঙ্ক-যন্ত্রও অদ্যাপি প্রকারান্তরে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভারত খণ্ডীয় আর্য্য মহাপুরুষেরা যে এক সময়ে সুসমৃদ্ধ, সুসভ্য, ও শিল্প নিপুণ ছিলেন, তাহা এই রত্নশাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যে শাস্ত্রের দ্বারা ভারতভূমির পূর্ব্ব মহিমা বা প্রাচীন গৌরব প্রকাশ পায়—সে শাস্ত্রের আলোচনা না করা ভারতবাসীদিগের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীরামদাস সেন।

* "রত্নানাং পরিকর্ম্মার্থং মূল্যং তস্য ভবেন্নৃষু।" ইত্যাদি
ছেদনোল্লেখনৈশ্চৈব স্থাপনে শোভকৃৎ যথা।" অগস্তিমতম্।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মহাপূজা। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। শ্রীহট্ট ইউনাইটেড্ কোম্পানির যন্ত্রে শ্রীমথুরানাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় আনা।

এই গ্রন্থ শ্রীহট্ট মেলা উপলক্ষে লিখিত। মেলা জিনিসটী মন্দ নয়। ভাল জিনিসের উপলক্ষে যাহা রচিত হয়, তাহার নিন্দা করা অনুচিত। কিন্তু কাব্য যেমন উঁচু তানে লেখা, তেমন উঁচু তানে মেলা করিতে গেলে বোধ হয় মেলার বড় একটা উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সুধু "জন্মভূমি" "জন্মভূমি" করিয়া চেঁচাইলে আসল কাজ হয় না। বোধ হয় এই জন্যই নব্য প্রণালীমতে যে সকল মেলা হইতেছে, সেগুলি সাধারণের তত উপকারী হইতেছে না। এ দেশে পূর্ব্বকাল হইতে মেলার প্রণালী চলিত আছে। কিন্তু সে সকল মেলা যথার্থ জাতীয় মেলা— কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বৃদ্ধ, কি বালক সকলেই তাহাতে মাতিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা উপকৃতও হয়। এখনকার মেলা পঞ্চমে চড়ান— "জন্মভূমির" তানে তাহার সুর বাঁধা। শিক্ষিত বাঙ্গালী সে সুর উদ্ভাবন করিয়াছেন, অতএব তিনিই সে মেলার মাহাত্ম্য বুঝেন। কিন্তু যে কোটী কোটী শ্রমজীবি এবং বালক বৃদ্ধ লইয়া জাতি, তাহারা সে সুর-রহস্য বুঝে না। অতএব তাহারা সে মেলার দিকেও যায় না। তাই বলি যে পঞ্চমে চড়াইয়া মেলা করাও ভাল নয় এবং মেলা উপলক্ষে পঞ্চম-স্বরে গান গাওয়াও ভাল নয়। চুপ চাপ করিয়া কাজ করিলেই যথার্থ কাজ হয়।

কবিতা-কুসুমমালা।

প্রথমভাগ।

শ্রীমুন্সী আবদুল আলা কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, বরাট প্রেসে শ্রীবামাচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

দেশীয় মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত দেখিলে আমরা আনন্দিত হই। তাঁহাদিগকে কবিতা লিখিতে দেখিলে এ ভরসা হয় যে, তাঁহারা ভাল জিনিস লিখিতে পারুন বা না পারুন, অন্ততঃ পারস্য কাব্য-কাননের সুবাসিত কুসুম চয়ন করিয়া বঙ্গভাষা সুশোভিত করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থকারের সে চেষ্টা আছে, কিন্তু চেষ্টা

মাত্র—তেমন সাধনা নাই। পারস্য কবিতার ছায়া মাত্র লইয়া তিনি কয়টী কবিতা লিখিয়াছেন। লেখকের নিজের কবিত্বশক্তি বড় কম। যে ভাবোচ্ছ্বাস কবিতার প্রাণ, কবিতা কুসুমমালায় তাহার বড় অভাব। মুনসী আবদুল আলার যত প্রয়াস "ঘটকালি করি, শবদে শবদে বিয়া দিতে"। সুতরাং কবিতাগুলি লাভে মূলে মারা পড়িয়াছে। তাঁহার ভাষা দেখিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এই লেখক সুধু অনুবাদ করিলে, অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন।

ইহার পর, "কবিতা কুসুমমালার" বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। কেবল "বঙ্গবিধবা-বিলাপ" শীর্ষক কবিতার সম্বাদ না লইলে ধর্ম্মতঃ আমরা পতিত হইব। বঙ্গবিধবা—অবশ্য হিন্দুর মেয়ে—"দশম বৎসর কালে" বিধবা হইয়াছেন। তারপর যখন তিনি পনর বছরের, তখন একদিন "বসন্ত প্রদোষে," "জনপদের প্রান্ত ভাগে" বসিয়া গান করিতেছেন—

> এর মধ্যে একদিন
> না ছুঁলেম মাংস, মীন,
> তাম্বুল দিনেক তরে
> পোড়ামুখে না উঠিলে।

কেহ আমাদের নবীন "মুন্সী" কবিকে তালকানা না ভাবেন! স্থান, কাল, পাত্র এবং উক্তির এমন সঙ্গতি প্রায় দেখা যায় না!

আজ, এই এঙ্গলো-ভর্ণাকুলার বাঙ্গালা মুলুকে নবীন হিন্দুগ্রন্থকার বই লিখিতে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে হিন্দুর মেয়েকে মেম সাজাইয়া বিদ্যার পরিচয় দেন। তার উপর আবার লেখকেরা চির ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী হিন্দু বিধবাকে "বিবিজান" বানাইতে উদ্যত! হায় হিন্দুকুল-কামিনীগণ! এখন তোমাদের মরণই ভাল!

ব্রাহ্মণ। আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিকা মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ২—১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্ মণিরাম যন্ত্রে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই পত্রিকার তিনখণ্ড আমরা পাইয়াছি। যে কারণেই হউক, হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক্ষণে গুরুতর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সুশিক্ষিত যুবক এখন আর হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সমূহকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। দিন দিন প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দু পিতৃগণ অনন্ত জ্ঞানী ছিলেন—মনুষ্য প্রকৃতি নখদর্পণে আয়ত্ত করিয়া তাঁহারা শাস্ত্র সকল প্রণীত করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে "আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ" সাময়িকপত্রের বাস্তবিক বিশেষ প্রয়োজন। "ব্রাহ্মণ" সবেমাত্র আসরে নামিয়াছেন। তাঁহার ব্রত যেমন মহৎ, তেমনি গুরুতর। তাঁহার কৃতকার্য্যতা বুঝিতে দিন লাগিবে।

তবে ইহা স্থির যে, ধীরভাবে সত্যানুসন্ধান লক্ষ্য করিয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। ভরসা করি- "ব্রাহ্মণ" কখন অন্ধ উক্তি-পত্রে পরিণত হইবেন না।

রাজতরঙ্গিণী। শ্রীলোকনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ২—১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, মণিরাম যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

রাজতরঙ্গিণী এবং তাহার সচিত্র বঙ্গানুবাদ প্রথমখণ্ড ১ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এই প্রাচীন ইতিহাস হীনদেশে কাশ্মীর-ইতিবৃত্ত রাজতরঙ্গিণী আমাদের মুখ রাখিয়াছে। সুতরাং মাতৃভাষায় ইহার রূপান্তর দেখিয়া, প্রকাশককে ধন্যবাদ দিয়া সহর্ষে আমরা ভিতরে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ভাষার দৌরাত্ম্যে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিতে গিয়া এই দোষ ঘটিয়াছে। অনুবাদক মহাশয়কে আমাদের পরামর্শ—কথার তরজমা ছাড়িয়া, সহজ ভাষায় তিনি যেন ভাবানুবাদের চেষ্টা পান। নহিলে "রাজতরঙ্গিণী" কোন কাজেরই হইবে না।

রাজতরঙ্গিণীর ভাষার একটু নমুনা দিতেছি—"কিন্তু অনেক স্থলেই কবিতার দুরূহতা বোধে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল, তাঁহার যে স্থানে প্রবেশিকা শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহাও আবশ্যক বোধে পাঠক সমক্ষে উদ্ধৃত করিব।"

এখানে বলা আবশ্যক, যে উদ্ধৃত অংশটুকু প্রকাশকের মন্তব্য মাত্র—অনুবাদ নহে।

অনুবাদের নমুনা—

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার গ্রন্থ নির্ম্মাণের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য না শুনিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সজ্জনগণের আমার উপর বিমুখতা প্রকাশ করা উচিত নয়।"

"দেশ ও কাল ভেদে নৃপতিগণের ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিষয়ে ঔষধ স্বরূপ নৃপতিদিগের এই সম্পদ পূর্ণ আমার উপযুক্ত কথা অবশ্যই যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। যে গ্রন্থে অতীত ভূপালবর্গের অসীম ব্যবহার বিষয় নিবদ্ধ আছে, ঈদৃশ সন্দর্ভ, উদারচেতা কোন্ ব্যক্তির না হৃদয়গ্রাহী হইবে। এক্ষণে প্রার্থনা এই, যখন প্রাণীবর্গের চেষ্টা, চরিত্র, বিলাস প্রভৃতি সমুদয় বিষয় ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া পরিচিন্তিত হইয়াছে, তখন আপনারা একবার এই শান্তিরসের মস্তকাভিষেক বিচার করিয়া দেখিবেন। বহুল-রস-ক্ষরণে নিতান্ত সুন্দর; এবং যাহাতে স্পষ্টরূপে রাজসঙ্গ বিরাজমান; আপনারা শ্রোত্ররূপ শুক্তি (ঝিনুক) পুট দ্বারা এক্ষণে এই "রাজতরঙ্গিণী" পান করুন"

"রাজতরঙ্গিণী„ বড় আদরের জিনিস বলিয়াই এতটা উদ্ধৃত করিয়াছি।

আদিসার সংগ্রহ। অর্থাৎ অত্রি ঋষির প্রাপ্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। কালনা নিবাসী শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র সেন গুপ্ত মল্লিক কবিরাজ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ৪৭ নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট, সাহিত্যযন্ত্রে শ্রীনিধিরাম পাইন দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮৮

কবিরাজ যোগীন্দ্র চন্দ্র সেন গুপ্ত "আদিসার সংগ্রহ" সর্ব্ব প্রথমে সংগৃহীত করিয়াছেন। উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, "এই আদিসার সংগ্রহ গ্রন্থানুযায়ী ঔষধাদির ন্যায় আশু রোগ নিবারক মহৌষধ ও মহোপকারী তৈল কোন চিকিৎসক দ্বারা অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই।"

"এই গ্রন্থানুযায়ী ঔষধাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ বা তৈল যদি কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে সন্তোষ জনক পুরস্কার দিয়া লোক সকলের উপকারের জন্য বিবিধ সংবাদ পত্রে তাহার ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিব।"

সুতরং আদিসার সংগ্রহকার আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। এই "আদিসার সংগ্রহের" মত কত অমূল্য গ্রন্থ যে এদেশে লোপ পাইয়াছে এবং আজিও অনুসন্ধান এবং যত্নের অভাবে জীর্ণ, কীটদষ্ট পুঁথি আকারে ধীরে ধীরে কাল স্রোতে মিশাইতেছে কে বলিবে? আমাদের বিশ্বাস, সমুচিত চেষ্টা করিলে সেই সব অমূল্য রত্ন এখন ও উদ্ধার করা যাইতেপারে। যে সব পল্লী এক সময়ে সুচিকিৎসকদের আবাস ছিল, এখন সে সব অনাথা বিধবার পুরীতে পরিণত হইয়াছে—সে চিকিৎসক মহাশয়দের বংশ লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞানরাশি কে রক্ষা করিবে? আমাদের মতে লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারার্থ সে জন্য কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হওয়া উচিত।

আদিসার সংগ্রহের পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত এবারে অনুবাদিত হইয়াছে। এখন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন কথা নাই—রূপকচ্ছলে মনুষ্য সমাজের জন্ম এবং উন্নতির ইতিহাস ইহাতে বিবৃত হইতেছে। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া নিত্য-নূতন-প্রয়াসী ইয়ুরোপ সমাজ আজ বাহবা লইতেছেন, এই রূপকে সহজ ভাবে তাহাই বুঝান হইতেছে। তবে তেমন বাঁধাবাঁধি, শৃঙ্খলা বা কৌশল নাই, এই পর্য্যন্ত। অনুবাদ সুখপাঠ্য হয় নাই। ছাপা কাগজ এসবও ভালনয়।

নীলিমা (উপন্যাস)। কলিকাতা, ঝামাপুকুর লেন, ২০ সংখ্যক ভবনস্থ সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৯০ সাল।

উপন্যাস না লিখিতে পারিলেই যে মনুষ্য জন্ম বৃথা হয়, এমন কোন কথা নাই। অথচ বাঙ্গালীর ছেলে, যে কেহ কালির আঁচড় দিতে শিখিয়াছে—তাহা-

রই চেষ্টা উপন্যাস লিখিবে। কেহ কেহ আমোদ করিয়া এই সব উপন্যাসকে প্রেতোন্যাস বলেন। এই প্রেতোন্যাস লেখকদের মধ্যে যাঁহাদের বিদ্যার জাঁক কিছু বেশী, তাঁহারা গ্রন্থের পাত্র এবং পাত্রীদের মুখ হইতে কোম্‌ৎ, মিল, স্পেন্‌সর, ডার্বিন প্রভৃতি গ্রন্থকারের নাম এবং মত অনর্গল বাহির করান। সুতরাং এই সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রেতসাদৃশ্য তত স্পষ্ট নহে, স্বীকার করিতে হইবে।

"নীলিমা"এক কথায় সাধারণীর "চানাচুর"—"ইস্‌মে প্রাড়বিবাক্ হ্যায়, মলিম্লুচ হ্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নবি হ্যায়!" ভরসা করি, গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন দিতে হইলে লিখিবেন—নীতি এবং দুর্নীতি, সামাজিকতা এবং অসামাজিকতা, বিরহ এবং মিলনের খিচুড়িতে যাঁর দরকার, নীলিমা তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে!

নিত্যদর্শন গীতা। শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস সম্পাদক। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস প্রকাশক। কার্য্যালয়—৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

শেষের মলাটে "কয়েকটী বিশেষ নিয়ম" দেখিয়া বুঝিয়া লইলাম, এখানি মাসিক পত্র। আর প্রথম মলাটের প্রায় আগা গোড়া "ওঁ শ্যাম নিরঞ্জন," "কাঙ্গালের ঠাকুর" প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইয়াছে যে, এখানির উদ্দেশ্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার। পরিচয় এই পর্য্যন্তই ভাল—কেননা ভিতরে পড়িয়া কিছু ভাল বুঝিতে পারি নাই। অধ্যক্ষগণ যদি বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই এ ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে এ পত্রের ভাষা এবং প্রণালী এত জটিল কেন? যাহা পড়িতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কোন দেশের সাধারণ পাঠকই তাহা পড়িতে চাননা—ইহাত ধর্ম্মের ব্যাপার। সাদা কথায় মনের ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিলে যে লেখক পাঠক উভয়েরই সুবিধা হয়,—উদ্দেশ্য সিদ্ধি সহজ হইয়া আসে, আমাদের নব্য লেখকের মধ্যে অনেকেই তাহা ভুলিয়া যান। ধর্ম্মপ্রচারকদের জানা উচিত যে, এদেশের প্রচারকদের অমোঘ অস্ত্র ছিল—সরল, সাদা কথা। রাম প্রসাদ এবং বাউল প্রভৃতির গান যে শুনে, যখন শুনে, তখনই মুগ্ধ হয়। কেননা অতি গভীর পরমার্থ তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিয়া বালকের ভাষায় তাঁহারা বুঝাইয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদর্শন।

১০৫ সংখ্যা।

দেবী চৌধুরাণী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কত দূর লইয়া যাইবে—তোমাদের রাণীজি কোথায় থাকেন ?"

র। ঐ বজরা দেখিতেছ না? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা? আমি মনে করিয়াছিলাম ও থানা ইংরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুটিতে আসিয়াছে। তা অত বড় বজরা কেন?

র। রাণীকে রাণীর মত থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্রজ। এত কামরায় কে থাকে?

র। একটায় দরবার। একটায় রাণীর শয়নঘর। একটায় চাকরাণীরা থাকে। একটায় স্নান হয়। একটায় পাক হয়। একটা ফাটক। বোধ হয় আজ আপনাকে সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এই কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। দেবীরাণী ওরফে দেবী চৌধুরাণী, তখন আর ছাদের উপর নাই। যতক্ষণ তাহার লোকে ডাকাইতি করিতেছিল, দেবী ততক্ষণ ছাদের উপর বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে সেতার বাজাইতেছিল। তখন বাজানটা বড় ভাল হইতেছিলনা—বেসুর, বেতাল, কি বাজিতে কি বাজে—দেবী অন্যমনা হইতেছিল। তারপরে যাই ছিপ ফিরিল, দেবী অমনি নামিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এদিকে, রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া, "রাণীজিকি জয়" বলিল। দ্বারে রেশমী পরদা ফেলা আছে—ভিতর দেখাযায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল,

"কি সম্বাদ?"

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। তোমাদের কেহ মারা পড়িয়াছে?

রঙ্গ। না।

দেবী। তোমাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না।

দেবী। তাহাদের কেহ খুন হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না—আপনার আজ্ঞা মতই কাজ হইয়াছে।

দেবী। তাহাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। দুইটা হিন্দুস্থানী দুই আঁচড় খেয়েছে। কাঁটাফোটার মত।

দেবী। মাল?

রঙ্গ। সব আনিয়াছি। মাল, এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল। ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়।

ব্রজেশ্বর যেরূপ লোক, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন বোধ হয়। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি বালক কাল হইতে জানেন না। যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর বাঙ্গালা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, মেয়ে মানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখন শুনি নাই। মেয়ে মানুষ ত পুরুষের বাঁদী। হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথার উত্তর দিলেন,

"পরিচয় লইয়া কি হইবে? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না।"

দেবী। হইবে বৈ কি? আপনি কি দরের লোক তাহা জানিলে, টাকার ঠিকানা হইবে। (তবু গলাটা ধরা ধরা।)

ব্রজ। সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

দেবী পরদার আড়ালে; কেহ দেখিল না, যে দেবী এই কথা বলিবার সময় চোখ মুছিল।

ব্রজ। আমি যদি বলি আমার নাম দুঃখীরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কি না দেখিবার জন্য।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।

দে। তাও না।

ব্র। ব্রজেশ্বর রায়।

দে। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে, আর এক-জন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, "গলাটা ধ'রে গেছে যে?"

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না—বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল ছড় ছড় করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন, ঐ স্ত্রীলোককে কানে কানে বলিল, "আমি আর এরঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা ক। সব জানিসত?"

এই বলিয়া দেবী সে কামরা হইতে উঠিয়া অন্য কামরায় গেল। ঐ স্ত্রীলোকটী দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রজেশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই বামনশূন্যা বামনী—নিশীঠাকুরাণী।

নিশী বলিল, "এইবার ঠিক বলেছ—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাধিল। পরদার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতে ছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল এ সে বুঝি না। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল—এ বুঝি তত মিঠে না। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন,

"যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন—আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কি দরে আমাকে ছাড়িবেন?"

নিশী। এক কড়া কানা কড়ি— সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।

ব্র। আপাতত সঙ্গে নাই।

নিশী। বজরা হইতে আনিয়া দিন।

ব্র। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কানা কড়িও নাই।

নিশী। মাঝিদের কাছে ধার করিয়া আসুন।

ব্রজ। মাঝিরাও কানাকড়ি রাখে না।

নিশী। তবে যতদিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া দিতে পারেন, ততদিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তারপর শুনিলেন, কামরার ভিতরে, আর একজন কে—কণ্ঠে সেও বোধ হয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে "রাণীজি! যদি এক কড়া কানাকড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কানাকড়ি দিতেছি। আমার কাছে উহাকে বিক্রী করুন।"

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রাণী উত্তর করিল, "ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা নিয়ে তুমি কি করিবে? ব্রাহ্মণ, জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।"

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন,—রমণী বলিল, "আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই। আমাকে রাঁধিয়া দিবে।"

তখন নিশী ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনিলেন—আপনি বিক্রী হইলেন—আমি কানাকড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কই তিনি?"

নিশী। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না। আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর, অনুমতি পাইয়া, পরদা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল। কামরার কাঠের দেয়াল, বিচিত্র চারু চিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে, ভক্তজনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে, প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র—শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ; মহিষাসুরের যুদ্ধ; দশ অবতার; অষ্টনায়িকা; সপ্তমাতৃকা; দশমহাবিদ্যা; কৈলাস; বৃন্দাবন; লঙ্কা; ইন্দ্রালয়; নবনারী কুঞ্জর, বস্ত্রহরণ—সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিনদিগে সেইরূপ বালিশ। সোণার আতরদান, তারই গোলাবপাশ, সোণার বাটা; সোণার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশীকৃত সুগন্ধি ফুল; সোণার আলবোলা; পোবজরের সট্‌কা—সোণার মুখনলে মতির থোপ দুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুইপাশে দুই রূপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে; উপরে ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ, সোণার শিকলে লটকান আছে। চারি কোণে চারিটি রূপার পুতুল, চারিটা বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে। মসনদের উপর একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড়মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ—আর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ অনুভূত হইতেছে; কানের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে—তার অপেক্ষা বিস্তৃত চক্ষের তীব্র কটাক্ষ আরও ঝলসিতেছে।—স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার কামরায় প্রবেশ করিয়া, শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীজিকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?"

সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি রাণীজি নই।"

ব্রজেশ্বর দেখিল, এতক্ষণ ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, এ তাহার গলার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতেও পারে, কেননা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে এ স্ত্রীলোক কণ্ঠ বিকৃত করিয়া কথা কহিতেছে। মনে করিল, বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়ে মানুষ হইয়া ডাকাতি করে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল,

"এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায়?"

সুন্দরী বলিল, "তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া, তিনি শুইতে গিয়াছেন। রাণীকে তোমার কি প্রয়োজন?"

ব্র। তুমি কে?

যুবতী। তোমার মুনিব।

ব্র। আমার মুনিব?

যুবতী। জাননা, এই মাত্র তোমাকে এক কড়া কানা কড়ি দিয়া কিনিয়াছি?

ব্র। সত্য বটে। তা তোমাকেই কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?

যুবতী। আশীর্ব্বাদের কি রকম আছে না কি?

ব্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করিতে হয়, —বিধবাকে অন্যরূপ। পুত্রবতীকে—

সুন্দরী। আমাকে "শিগ্‌গির মর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

ব্র। সে আশীর্ব্বাদ আমি কাহাকে করি না—তোমার একশ তিন বৎসর পরমায়ু হোক।

সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে?

ব্র। আগে একদিন ত রাঁধি। খেতে পার ত না হয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।

সুন্দরী। তবে বসো—কেমন রাঁধিতে জান, পরিচয় দাও।

ব্রজেশ্বর, তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমার নাম কি?"

ব্র। তা ত তোমরা সকলেই জান দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার নাম কি? গলা অত মোটা করিয়া কহিতেছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?

সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে আপনি, মশাই আর "আজ্ঞে" বলিবে।

ব্র। আজ্ঞে তাই হইবে। আপনার নাম?

সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য—আমার নাম ধরিতে পারিবে না। বরং বল ত, আমিও তোমার নাম ধরিব না।

ব্র। তবে কি বলিয়া ডাকিলে আমি আজ্ঞে বলিব?

পাঁচকড়ি। আমি রামধন বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি আমাকে মুনিব ঠাকরুণ বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ী কোথায়?

ব্র। এককড়ায় কিনিয়াছ—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি?

পাঁচকড়ি। ভাল, সে কথা নাই বলিলে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। রাঢ়ী না বারেন্দ্র না বৈদিক?

ব্রজ। হাতের ভাত ত খাইবেন—যাই হই না।

পাঁচকড়ি। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও—তাহা হইলে রাঁধিতে পাইবে না। তাহা হইলে তোমাকে অন্য কাজে দিব।

ব্রজ। অন্য কি কাজ?

পাঁচ। জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে—কাজের অভাব কি?

ব্র। আমি রাঢ়ী।

পাঁচ। তবে তোমায় জল তুলিতে কাঠ কাটিতে হইবে—আমি বারেন্দ্র।—তুমি রাঢ়ী—কুলীন না বংশজ?

ব্র। এ কথা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ যুটিবে কি? আমি কৃতদার।

পাঁচকড়ি। কৃতদার! কয় সংসার করিয়াছেন?

ব্র। জল তুলিতে হয়—জল তুলিব—অত পরিচয় দিব না।

তখন পাঁচকড়ি, দেবী রাণীকে ডাকিয়া বলিল, "রাণীজি! বামুন ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।"

নিশী আপন পক্ষ হইতে উত্তর করিল "বেত লাগাও।" তখন দেবীর একজন পরিচারিকা, শপাত করিয়া একগাছা লিকলিকে, সোজা বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া, ঢাকাই রুমালের ভিতর মধুর অধর চারু দন্তে টিপিয়া বিছানায় বার দুই বার বেত গাছা আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, "দেখিয়াছ?"

ব্রজেশ্বর হাসিল। বলিল, "আপনারা সব পারেন। কি বলিতে হইবে, বলিতেছি।"

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কি হইবে? তোমার রান্না ত খাইব না। তুমি আর কি কাজ করিতে পার বল?

ব্র। হুকুম করুন।

পাঁচ। জল তুলিতে জান?

ব্র। না।

পাঁচ। কাঠ কাটিতে জান?

ব্র। না।

পাঁচ। বাজার করিতে জান?

ব্র। মোটামুটি রকম।

পাঁচ। মোটামুটিতে চলিবে না। বাতাস করিতে জান?

ব্র। পারি।

পাঁচ। আচ্ছা, এই চামর নাও—বাতাস কর।

ব্রজেশ্বর চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। পাঁচকড়ি বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ জান। পা টিপিতে জান?"

ব্রজেশ্বরের দুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া একটি ছোট রকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যুনেত্রীদিগের কোন রকমে খুসি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সে অভিপ্রায় ও ছিল। অতএব, পাঁচকড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব সেত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপ না," বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আলতাপরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন। কি করেন! ব্রজে-

শ্বর কাজেই দুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, এ কাজটা কি ভাল হইতেছে?

তখন দুষ্টা পাঁচকড়ি, ডাকিল, "রাণীজি! একবার এদিকে আসুন।"

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইল। পা নামাইয়া দিল। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, "সে কি? পিছোয় কেন?"

এবার পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইলেন,—"সেকি? এ গলা'ত চেনা গলাই বটে।" সাহস করিয়া ব্রজেশ্বর পাঁচকড়ির মুখ ঢাকা রুমাল খানা খুলিয়া লইলেন। পাঁচকড়ি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সেকি? একি? তুমি—তুমি সাগর।"

পাঁচকড়ি বলিল "আমি সাগর। গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর! তোমার বড় অভাগ্য—না? যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিয়াছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেলে! যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ। এখন আমার মুখ পানে চাহিয়া দেখিতে পার। আমায় ত্যাগ কব, আর পায়ে রাখ—এখন জানিলে আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে, সত্য সত্যই সতী সাধ্বী! বিশ্বাস হয় কি?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল "সাগর! তুমি এখানে কেন?" সাগর বলিল "সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন?"

ব্র। তাই কি? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে! তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। আমি ইচ্ছা ক্রমে দেবীরাণীর সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া আমার পা টিপাইব বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশী আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারের জাঁকজমক দেখিয়া মনে করিল, "এই দেবীচৌধুরাণী।" ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশী বলিল,

"স্ত্রীলোক ডাকাত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই—আপনি বসুন। এখন শুনিলেন কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাতি করিয়াছি? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে; এখন আপনাতে আর আমাদের

প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার নৌকায় ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিষ পত্র এক কপর্দ্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দ্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কি হইবে? একি বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন কি? মনে করুন, আপনি উহার এককড়ার কেনা গোলাম।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! ব্রজেশ্বর বিহ্বল হইল! তবে ডাকাতি সব মিথ্যা, এরা ডাকাত নয়। ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিল, ভাবিয়া শেষে বলিল,

"কেহ আমাকে বোকা বানাইতে পারে নাই—কিন্তু তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম দেবী চৌধুরাণীর দলে আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।"

তখন নিশী বলিল, "সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবীরাণী সত্য সত্যই ডাকাতি করেন"—কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেশ্বর বলিল "দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাতি করেন—তবে আপনি কি দেবীরাণী নন?"

নিশী। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজীকে দেখিতে চান, তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাতি করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হইল!

ব্র। আসিল কি প্রকারে?

নিশী। রাণীজির সঙ্গে।

ব্র। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—সেখান হইতেই আসিতেছি। কই সেখানে ত রাণীজিকে দেখি নাই?

নিশী। রাণীজি আপনার পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্র। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কি প্রকারে?

নিশী। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন ত? পঞ্চাশ বোটে।

ব্র। তবে আপনারাই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না?

নিশী। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাহাকে না বলিয়া রাণীর সঙ্গে আসিয়াছে—এখন অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে? আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্র। ভাল, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন্।

"দিতেছি" বলিয়া নিশী সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন সাগরকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রজেশ্বর, বলিল, "সাগর! তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে?"

মুখে অঞ্চল দিয়া—এবার ঢাকাই

রুমাল নহে—কাপড়ের যেখানটা হাতে উঠিল সেই খানটা মুখে ঢাকা দিয়া, সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি ভাবি কান্না কাঁদিল। চুপি চুপি—পাছে দেবী শোনে।

কান্না থামিলে, ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি আমায় ডাকিলে না কেন? ডাকিলেই সব মিটিয়া যাইত।"

সাগর, কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কপালের ভোগ! কিন্তু আমি নাই ডাকিয়াছি—তুমিই বা আসিলে না কেন?"

ব্র। তুমি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলে—না ডাকিলে যাই কি বলিয়া?

এই সকল কথা বার্ত্তা যথাশাস্ত্র সমাপন হইলে ব্রজেশ্বর বলিল,

"সাগর! তুমি এ ডাকাতের সঙ্গে কেন আসিলে?"

সাগর বলিল, "দেবী সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়, পূর্ব্বে জানা শুনা ছিল। তুমি চলিয়া আসিলে সে গিয়া আমার বাপের বাড়ী উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে বলিল, "কাঁদ কেন ভাই—তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দিব। আমার সঙ্গে দুই দিনের তরে এসো, তাই আমি আসিলাম। দেবীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোমার সঙ্গে আমি পলাইয়া চলিলাম, এই কথা আমি চাকরাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। তোমার জন্ত এইসব আলবোলা, শটকা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছি—একবার তামাক টামাক খাও, তার পর যেও।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "কই, যে মালিক সে ত কিছু বলে না।"

তখন সাগর দেবীকে ডাকিল। দেবী আসিল না—নিশী আসিল।

নিশীকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এখন আপনি ছিপ হুকুম করিলেই যাই!"

নিশী। ছিপ তোমারই। কিন্তু দেখ, তুমি রাণীর বোনাই—কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না—কেবল অপমানই করিলাম—এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাত বলিয়া আমাদের কি হিন্দুয়ানি নাই?"

ব্রজ। কি করিতে বলেন?

নিশী। প্রথমে উঠিয়া ভাল হইয়া বসো।

নিশী মসনদ দেখাইয়া দিল। ব্রজেশ্বর শুধু গালিচায় বসিয়াছিল। বলিল, "কেন, আমি বেশ বসিয়া আছি।"

তখন নিশী সাগরকে বলিল, "ভাই, তোমার সামগ্রী তুমি তুলিয়া বসাও। জান ত আমরা পরের দ্রব্য ছুঁইনা।"

হাসিয়া বলিল "সোণা রূপা ছাড়া।"

ব্র। তবে আমি কি পিতল কাঁশার দলে পড়িলাম?

নিশী। আমি ত তা মনে করি—পুরুষ মানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে।

না থাকলে ঘর সংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সকড়ি হয়—মাজিয়া, ঘষিয়া, ধুইয়া ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর তোর ঘটি বাটি তফাৎ কর,—কি জানি যদি সকড়ি হয়।

ব্র। একেত পিতল কাঁসা—তার মধ্যে আবার ঘটি বাটি? ঘড়াটা গাড়ুটাব মধ্যে গণ্য হইবার ও কি যোগ্য নহি?

নিশী। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারিনা—আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষ মানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পূরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।”

নিশী বলিল, “ঠিক বলিয়াছিস্—তাই মেয়ে মানুষে এ জিনিস গলায় বাঁধিয়া সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া মরে।—নে ভাই তোর কলসী, কলসী পীড়ির উপর তুলিয়া রাখ।”

ব্র। কলসী মানে মানে আপনি পীড়ির উপর উঠিতেছে।

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনি মসনদের উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ দুই দিগ হইতে দুইজন পরিচারিকা—সুন্দরী, যুবতী, বহুমূল্য বসন ভূষণ ভূষিতা—দুইটা সোণা বাঁধা চামর হাতে করিয়া ব্রজেশ্বরের দুই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞা না পাইয়াও তাহারা ব্যজন করিতে লাগিল। নিশী তখন সাগরকে বলিল, “যা এখন, তোর স্বামীর জন্য আপন হাতে তামাক সাজিয়া লইয়া আয়!”

সাগর ক্ষিপ্র হস্তে, সোণার আলবোলার উপর হইতে কলিকা লইয়া গিয়া শীঘ্র, মৃগনাভি সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া আনিল। আলবোলায় চড়াইয়া দিল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, “আমাকে একটা হুঁকায় নল করিয়া তামাকু দাও।”

নিশী বলিল—“কোন শঙ্কা নাই—ঐ আলবোলা উৎসৃষ্ট নয়। কেহ কখন উহাতে তামাকু খায় নাই। আমরা কেহ তামাকু খাই না।”

ব্র। সে কি? তবে এ আলবোলা কেন?

নিশী। দেবীর রাণীগিরির দোকান দারি—

ব্র। তা হোক—আমি যখন আসিলাম, তখন যে তামাকু সাজা ছিল—কে খাইতেছিল?

নিশী। কেহ না—সাজাও দোকানদারি।

ঐ আলবোলা সেই দিন বাহির হইয়াছে—ঐ তামাকু সেই দিন কেনা আসিয়াছে—সাগরের স্বামী আসিবে বলিয়া। ব্রজেশ্বর মুখনলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন-অভুক্ত বোধ হয়। তখন ব্রজেশ্বর ধূমপানের অনির্ব্বচনীয় সুখে মগ্ন হইলেন। তখন নিশী সাগরকে বলিল, “তুই পোড়ারমুখী আর দাঁড়াইয়া কি করিস্?—পুরুষ মানুষে হুকার নল মুখে

করিলে আর কি স্ত্রী পরিবারকে মনে ঠাঁই দেয়? যা তুই গোটাকত পান সাজিয়া আন্। দেখিস্—আপন হাতে পান সাজিয়া আনিস্—পরের সাজা আনিস্ না—পারিস্ যদি একটু ওষুধ করিস।”

সাগর বলিল, “আপন হাতেই সাজা আছে—ওষুধ জানিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?”

এই বলিয়া সাগর চন্দন কর্পূর চুয়া গোলাবে সুগন্ধী পানের রাশি সোণার বাটা পূরিয়া আনিল। তখন নিশী বলিল, “তোর স্বামীকে অনেক বকিয়েছিস্—কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।”

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল “সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাপ করিও।”

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না—সাগর বড় তাড়াতাড়ি আর এক কামরায় ঝাঁট দিয়া, জলের হাতে মুছিয়া, একখানা বড় ভারি পুরু আসন পাতিয়া, চারি পাঁচ থানা রূপার থালে সামগ্রী সাজাইয়া ফেলিল। স্বর্ণ পাত্রে উত্তম সুগন্ধী শীতল জল রাখিয়া দিল। জানিতে পারিয়া নিশী ব্রজেশ্বরকে বলিল, “ঠাঁই হইয়াছে—উঠ।” ব্রজেশ্বর উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিশীর কাছে যোড় হাত করিল।—বলিল, “ডাকাতি করিয়া ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়াছ-সে অত্যাচার সহিয়াছে—কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সহিবে না—দোহাই!”

স্ত্রীলোকেরা মার্জ্জনা করিল না। ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইল। সাগর তখন নিশীকে বলিল, “ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।” নিশী বলিল “দক্ষিণা রাণী স্বয়ং দিবেন। এসো ভাই, রাণী দেখিবে এসো।” এই বলিয়া নিশী ব্রজেশ্বরকে আর এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিশী ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবারের কামরার মত অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশীরভাগ, একখানা সুবর্ণমণ্ডিত, মুক্তাঝালরযুক্ত, ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে সকল দিগে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রথিতনাম্নী, দেবীকে দেখিবেন। দেখিলেন, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠবতী একটী স্ত্রীলোক। নিশী ও সাগরে, ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এ স্থিরা, ধীরা,—নিম্নদৃষ্টি, লজ্জাবনত মুখী। নিশী ও সাগর, বিশেষতঃ নিশী সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার মণ্ডিতা, বহুমূল্য বসনে আবৃতা,—কিন্তু ইহার তা কিছুই নাই।

দেবী. ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসায়, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে, দেবী সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া, হাতে কেবল একখানি মাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া, ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে নিশীর বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল ; শেষে বুঝিতে পারিয়া, আপনা আপনি তিরস্কার করিয়াছিল ; "ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!" তাই এ বেশ পরিবর্ত্তন।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশী চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে, দেবী গাত্রোত্থান করিয়া, ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া, ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল—কই আর কেহত প্রণাম করে নাই? দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিল যথার্থ দেবীমূর্ত্তি। এমন আর কখন দেখিয়াছি কি? হাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরও মধুর,—কেননা, দেবী মূর্ত্তি তখন বালিকার মূর্ত্তি—ব্রজেশ্বরের তখন প্রথম যৌবন। হায়! এ যদি সেই হইত! এ মুখ দেখিয়া ব্রজেশ্বরের সে মুখ মনে পড়িল, কিন্তু দেখিলেন, এ মুখ সে মুখ নহে। তার কি কিছুই এতে নাই? আছে বৈকি—কিছু আছে। ব্রজেশ্বর তাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। সে ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে—তবে মানুষে মানুষে কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে–যে একজনকে দেখিলে আর একজনকে মনে পড়ে। এ তাই না? ব্রজ ?

ব্রজ তাই মনে করিল। কিন্তু সেই সাদৃশ্যেই হৃদয় ভরিয়া গেল—ব্রজের চক্ষে জল আসিল; পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে, আজ একটা কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইত। দুইখানা মেঘই বৈদ্যুতী ভরা।

প্রণাম করিয়া, নিম্ননয়নে, দেবী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন "আমার উপকারই করিয়াছেন।" বেশী কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই।

দেবী আরও বলিল, "আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্য্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

ব্রজ। স্ত্রীর মত কোন্ ধন? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন। ইহার বেশী আর কি দিবেন?"

ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে? স্ত্রীর মত ধন আর নাই? তবে বাপ বেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন?

পালঙ্কের পাশে একটী রূপার কলসী ছিল—তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, "ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্র। আপনার বজরায় এত সোণা রূপার ছড়াছড়ি, যে এই কলসীটা নিতে আপত্তি করিলে, সাগর আমায় বকিবে। কিন্তু একটা কথা আছে—।

কথাটা কি দেবী বুঝিল, বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি ডাকাতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।"

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের "বিদায়" বা "মর্য্যদা" গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধ হয়, হয় নাই। কলসীটা বড় ভারি ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "একি এ? কলসীটা নিরেট নাকি?"

দেবী। টানিবার সময়ে উহার ভিতর শব্দ হইয়াছিল—নীরেট সম্ভবে না।

ব্র। তাইত? এতে কি আছে?

কলসীতে ব্রজেশ্বর, হাত পূরিয়া তুলিল—মোহর। কলসী মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব।

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কি?

দেবী। কেন?

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্র। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয় চুরি ডাকাতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম্ম হয় না, কেননা এ টাকা নহিলে আমার বাপের জাতি রক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যুসম্বাদ শুনিলে পর ঐ টাকার আসল, আর এক মোহর সুদ, দেব সেবায় ব্যয় করিবেন।

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যেরূপে ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা জুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতেও পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি এক স্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশী করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকিব। চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, মোহরের ঘড়া ছিপে উঠাইয়া দিয়া আইসে। পরিচারিকারা ঘড়া ছিপে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিলেন। তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিল,

"আর একটা কথা বাকি আছে। এ ত কর্জ্জ দিলাম—মর্য্যাদা দিলাম কই?

ব্র। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটা আঙ্গটী খুলিল। ব্রজেশ্বর, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য, সহাস্যবদনে হাত পাতিলেন। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মনের ভিতর একটা গোলমাল হইয়া গেল, জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। শরীরে কাঁটা দিল—ভিতরে যেন অমৃতস্রোত ছুটিল। জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর, হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল। বিধাতা এক এক সময়ে এমনই বাদ সাধেন, যেসময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়।

তা দেবী সেই মানসিক গোলযোগের সময়ে ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে ধীরে ধীরে আঙ্গটি পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে ফোঁটা দুই তপ্তজল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কি রকমে কি হইল বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর ত জিতেন্দ্রিয়—কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোল লাগিয়াছিল। সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল—বুঝি সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল—সে চোখের জলমোছানটাও বুঝি

মনে পড়িল। এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাঁধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া,—কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখ খানা প্রফুল্লর মত দেখিল। বিবশ, বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রু-নিষিক্ত বিম্বাধরে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিলাম! একি প্রফুল্ল? সে যে দশবৎসর মরিয়াছে! ব্রজেশ্বর ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া, একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল। সাগরকে সঙ্গে লইয়াও গেল না। সাগর "ধর! ধর! আসামী পলায়!" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। ছিপ খুলিয়া ব্রজেশ্বরকে, ও ব্রজেশ্বরের দুই রত্নাধার, একটি সাগর আর একটি কলসী—ব্রজেশ্বরের নৌকায় পৌছাইয়া দিল।

এদিকে নিশী আসিয়া দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশী তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল। তখন নিশী বলিল,

"এই কি মা তোমার নিষ্কাম কর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা এখন?"

দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশী বলিল, "ও সকল ব্রত মেয়ে মানুষের নহে। যদি মেয়েকে ওপথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকণ্ঠেশ্বর একই।"

দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তুমি যমের বাড়ী যাও।"

নিশী। আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার উপর যমের অধিকার নাই। তুমি শ্বশুর বাড়ী যাও।

দেবী। সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এপথে আসিতাম না। এখন বজরা খুলিয়া দিতে বল। চার পাল উঠাও।

তখন সেই জাহাজের মত বজরা, চারি খানা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল।

রঘুবংশ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কালিদাসের ঋতু সংহারে মঙ্গলাচরণ নাই, কুমার সম্ভবে মঙ্গলাচরণ নাই, মেঘদূতেও মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্তু রঘুবংশে মঙ্গলাচরণ আছে। রঘুবংশ লিখিবার সময় কালিদাসের ধর্ম্মবুদ্ধি গভীর ও প্রবল হইয়াছিল। কোন ও

গ্রন্থে কালিদাস আমি যে একান্ত অকিঞ্চন, এ ভাব প্রকাশ করেন নাই। কেবল শকুন্তলা ও রঘুবংশে করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলায় লিখিয়াছেন :—

আপরিতোষাৎ বিদুষাং
নসাধুমন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্
বলবদপি শিক্ষিতানাং
আত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ ॥

রঘুবংশে লিখিয়াছেন :—

ক্ক সূর্য্য প্রভবোবংশ :
কচাল্প বিষয়ামতিঃ।
তিতীর্ষুদুস্তরং মোহা
দুড়ুপেনাস্মি সাগরং ॥
মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী
গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভা
দুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥
অথবা কৃত বাগদ্বারে বংশে
হস্মিন পূর্ব্ব সুরিভিঃ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে
সূত্রস্যেবাস্তি মেগতিঃ ॥

এই বিনয় পূর্ণ বাক্যদ্বয়ের মধ্যেও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রথম বাক্যটী যদিও বিনয় পূর্ণ, কিন্তু তথাপি আমি যে শিক্ষিত এই অভিমানটী সম্পূর্ণ আছে। ইহা বহুদর্শিতার অভাবের ফল। দ্বিতীয়টীতে এরূপ অভিমানের লেশ মাত্রও নাই, তাহার প্রতি অক্ষরে বলিতেছে যে আমি নিতান্ত অকিঞ্চন। যেন লেখক স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব কবিরা তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি যেন তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় কিছুই নহেন। এত বিনয়, এত অভিমানশূন্যতা যতদিন বয়স থাকে, ততদিন হয় না। কালিদাস এই কয়টী কবিতায় আপনার পূর্ব্ব কবিদিগের যে স্তুতি বাদ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

এই সকল বিনয় বচনের পর কালিদাস নিজ মহাকাব্যের বিষয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশ লিখিবার সময় অন্যান্য কাব্য লেখা অপেক্ষা কিছু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। যে অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাকবি কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলাও বিক্রমোর্ব্বশী লিখিতে কিছুমাত্র ভীত, কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয়েন নাই, রঘুবংশ আরম্ভ করিয়া তাঁহার মনে নানাবিধ দ্বিধার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিষয়ের মাহাত্ম্য, নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও প্রকাণ্ডত্ব ভাবিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই গ্রন্থ লিখিতে বসিলেই বাল্মীকি, বেদব্যাসের সহিত তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইবেক। সে রঙ্গভূমে তাঁহার জয়লাভ একান্ত সন্দেহাস্পদ। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে নায়ক নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা সহজ ও চিরপ্রচলিত। তিনি নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজে যশস্বী হইয়াছেন কিন্তু এবার নূতন ব্যাপার। এ রচনায় নায়ক নায়িকা নাই, বিশ পঁচিশ

পুরুষ ধরিয়া একটী বংশের বর্ণনা করিতে হইবে, অথচ সে বংশ বর্ণনা পুরাণ হইবে না, ইতিহাস ও হইবে না, অথচ উৎকৃষ্ট কাব্য হওয়া চাই। কালিদাস মনে মনে বিলক্ষণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন সামাজিকেরা তাঁহার গ্রন্থের আদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, কারণ এ গ্রন্থখানি সামাজিকতা, অলঙ্কারের নিয়ম, কবিদিগের চিরপ্রসিদ্ধি—সমস্ত অতিক্রম করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন পুবঃসর লিখিতে হইয়াছে। তাই তিনি সামাজিকদিগকে তোষামোদ করিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিয়াছেন,

তংসন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি
সদসদ্ব্যক্তি হেতবঃ।
হেম্নঃসংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ
বিশুদ্ধিঃ শ্যামকাপিবা॥

আমরা এ কবিতার এরূপ অর্থ বুঝিয়াছি—"আপনারা অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার কাব্যখানি গ্রহণ করুন (অর্থাৎ নূতন রকমের কাব্য বলিয়া অবহেলা করিবেন না।) যেহেতুক ভালই হউক আর মন্দই হউক, আপনারাই কেবল তাহা বুঝিতে পারিবেন। উহা যদি ভাল হয়, গ্রহণ করিবেন; মন্দ হয় পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ সঙ্কুচিত হৃদয়ে, কুণ্ঠিত অন্তঃকরণে ও ভীত মনে, মহাকবি কালিদাস যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে,

"Unattempted yet in Prose or Rhyme"

মিলটন যদি (Paradise lost) নামক মহাকাব্যের ভূমিকায় উহাকে

"Unattempted yet in Prose or Rhyme"

বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, তবে আমাদিগেরও কালিদাসের উক্ত মহাগ্রন্থকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিবার অধিকার আছে।

বাল্মীকি, রামায়ণ মধ্যে আদর্শমনুষ্য, আদর্শরমণী, আদর্শরাজা ও আদর্শপরিবার দেখাইয়াছেন। কালিদাস আরও একটু ছাড়াইয়া উঠিলেন। কালিদাসের উদ্দেশ্য—আদর্শ বংশ বর্ণনা। ঐ বংশের যে কোনও ব্যক্তিকে লও, তিনিই কোন না কোন বিষয়ের আদর্শ। রঘুরাজা দিগ্বিজয়ীর আদর্শ, অজরাজা সহৃদয়তার আদর্শ, রাজা দশরথ ব্যসনাসক্তির আদর্শ. কুশরাজা রুচিমত্তার আদর্শ, অতিথিনীতি পরায়ণতার আদর্শ; সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য যে অগ্নিবর্ণ, সেও বিলাসিতার আদর্শ। কালিদাস এই আদর্শ সমূহের ঠিক মধ্যস্থলে বাল্মীকির সেই আদর্শ মনুষ্যকে বসাইয়াছেন। বসাইয়া, রঘুবংশ রূপ প্রকাণ্ড চিত্র হইতে প্রকাণ্ডতর চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও তাহাতে জগৎব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহা সুন্দর, যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু প্রকাণ্ড পদার্থ আছে, তৎসমূহ সংযোগে পূর্ব্বোক্ত আদর্শচিত্র সমূহের এক প্রকার নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠকগণ! তোমরা মনে করিও না, কালি-

দাসের চিত্র সমূহ আলেখ্য লিখিত চিত্রের ন্যায়। উহারা সচল, সজীব ও জীবনময়। কালিদাসের মনুষ্যগুলি আলৌকিক জীবনীশক্তিতে 'জীবনময়;' দেবতাগণ স্বর্গীয় জীবনী শক্তিতে জীবন-ময়। কালিদাসের ভৌতিক পদার্থ বর্ণনায় ভৌতিক পদার্থগুলিকে জীবনী-শক্তি দিয়া যেন জীবনময় করিয়া তুলি-য়াছে, কিন্তু এজীবন বাইরণের জীবনের ন্যায় খরপ্রবাহিত নহে। উহা শান্তি-ময়, তেজোময় ও সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক। বাস্তবিকই কালিদাসের রঘুবংশের ন্যায় জীবনময় গ্রন্থ সংসারে আছে কি না সন্দেহ। বড় বড় কাব্য পড়িতে বসিলে অল্পক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অত্যন্ত এক ঘেয়ে। মিল্টন বল, রামা-য়ণ বল, মহাভারত বল, সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও ঐ এক দোষে সব মাটি করি-য়াছে। কিন্তু কালিদাসের এ প্রকাণ্ড গ্রন্থে ঐ দোষের লেশ মাত্রও নাই। যতই পড়িয়া যাইবে, ক্রমেই দেখিবে নূতন নূতন পদার্থ আসিতেছে, বর্ণনা কোথাও লম্বা নহে। যতটুকু বলিলে বর্ণিত বস্তু পাঠকগণের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পাবে, তাহার উপব রঘু-বংশে কালিদাস একটী অক্ষর অধিক লিখেন নাই।

রঘুবংশের প্রত্যেক রাজাই মনুর অনুমোদিত রাজগুণ সমূহে বিভূষিত। তিনি গ্রন্থারম্ভে এই রাজগণের সাধারণ গুণগ্রাম এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানা
মাফলোদয়কর্ম্মনাং।
আসমুদ্রক্ষিতীশানা
মানাকরথবর্ত্মনাং॥
যথাবিধিহুতাগ্নীনাং
যথাকামার্চ্চিতার্থিনাং।
যথাপরাধদণ্ডানাং
যথা কালপ্রবোধিনাং॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং
সত্যায় মিতভাষিণাং।
যশসে বিজিগীষুণাং
প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং॥
শৈশবে ঽভ্যস্তবিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাং॥
রঘুণামন্বয়ং বক্ষ্যে
তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্।"

এতগুণ ত সকলেরই ছিল। তাহার উপর আবার কালিদাস দেশগত, পাত্রগত, কালগত, অবস্থাগত ও কার্য্যগত বিশেষ বিবেচনা করিয়া নানাবিধ নূতন গুণের অবতারণা করিয়া এক একটী রাজাকে এক একটী দেবতুল্য করিয়াছেন।

দিলীপ।

কালিদাসের প্রথম রাজা দিলীপ। ইনি রঘুবংশের রাজা নহেন, বংশ প্রব-র্ত্তয়িতা রঘুরাজার পিতা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কালিদাস গ্রন্থারম্ভ করিলেন, প্রৌঢ় বয়স্ক এক রাজা আর তাঁহার

অতীত যৌবনা এক রমণী লইয়া। তাই না হয় হউক, ইঁহাদের মধ্যেও প্রাণের তরঙ্গ নাই। নাই থাকুক, না হয় চন্দ্রালোক মধ্যে প্রমোদ কাননেই গ্রন্থারম্ভ হউক, তাহাও নহে। গ্রন্থারম্ভ হইল কি লইয়া? না এক বুড় এক বুড়ী—ছেলে হয় না বলে বনের ভিতর দিয়া গুরুর বাড়ী চলিলেন। যদি কালিদাস অল্পবয়সে এই গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মত "পক্কতাং গতঃ" লোক আর কথনও জন্মায় নাই ও জন্মাইবেনা। যদিও কখন যুবক কবি এইরূপ বুড়া বুড়ী লইয়া গ্রন্থারম্ভ করেন, তাঁহার সহিত বর্ণনীয় বুড়া বুড়ীর কিছু মাত্র সহানুভূতি থাকে না, কিন্তু দিলীপ ও সুদক্ষিণার বর্ণনায় কালিদাসের হৃদয় যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। রাজার আকার এইরূপ :—

> ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ
> শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
> আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং
> ক্ষাত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥

তিনি বড় রাশভারি লোক, অথচ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কেহ থাকিতে পারে না!

> ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ
> স বভূবোপজীবিনাং।
> অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ
> যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

এ সব হৃদয়োচ্ছ্বাসের কথা নয় ত কি? কালিদাস নিজে বৃদ্ধ বয়সে নিজের মনের মত একটী বৃদ্ধ রাজা গড়িয়া আপনার গ্রন্থের প্রথমেই সন্নিবেশ করিয়াছেন। কালিদাস এই রাজার বিষয় যত বর্ণনা করিয়াছেন ও ইহাঁর বর্ণনায় যত বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিয়াছেন, আপনার লিপি-চাতুর্য্যের ও অলঙ্কার-প্রয়োগ-কুশলতার যত পরিচয় দিয়াছেন, এত বোধহয় আর কোথাও দেন নাই। অনেকে বলেন যে, রাজার চরিত্রবর্ণনা একটু লম্বা ও বিরক্তিকর হইয়াছে। আমারও প্রথম তাহাই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, কালিদাসের ভাষা অন্যত্র যেরূপ সরল, এখানে তত সরল নহে। উহা গূঢ় অলঙ্কারমালায় পরিপূর্ণ। কালিদাসের কবিতা পড়িবামাত্রেই ভাব ও চিত্র যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হয়। কিন্তু এখানে দেখিলাম, একটু প্রণিধান করা আবশ্যক। আরও বিস্মিত হইলাম। কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, রঘুবংশ কালিদাসের বৃদ্ধাবস্থায় লেখা; যখন বুঝিতে পারিলাম, কালিদাস বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধ রাজার গুণবর্ণনায় নিতান্ত ব্যস্ত; তখন বুঝিতে পারিলাম, কালিদাসের এই বর্ণনায় একটু গূঢ়ত্ব রাখার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই ভাষা তত সরল নহে, একটু গম্ভীর। প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, কালিদাস এই গাম্ভীর্য্যময় ভাষার অন্তরালে কি এক চমৎকার স্থবির নরপতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজা ধার্ম্মিক, যজ্ঞনিরত, নির্লোভ, প্রজাহিতৈষী, দেব

ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দুরাজার যত গুণ থাকা আবশ্যক, ততগুণে ভূষিত। শূর, বীর, দয়ালু, সাহসী, পণ্ডিত বিচক্ষণ, বিদ্বান্—রাজা সকল গুণের আধার।—

জুগোপাত্মানমত্রস্তো
ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থ
মশক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ
ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ
তস্য সপ্রসবা ইব॥
স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্
পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে।
অপ্যর্থকামৌতস্যাস্তাং
ধর্ম্মএব মনীষিণঃ॥

সুদক্ষিণা।

কালিদাস সুদক্ষিণার বড় বর্ণনা করেন নাই, ভারতীয় অন্যান্য সাধ্বী-দিগের ন্যায় সুদক্ষিণার স্বামী ভিন্ন অন্য জীবন ছিল না। তাই বহুদর্শী, বিচক্ষণ কবি, সুদক্ষিণার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এমন কি, সমস্ত রঘুবংশে আমরা যে পরিমাণে রমণীবর্ণনা দেখিতে চাই, তাহার কিছুই পাই না। হিন্দু সংসারে রমণী জীবন বিবাহের দিন হইতেই স্বামীতে বিলীন,—উহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তাই কালিদাস রমণীচরিত্র লইয়া রঘুবংশে তত বাড়াবাড়ি করেন নাই। প্রাচীন বয়সে রমণী লইয়া বাড়াবাড়িটা তত ভাল দেখায় না। রাজা রাণীর বর্ণনা হইলে পর, কালিদাস মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া রাজা ও রাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক রথে আরোহণ করিয়াছেন; রথ, মেঘের ধ্বনির ন্যায় গুড় গুড় গুড় ধ্বনী করত বনমধ্য দিয়া প্রস্থান করিতেছে। রাজা ও রাণী তদুপরি আরোহণ করত বনশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বনভূমি।

কবিদিগের স্বভাববর্ণনায় একটু আশ্চর্য্য কৌশল আছে। স্বভাব আজিও যেমন, কালিও তেমনি। উহাকে যে চক্ষে যখন দেখিবে, তখন সেইরূপ দেখিতে পাইবে। যখন মন নিতান্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, তখন স্বভাবের সকল বস্তুই খারাপ খারাপ বোধ হয়। আবার যখন বড় আমোদ, তখন সমস্ত স্বভাব যেন চারিপাশে হাসে। ঐ দেখ প্রৌঢ়বয়স্ক রাজা ও রাণী ভক্তিভাবে রীতিমত সংযত হইয়া গুরুগৃহে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের চক্ষে সমস্ত স্বভাবই পবিত্র। কালিদাস তাঁহার পাঠকদিগকে একখানি বনভূমি দেখাইয়াছেন। তাহাতে রাজা ও রাণীর পবিত্র ধর্ম্মভাব মাখান। রাজা, বনের মধ্যে যা কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে, সমস্তই আপনার প্রিয়তমাকে দেখাইতে দেখাইতে যাইতেছেন। রাজা ও রাণীকে দেখিলে বোধ হয়, যেন চিত্রানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রমার

যোগ হইয়াছে। রাজা এইরূপে গমন করিতে করিতে আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কত পথ যে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও পারিলেন না।

আশ্রম।

দূর হইতেই আহুতির গন্ধে রাজা বুঝিতে পারিলেন, আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। ক্রমে আহুতির ধূম আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, তেজোময় ঋষিগণ চারিদিক হইতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইতেছেন। তখন সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। ঋষিদিগের শরীর হইতে অগ্নিময় প্রভা নির্গত হইতেছে। বোধ হইতেছে, তাঁহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কি না, তাই অগ্নিদেব তাঁহাদিগকে আগু বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছেন। চারিদিকে হরিণ শিশুরা কুটীর দ্বারে মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঋষিপত্নীরা নীবার-ধান্যগুলি দিনের বেলায় রৌদ্রে শুকাইয়া উঠানে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়াছেন। রাজা প্রথমে রাণীকে রথ হইতে নামাইয়া দিলেন, পরে নিজে নামিলেন।

বশিষ্ঠ।

রাজা যখন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন বশিষ্ঠ সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া অরুন্ধতির সহিত বসিয়া আছেন। রাজা উপস্থিত। ঋষি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি যাহার সমস্ত বিঘ্নবিনাশ করেন, তাহার আবার অকুশল কি প্রকারে হইতে পারে?" রাজার বাক্যপরম্পরার প্রতিপদে তাঁহার অতুল গুরুভক্তি ও ব্রাহ্মণানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে, রাজা আপনার অপুত্রকতার কথা উল্লেখ করিয়া নিতান্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন। এ দুঃখ তাঁহার নিজের জন্য নহে—হিন্দুরা নিজের জন্য দুঃখ করিতে কখন শিখেন নাই। রাজার দুঃখ পূর্ব্বপুরুষদিগের জলপিণ্ড-স্থানলোপ হইবে বলিয়া—

> মৎপরং দুর্ল্লভং মত্বা
> নূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
> পয়ঃপূর্ব্বৈঃ সনিশ্বাসৈঃ
> কবোষ্ণমুপভুজ্যতে॥
> নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ
> পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ।
> নপ্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে
> স্বধা সংগ্রহতৎপরাঃ॥

রাজার অটল বিশ্বাস, তাঁহার গুরুদেব নিশ্চয়ই তাঁহার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন। কারণ তিনি উপসংহারকালে বলিতেছেন,

> ইক্ষ্বাকূনাং দুরাপেহর্থে
> ত্বদধীনাহি সিদ্ধয়ঃ।

বশিষ্ঠদেব এই কথা শুনিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে দেখিলেন, সুরভির কোপই রাজার অনপত্যতার কারণ। কিন্তু সুরভিকে এখন পাইবার যো নাই, অতএব সুরভির কন্যা বশিষ্ঠ-গৃহপালিতা নন্দিনীকে সন্তুষ্ট

করিতে পারিলে সুরভির কোপ শান্ত হইবে ও রাজার সন্তান উৎপন্ন হইবে। অতএব তিনি রাজাকে নন্দিনীর সেবা করিতে পরামর্শ দিলেন। বশিষ্ঠের কথা শেষ হইতে না হইতেই নন্দিনী সমস্ত দিন চরিয়া, হেলিয়া দুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, যখন নাম করিতে নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার কার্য্য উদ্ধার হইবে। আপনি কল্য হইতে উঁহার সেবায় নিযুক্ত হউন।" এইরূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ একটী কথায় একজন রাজ রাজেশ্বরকে আপনার বাড়ীর রাখাল করিয়া তুলিলেন। এবং রাজাও দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালি করিতে রাজি হইলেন। কালিদাস দেখাইলেন, যে আমা হইতে উচ্চ, তাঁহার কথার বশ হওয়া একান্ত আবশ্যক। নহিলে সংসার চলে না। এইরূপে বশীভূত ভাবে চলিলে সর্ব্বত্রই মঙ্গলের সম্ভাবনা।

পশুপতি-সম্বাদ।

তৃতীয় ভাগ।

১

যে দিবস ইন্দ্রনাথ বাবুর "ভারতোদ্ধার" বাঙ্গালা সাহিত্যের এক মাত্র রত্ন বলিয়া Pataldanga Debating Club. এর সুবিজ্ঞ সভ্যগণ-কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়, তাহার পর দিবস প্রত্যূষে পশুপতি বাবু এক হাতে একটা কার্পেট বেগ আর এক হাতে দুইটা বেদানা লইয়া প্রমদাচরণ নামক সভার একজন সভ্যের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদাচরণ পূর্ব্ব রাত্রের বীরাচারে এবং পত্নীকে প্রহাররূপ শক্তিপূজায় অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব যখন পশুপতি বাবু তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন, তখনও তিনি নিদ্রিত। পশুপতিবাবু অনেক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিলেন, তবুও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল না। তখন প্রমদাচরণের পত্নী শ্রীমতী গুঞ্জনবতী ওরফে শ্রীমতী গঞ্জনাময়ী শতমুখী হস্তে গৃহকার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার পতির 'ধাত্' মনে পড়িল। তিনি অমনি তাঁহার পরমারাধ্য পূজ্যপাদ আর্য্যপুত্রের ধূলিধূসরিত গাত্রে বিলক্ষণ করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রমদাবাবু 'মওতাৎ' প্রাপ্ত

হইয়া উঠিয়া বসিলেন। এবং পশুপতি বাবুর ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পশুপতি বাবু হ্রস্ব, দীর্ঘ, ওষ্ঠ, দন্তৌষ্ঠ, অনুনাসিক প্রভৃতি নানা ছাঁদে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন;—"ভাই প্রমদা, আমার বড় বিপদ। কাল ক্লব থেকে গিয়া শুনিলাম যে বাবার বড় ব্যামহ। বোধ হয় তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। আহা! বাপের তুল্য বহুমানাস্পদ বুদ্ধিমতী বন্ধু মহীতলে আব কে আছে! তা ভাই আমি চলিলাম—এই দেথ তাঁহার জন্য বেদানা কিনিয়া লইয়াছি। যদি তিনি ভাল হন, তাহা হইলে শনিবার আসিয়া আবার ক্লব করিব। যদি শনিবার না আসিতে পারি তবে তুমি আমার হইয়া president হইও; আর হেম, নবীন, তারা, বলাই প্রভৃতি সকলকে আমাব bosom compliment দিও।" প্রমদা বাবু অনেকবার Alas! Alas! এবং I am very sorry, I am very sorry, এইরূপ বলিয়া পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা অবশ্য তোমার যাওয়া চাই, কিন্তু ইস্কুলে ছুটী না লইয়া কেমন করিয়া যাবে?"

পশুপতি। Can't help, বাপের মৃত্যু ভাল না ইস্কুল ভাল?

প্রমদা। ইস্কুলে না বলিয়া গেলে যদি scholarship lose কর?

পশু। Damn your scholarship, যায় ত কি করব, don't care.

প্রমদা। আচ্ছা, ভাই, তবে যাও। But write an envelope as soon as the old fool plucks পটল।

পশুপতিবাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কাঙ্গালিবাবুর বাসায় পূর্ব্ব দিবস বৈকালে যথার্থই সম্বাদ আসিয়াছিল যে, উমাপতি ভট্টাচার্য্য অতিশয় পীড়িত এবং পশুপতিবাবুও তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রমদাচরণের কাছে বাড়ী যাইব বলিয়া পুত্র-কুল-তিলক পশুপতি ভট্টাচার্য্য গোধনপুরে না গিয়া কলিকাতার একটা অতি অধম পল্লীতে একটা ক্ষুদ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিল। এদিকে যত বেলা হইতে লাগিল, কাঙ্গালিবাবুর পল্লীতে লোকে চোক টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল যে, কাল রাত্রি হইতে কাঙ্গালিবাবুর বড় মেয়েটি ঘরে নাই। দুই দিবস পরে গোধনপুর হইতে এক ব্যক্তি কাঙ্গালি বাবুর বাসায় আসিয়া বলিল যে"ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর বড় বিলম্ব নাই, তাই তিনি একবার পশুপতি বাবুকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।"কাঙ্গালি বাবু কি তাঁহার বাড়ীর অপর কেহ কোন কথা কহিলেন না, কেবল কাঙ্গালি বাবুর এক জন অতি পুরাতন, অতি প্রিয়, এবং অতি বিশ্বাসী ভৃত্য মুখটা হাঁড়িপানা করিয়া এবং গলাটাও হাঁড়িপানা করিয়া বলিল—"সে এখন আর এখানে থাকে না।" ভৃত্য যখন এই কথা বলিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহার

বড় বড় চোক দুটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, আর জলে ড্যাব্ ড্যাব্ করিতেছে। গোধনপুরের লোক গোধনপুরে গিয়া বলিল যে "পশুপতি বাবুর দেখা পাইলাম না, তিনি এখন কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকেন না।" শুনিয়া পশুপতির মুমূর্ষু পিতার দুইটি স্থির নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে দুইটি অতি সূক্ষ্ম জলধারা গড়াইয়া পড়িল, তিনি অতি ক্ষীণ, অতি কাতর, কিন্তু অতি আবেগপূর্ণস্বরে বলিলেন—"তবে সে আমার কোথায় গেল—!" বলিয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন। তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সেই তাঁহার শেষ নিশ্বাস। উমাপতি ভট্টাচার্য্যের সব ফুরাইয়া গেল!

পশুপতিবাবু গোধনপুরে যান নাই, সে সম্বাদ তাঁহার Debating Club. এর বন্ধুগণ শীঘ্রই প্রাপ্ত হইলেন; এবং অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিলেন যে, শ্রীভ্রষ্টা কুঞ্জকামিনী দেবীর তিরোভাবের সহিত তাঁহাদের সুযোগ্য এবং সুদক্ষ সভাপতি মহাশয়ের তিরোভাবের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব তাঁহাদের সভার একটি বিশেষ (special) অর্থাৎ গোপনীয় অধিবেশনে স্থির করিলেন যে, লালমোহন বাবু যে প্রণালীতে 'সম্বন্ধ নির্ণয়' করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই প্রণালীতে কুঞ্জকামিনীর এবং পশুপতি বাবুর তিরোভাবের মধ্যে 'সম্বন্ধ নির্ণয়' করিবেন। তাঁহারা সকলেই 'practical men,' অতএব সে সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বড় একটা দেরি হইল না। তখন প্রমদা বাবুর সভাপতিত্বে ক্লবের আর একটা গোপনীয় অধিবেশনে সভ্যগণ এইরূপ স্থির করিলেন যে, পশুপতি বাবু কুঞ্জকামিনী দেবীর উদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু ক্লবের নিয়মানুসারে উদ্ধারকার্য্য একজন সভ্যের নয়, সমস্ত সভ্যের। অতএব তাঁহারা সকলেই কুঞ্জকামিনীর উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, সভ্যেরা প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিলেন—সকলেই কুঞ্জকামিনীকে উদ্ধার করিতে গেলেন। হতভাগিনী কুঁজি কালামুখী বটে। কিন্তু সেও Pataldanga Debating Club এর সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন দেশহিতৈষী সভ্যমহাশয়গণের উদ্ধার প্রণালী দেখিয়া ঘৃণায় আফিঙ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তখন শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু পশুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে বড় সাধের ফিন্‌ফিনে গোঁফ যোড়াটি চাঁচিয়া ফেলিলেন। তার পর গোধনপুরে গিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন—"মা, আমি সব শুনিয়াছি। শুনিয়া বাবার উদ্ধারের জন্য গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া তবে বাড়ীতে আসিতেছি। কিন্তু বাবাকে যে শেষ এক বার দেখিতে পাইলাম না, এদুঃখর দয়াময় দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য দক্ষিণারঞ্জন দুঃখ জন্মেও, ভুলিতে পারিব না।" জননী কাঁদিয়া বলিলেন—"নাই বা দেখা হল বাবা, তুমি

তার যে কাজ করে এসেছ, সে কাজ কলিকালে কার ছেলে করে, বাবা ?', পশুপতি বাবু একেবারে ৺ গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করিয়া বাড়িতে আসিয়াছেন শুনিয়া, গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং প্রাচীনেরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন--'এমন ছেলেকে ও আবার নিন্দা করে। উমাপতি ঠাকুরের সহস্র জন্মের সুকৃতি ছিল তাই এমন ছেলে পাইয়াছিলেন।"

২

অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পশুপতি বাবু গোধনপুরে আড্ডা করিলেন। সে খানে আড্ডা করিবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। বিনা অনুমতিতে এত দিন কামাই করায়, তাঁহাব ছাত্র বৃত্তিটী বন্ধ হইল। অতএব স্বয়ং বাসা ভাড়া করিতে অক্ষম। ওদিকে কাঙ্গালি বাবুর দ্বারে আপনিই কাঁটা দিয়া আসিয়াছেন। শ্বশুর বাড়ীতে থাকিবার নিষেধ নাই, কিন্তু শ্বশুরের উপর তাঁহার বড় রাগ, কেন না শ্বশুর তাঁহার পত্নীর পিতা। যে পত্নী দশজনকে প্রেম ভাগ করিয়া দিতে সম্মত হয় না, তাহার পিতা কখনই প্রেমিক লোক হইতে পারে না। পশুপতি বাবু heredity তত্ত্বটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একদিন কোথায় heredity সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। একখানা বাঙ্গালা খবরের কাগজে সেই প্রবন্ধের একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া পটলডাঙ্গার একটা Dispensary তে দুই চারি জন খুচুরা ডাক্তার বাবু কি তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া Dispensary-র Compounder মহাশয় একদিন পশুপতি বাবুর কাছে heredity তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অতএব পশুপতি বাবু জানিতেন যে পিতা প্রেমিক হইলে heredity অনুসারে কন্যাও প্রেমিকা হইবেন। দুর্ভাগ্য বশত পশুপতি বাবুর পত্নী রত্নমঞ্জরী পশুপতি বাবুর ন্যায় প্রেমিকা নন, তিনি পতি বই আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারেন না। পশুপতি বাবু তাঁহাকে অনেকবার কলিকাতার ক্লবের সভ্যগণের সহিত আলাপ প্রণয় এবং পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। তাই বিশ্বপ্রেমিক পশুপতি বাবুর পত্নীর উপর এবং পত্নীর পিতার উপর এত রাগ। গোধনপুরে আড্ডা করিবার ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কারণ ছিল। সে কারণ—দেশের উদ্ধার, গোধনপুরকে সভ্য এবং উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু এত বড় কাজ একলা করা যায় না, সহযোগীর সাহায্য ভিন্ন হয় না। অতএব পশুপতি বাবু সহযোগী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমনি যুগমাহাত্ম্য যে তাঁহাকে বেশী অন্বেষণ করিতে হইল না। গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বংশীয় যুবকগণ, যাঁহারা কলিকাতায় চাকুরি করেন, তাঁহারা শনিবার অপরাহ্নে বাড়ী আসিলে পর পশুপতি বাবু যেমন তাঁহা-

দের নিকট কথাটা উত্থাপন করিলেন অমনি সকলে বুক ঠুকিয়া এবং মুষ্ট্যাস্ফালন করিয়া মহা আগ্রহের সহিত উচ্চৈস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন—'এ কাজ আমরা অবশ্য করিব, প্রাণপনে করিব, যে কোন উপায়ে পারি করিব।' ইংরাজ রাজার কল্যাণে বঙ্গের প্রতি গৃহে আজ patriot এবং পরহিতান্বেষী বিরাজমান। তাই এখন দেশের উদ্ধার বা সমাজের সংস্কারের কথা পড়িলেই যেন কলের পুতুলের মত লোক দলে দলে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, জামার আস্তিন্ গুটাইয়া, গোঁফ দাড়ি চোমরাইয়া সিংহনাদ করিতে থাকে। তাই আজ মুহূর্ত্ত মধ্যে পশুপতি বাবু এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং আগ্রহপূর্ণ সহযোগী প্রাপ্ত হইলেন। কাল পূর্ণ না হইলে কি কার্য্য সিদ্ধ হয়? আজ ভারতে কাল পূর্ণ হইয়াছে। তবুও তোমরা বল কি না, আজ ভারতের বড়ই দুর্দ্দশা? একথার অর্থ কি কেহই বুঝাইবে না! আহা! কি যন্ত্রণা!

৩

পর দিবস বৈকালে গোধনপুরের যুবকবৃন্দের উদ্যোগে তথায় একটি অপূর্ব্ব সভা হইল। সে সভায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই উপস্থিত, কেবল ভদ্র ঘরের মেয়েরা চিকের আড়ালে। গোধনপুরে এই প্রথম সভা, গ্রামের বাগ্দী গোয়ালা কেহ কখন সভার কথা শুনে নাই। অতএব সকলেই যাহার যেমন ভাল কাপড় ছিল পরিয়া নিরূপিত সময়ের এক প্রহর কাল পূর্ব্ব হইতে সভাস্থলে আসিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। এক অশীতিবর্ষীয়া বুড়ী লাঠী ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'হ্যাঁ গা, সরা গড়চে কোথা গা?' বুড়ীর পরনে একখানি মলিন এবং ছিন্ন বস্ত্র, কিন্তু এত বয়সেও এমনি শ্রী যে দেখিলেই মনে হয় বুঝি বুড়ী খুব বড় ঘরের মেয়ে। বুড়ীকে কেহ চিনিতে পারিল না, কিন্তু সকলেই 'চুপ কর্, চুপ কর্' বলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। বুড়ী বুঝি মনে করিল যে সরা গড়ার সময় কথা কহিলে সরা গড়া হয় না। তাই সে লাঠিটি এক পাশে রাখিয়া একটা দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে কায়স্থ ব্রাহ্মণ সকলেই উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময় ও উপস্থিত। তখন গোধনপুরের যুবকবৃন্দ উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া, বিবিধ প্রণালীতে তেড়ী কাটিয়া, দেশী বিলাতী সুগন্ধে দশদিক মাতাইয়া মস্ মস করিতে করিতে এক একটা নিশান হাতে করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র যেন মহা ত্রাসযুক্ত হইয়া সভাস্থ সমস্ত লোক আপনা হইতেই উঠিয়া দাড়াইল এবং তাঁহারা বসিলে পর সকলে বসিল। একজন যুবক দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহা-

শয়দিগের যদি মত হয় তাহা হইলে সুযোগ্য সুসভ্য পশুপতি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।', আর এক জন যুবক দাঁড়াইয়া বলিল—'সভ্য মহাশয়গণ, আমি এই সুযোগ্য, সুবিজ্ঞ, সুরম্য প্রস্তাব ডব্‌ল্‌ করি।' যুবকগণ ছাড়া এ সকল কথার অর্থ কেহ কিছু বুঝিল না। অতএব সকলেই হাঁ করিয়া রহিল। তখন 'silence is consent,' এই কথা বলিয়া পশুপতি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যুবকবৃন্দ সজোরে করতালী দিল, কিন্তু আর কেহ করতালী দিতে পারিল না। করতালীর শব্দ শুনিয়া সেই বুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে জিজ্ঞাসা করিল—'হ্যাঁ গা, সরা গুলো কি ভেঙ্গে গেল গা?' কেহ কোন উত্তর করিল না, কারণ সকলেই তখন পশুপতি বাবুকে দেখিতেছিল। বুড়ী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তখন পশুপতি বাবু উঠিয়া হাত মুখ নাড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া ও টেবিলে মুষ্টাঘাত করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তিনি এমনি জলদ্ বলিয়াছিলেন যে আমরা তাঁহার সকল কথা লিখিয়া লইতে পারি নাই। অতএব কিছু সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিতেছি। তিনি বলিলেন:—

'মহাশয়গণ, গোপগণ, লাঙ্গুলধারীগণ কুঞ্জকামিনী, আহা! না না, কামিনীগণ, বালক বালকীগণ—তোমরা আজ কি দেখিতেছ? তোমরা আজ যাহা দেখিতেছ, তোমাদের চৌদ্দ পুরুষ তাহা কখন দেখে নাই। দেখ আজ তোমাদের গোধনপুরে সভ্যতার নিশান উড়িতেছে—দেখ এই নিশানে কি লেখা আছে। ইহাতে লেখা রহিয়াছে—গোধনপুরের উদ্ধার কর, গোধনপুরের আপামর সাধারণের মনের অন্ধকার নিবাইয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া দেও, গোধনপুরের স্ত্রীদিগকে উদ্ধার কর। দেখ, রামচন্দ্র স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পতিব্রতা বলিয়া এত যশ। আবার সে বৎসর কলিকাতার লর্ড বিশপ সাহেব নবগোপাল বাবুর মেলাতে বঙ্গের অবলা সবলা কাণবালা কুলবালাকে দেখিতে না পাইয়া কত কাঁদিলেন এবং কলিকাতার মহিমাময় মত্তমাতঙ্গ মধুপায়ী মহাশয়গণকে কত তিরস্কার করিলেন। অতএব, হে প্রিয় গোধনপুরবাসী গোপ কৃষক মহাশয়গণ, তোমরা তোমাদের বধূ, কন্যা প্রভৃতি রমণীয়গণকে উদ্ধার কর। দেখ, আমরা এই গোধনপুরে কাল একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিব। সেখানে যত বালিকা দিবাভাগে লেখা পড়া শিখিবে। কিন্তু যে সকল বৈকুব্য বিমোহিনী বিবাহিতা বা বিধবা স্ত্রী আছেন তাঁহারা দিবাভাগে সংসারের কার্য্য করেন। সে কার্য্য তাঁহাদের অবশ্য পোষ্য প্রতিপাল্য শ্রী পতিতপাবন পাঁটা, অতএব তাঁহাদের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটি ইস্কুল বসিবে। সে ইস্কুলে কলিকাতা হইতে বিবি শিক্ষিকা

আসিয়া পড়াইবে। হে গুণবতী গো-মেধকারী গোপমহাশয়গণ, সে বিবিরা তোমাদের মন্মোহিনী মহিলা মেয়েদের এমনি পনির তৈয়ার করিতে শেখাইবে যে তোমরা পনির বিক্রয় করিয়া প্রত্যেকে অনায়াসে এক মাসে এক হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবে। এবং হে গোধনপুরবাসী লাঙ্গুলধারীগণ! তোমাদিগকে ও বলিতেছি যে আমরা যে বিবি শিক্ষিকা আনিব তাহারা তোমাদের মন্থরা মনোহরা মহিষমর্দ্দিনী মেঠো মেয়েদের এমনি কৌশলে ধান সিদ্ধ করিতে শেখাইবে যে এক হাঁড়ি ধান সাত হাঁড়ি হইয়া পড়িবে। তখন তোমাদের এক টাকায় সাত শত টাকা লাভ হইবে। আর কি চাও? বলি, ওহে গুপগাপ্ গোপ সকল এবং cheese-chop, চাষা সকল, আর কি চাও? অতএব দেরি করিও না। কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাইয়া দিও। তোমাদিগকে ইস্কুলের মাশিয়ানা দিতে হইবে না। ইস্কুলের সমস্ত খরচ আমরা দিব। কেমন হে গয়ারাম কি বল?"

গয়ারাম গোধনপুরের গোপ সমাজের কর্ত্তা—গয়ারামের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। সে উঠিয়া চাদরখানি গলায় জড়াইয়া যোড়হাত করিয়া বলিল—'তা, মশায়, ও সব ত আমরা কিছু কইতে পারি না। ভট্‌চায্যি মশায় যা নিবেদন করিবেন তাই আমরা করিব।' পাঠক জানেন যে গোধনপুরে অনেকগুলি ভট্টাচার্য্যের বাস। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলে সেখানে কেবল ন্যায়-বাগীশ মহাশয় বুঝায়, কেন না ন্যায়-বাগীশ মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত এবং তাঁহার একখানি টোল ও আছে। গোপবৃদ্ধ গয়ারাম ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের দোহাই দিলে পর পশুপতিবাবু ন্যায় বাগীশ মহাশয়কে কিছু ভেকাচেকা রকম দেখিয়া বলিলেন—'বলি, ও ন্যায় বাগীশ মহাশয়, ভাবিতেছেন কি? বাবা যে আপনার জমি বেদখল করিয়া লইয়াছিলেন, তাই ভাবিতেছেন না কি? তা সে জন্য ভাবনা কি? সে জমি আমি আপনাকে ফিরাইয়া দিব। এখন গয়ারাম যা বলিতেছে তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিন।' তখন পণ্ডিতপ্রধান ন্যায়বাগীশ মহাশয় বড় রকম এক টিপ নস্য লইয়া গা ঝাড়া দিয়া বলিলেন—'হ্যা হ্যা, তা মীমাংসা করিব বৈ কি। কি জান, পশুপতি বাবু, আপনারা আমাদের অপেক্ষা বয়সে ছোট বটে। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনারা আমাদের অপেক্ষা ঢের বড়। ভগবান আপনাদিগকে দীর্ঘজীবি করুন! আহা! কেমন বংশে জন্ম! যেমন রূপ তেমনি গুণ! বলি ওহে গোপগণ, বাবুরা যেমন বলিতেছেন তেমনি করিও, তোমাদের ভাল হবে।' এই কথা শুনিয়া গয়ারাম আবার গলায় কাপড় দিয়া উঠিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল—

'যে আজ্ঞে, মশায় ।' আহ্লাদে যুবকবৃন্দ চেঁচাইল 'Victory, পশুপতি বাবু, Victory'!'পশুপতি বাবু আবার উঠিয়া বলিলেন :—We are practical men, আমরা কাজের লোক। অতএব আর বেশী কথা কহিব না। কাল হইতে এই সৌভাগ্যময় গোধনপুরে একটি Girls' School অর্থাৎ বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি Feminine Night School অর্থাৎ মেয়েলী তামসিক বিদ্যালয় খোলা হইবে। এবং গোধনপুরের সমস্ত সমাজ উল্টাইয়া সুসভ্য, সমুন্নত ও সুজ্ঞানিত করিবার জন্য ইংরাজ গুরুর উপদেশ মতে কতকগুলি Society প্রভৃতি সংস্থাপিত হইবে। ভরসা করি আমাদের আশানুরূপ ফল ফলিবে। ভরসা করি আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের জন্মভূমি 'জননী জন্মভূমিশ্চ সংগোপাদি গরুবাসী' গোধনপুর দুই দিনের মধ্যে London অপেক্ষাও সভ্যতার সমুচ্চ,সম্পূর্ণ, সঙ্কটাপন্ন চূড়ায় আরোহণ করিবে।"

পশুপতি বাবু বসিলেন। যুবকবৃন্দ বারম্বার করতালী দিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা করতালী দিলেন না—কেবল বলিতে লাগিলেন—বেঁচে থাক বাপ্ সকল—গোধনপুরের এমন দিন হবে তা কে জানিত?' গোপ এবং কৃষকগণ দুই একবার করতালী দিবার চেষ্টা করিল, ভাল হইল না। তখন তাহারা লাঙ্গলবাহী বা ভারবহনাক্ষম গরুকে চালাইবার জন্য গরুর লেজ মলিয়া আপন আপন জিব পাকাইয়া যেরূপ টক্ টক্ শব্দ করে, সেইরূপ টক্ টক্ শব্দ করিতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া যুবকবৃন্দ যেন আরো উত্তেজিত হইয়া মহা বেগে সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিল। আর সে শব্দ শুনিয়া সেই বুড়ীর আবার ঘুম ভাঙ্গিল। সে বলিল 'হ্যাঁ রে,বাপ্ সকল এ ত সব গরু,গরুতে আবার সরা গড়িবে কেমন করে,বাপ্?' এই কথা বলিয়া বুড়ী লাঠী হাতে করিয়া উঠিল। বুড়ীকে দেখিয়া অবধি তাহার উপর আমাদের কিছু মায়া হইয়াছিল। অতএব, পাছে কোথা ও পড়িয়া যায়, কি কিছু হয়, দেখিবার জন্য আমরা বুড়ীর পিছে পিছে গেলাম। দেখিলাম বুড়ী গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া গম্ভীর ও দৃঢ় পাদ বিক্ষেপে মাঠের উপর দিয়া চলিল। দেখিতে সেই বুড়', কিন্তু বুড়ীর এখন যেন অসীম বল। তখন প্রায় সন্ধ্যা—চারিদিক্ ঘোর হইয়া আসিতেছে। মাঠের পশ্চিম প্রান্তে একটা বৃহৎ পুষ্করিণীর পাহাড়ে বড় বড় তাল গাছ যেন জটাজূটধারী শীর্ণকায় ঋষি তপস্বীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাছ গুলার তমসামিশ্রিত শিরোপরি অস্তমিত সূর্য্যের মলিন সিন্দুররাগ মিলাইয়া যাইতেছে। বুড়ী সেই বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় গেল দেখিতে পাইলাম না। অবাক হইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম যেন জটাজূটধারী জীর্ণকায় তাল বৃক্ষের

উপরে সেই মলিন সন্ধ্যার মলিন সিন্দুর বর্ণে পাতার গায় পাতা পড়িয়া কেমন করিয়া তিনটি অতি মলিন অক্ষর ফুটিয়াছে :—জ-ন-নী।

৪

সন্ধ্যার পর পশুপতি বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে গোধনপুরের যুবকবৃন্দ প্রস্তাবিত বিদ্যালয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে আগামী কল্যই কলিকাতা হইতে দুই জন শিক্ষয়িত্রী আনা হইবে। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কলিকাতায় চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে, কিন্তু Feminine Night School-এর কথা এখন প্রকাশ করা হইবে না, কেননা কলিকাতার লোক এত উন্নত হয় নাই যে Female Night School এর মর্ম্ম বা আবশ্যকতা বুঝিতে পারে। অতএব তাহাতে যে ব্যয় হয় তাঁহারা নিজেই তাহা দিবেন। তাঁহারা পনর জন, প্রত্যেকে প্রতি মাসে আট টাকা করিয়া দিলে প্রায় একশত টাকা উঠিবে। তাহাতেই আপাতত চলিবে। আরো স্থির হইল যে সমস্ত গোধনপুরের উন্নতি সাধনার্থ তথায় একটী Public Library এবং একটী Social Improvement Society স্থাপন করা যাইবে।

পর দিবস রজনী বাবু কলিকাতা হইতে মিস্ আলিজেবেথ জালিয়ানী এবং মিস্ কাথারাইন মুচিয়াণী নাম্নী দুইজন শিক্ষয়িত্রী গোধনপুরে লইয়া গেলেন। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। মিস্ দুইটি কতদূর শিক্ষিতা, রজনী বাবু তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তাহারা দুই জনেই অল্প বয়স্কা, অতএব দুই জনেই কর্ম্মক্ষম হইবে, এই ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। পশুপতি বাবু প্রভৃতি তাঁহাকে বারম্বার ধন্যবাদ দিলেন। Feminine Night School চলিতে লাগিল। ইস্কুলের উন্নতি দেখিয়া দুই এক মাসের মধ্যে যুবকবৃন্দের উৎসাহ এত বাড়িয়া উঠিল যে তাহাদের আর গোধনপুর ছাড়িয়া তুচ্ছ টাকার জন্য কলিকাতায় চাকুরি করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সকলে চাকুরি ছাড়িয়া গোধনপুরে বসিয়া Feminine Night School-এর উন্নতি সাধনে ব্যতিব্যস্ত হইল। টাকা না হইলে patriot দিগের সংসার চলিতে পারে, কিন্তু femalo school চলিতে পারে না। অতএব গোধনপুরের patriot মহাশয়রা ক্রমে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের খোরাক কমাইতে লাগিলেন, এবং তাহাদের গার গহনা বেচিয়া female school-এর খরচ যোগাইতে লাগিলেন। কিন্তু গহনা কাহারো বেশী ছিল না, অতএব তিন চারি মাসের মধ্যেই গোধনপুরের ভদ্র মহিলাদিগের যেমন পেট খালি হইয়াছিল তেমনি গাও খালি হইয়া গেল। তখন তাহাদের সুখের অবস্থা দেখিয়া রোগ আসিয়া তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পশুপতি বাবুর বাড়ীর সকলেও পীড়িত। একদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিলেন—'বাবা,

তুমি আমার পণ্ডিত ছেলে, তোমাকে আমি আবার জ্ঞানের কথা কহিব কি, কিন্তু বাবা এমন করে হৈহৈ করে বেড়ালে দিন যাবে কেমন করে বাবা?” পুত্র উত্তর করিলেন:—‘সে কি মা? হৈ হৈ করে বেড়ান কি? আমরা যা করিতেছি তাহাই ত মানুষের কাজ। আপনি পেটে খাওয়া ত শোর গরুর কাজ। পরের ভাল করা, দেশের ভাল করা, এই ত মানুষের কাজ। মা, আমরা patriot, আমরা খাওয়া দাওয়া বুঝি না। সব ত্যাগ করিয়া আমরা দেশের উদ্ধার করিব। তোমরা কম খাইতেছ বলিয়া দুঃখ করিও না। কম খাইয়া দেশের কাজ করিলে, কত পুণ্য হবে তা জান? অত খাই খাই করিও না’। পশুপতি বাবুর মা হিন্দুর মেয়ে। পুত্রের কথা শুনিয়া যেন লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া গেলেন। কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন:— ‘অদৃষ্টে যাই থাক্ এ জন্মে আর খাওয়ার কথা মুখে আনিব না। হায়! আমি কি আপনিই খেতে চাই!’ পশুপতি বাবু মস্ মস্ করিয়া নিজের শয়ন গৃহে গেলেন। সেখানে তাঁহার রুগ্না পত্নী রত্নমঞ্জরী ছয় মাসের রুগ্না কন্যাটিকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন। কন্যাটির অনাহারে উদরাময় হইয়াছে। আজ চারি পাঁচ দিন তাহার উপর জ্বর হইতেছে। মেয়েটী যায় যায়। পশুপতি বাবু পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:— ‘তুই বুঝি মাকে খাওয়ার কথা বলেছিস্?’ রত্নমঞ্জরী কাঁদিতেছিল। চোকের জল মুছিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিল— ‘কেন, খাওয়ার কথা বলিব কেন, আমরা কি খাইতে পাই না?’

পশুপতি। তবে মা আমাকে এত কথা বলিলেন কেন?

রত্ন। তা ত আমি ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় উনি তোমাকে মনের মতন খাওয়াইতে পান না বলিয়া বলিয়াছেন।

পশু। আমি মন্দ খাইতেছি কি?

রত্ন। মার ছেলেকে খাওয়াইয়া কি সাধ মিটে? এই কথা বলিতে রত্নমঞ্জরীর চক্ষের এক ফোঁটা জল মেয়েটির ঠোঁটের উপর পড়িল। মেয়েটি হাঁ করিল। রত্নমঞ্জরী এক ঝিনুক জল তাহার মুখে দিল। সে আধ ঝিনুক খাইয়া আর খাইতে পারিল না, হাঁপাইয়া উঠিল। পশুপতি বাবু বলিলেন:—‘আচ্ছা যদি খাওয়া দাওয়া সব হচ্চে ভাল তবে কেন খুকীর হারছড়াটা আমাকে দে না?

রত্নমঞ্জরী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল:— ‘একটু বাদে নিও না!’

প। একটু বাদে কেন? এখনি দে না?

রত্নমঞ্জরী দুইটি অশ্রুপূর্ণ যাচঞাময় চক্ষু পতির মুখের দিকে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার নামাইয়া অতি ক্ষীণ এবং অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—‘ও ত একটু বাদেই চলে যাবে!’

'না, না, তা হবে না, আমার এখনি চাই, Kate-কে আজ মাহিয়ানা দিতে হবে—' এই বলিয়া পশুপতি বাবু জোরে মেয়েটির গলার হার-ধরিয়া টানিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী অতি আবেগপূর্ণ অথচ অতি কাতরস্বরে বলিল—'তোমার পায় পড়ি, দাঁড়াও, আমিই খুলিয়া দিতেছি,' এই বলিয়া নিজেই হার খুলিতে উদ্যত হইল। সে কথা না শুনিয়া পশুপতি বাবু সজোরে হার ছিড়িয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। রত্নমঞ্জরী চোকের জল মুছিয়া মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। সেই রাত্রে মেয়েটির জ্বর বৃদ্ধি হইল। তাহার গলা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল। সে আর একটি ফোঁটা জলও গিলিতে পারিল না। পর দিন বেলা আড়াই প্রহরের সময় রত্নমঞ্জরীর রত্নটুকু মাটী হইয়া মাটীতে মিশিয়া গেল?

চতুর্থ ভাগ।

১

পশুপতি বাবু প্রভৃতি গোধনপুরে একটা Public Library স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক নহিলে পুস্তকালয় হয় না। গ্রন্থ লিখিতে না জানিলে গ্রন্থকার হওয়া যায় আইন না জানিয়া উকিল হওয়া যায়, এবং হাকিম হওয়া যায়, চিকিৎসা বিদ্যা না জানিয়া চিকিৎসক হওয়া যায়, রাজ্য না থাকিলে রাজা হওয়া যায়, জমি না থাকিলে জমিদার হওয়া যায়, ঔষধ ব্যতীত ঔষধালয় হয়, দান না করিয়া দাতাকর্ণ হওয়া যায়, ধর্ম্ম না থাকিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, বিবাহ না হইলেও বহুপরিবার হয়, বিদ্যা না থাকিলে বিদ্বান হওয়া যায়, কিন্তু পুস্তক না থাকিলে পুস্তকালয় হয় না। অতএব গোধনপুরের যুবক বৃন্দ পুস্তক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা গহনা বেচিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু Public Library ত স্ত্রীলোক দিগের নিমিত্ত নয় অতএব Public Library-র জন্য গহনা বা লাখ্‌রাজ বা ব্রহ্মোত্তর বিক্রয় করা অতি অকর্ত্তব্য। অতএব আধুনিক Patriot দিগের মধ্যে যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে সেই প্রথানুসারে গোধনপুরের Patriot মহাশয়রা বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগকে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের এক এক খণ্ড পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লিখিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের পুস্তক দিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

কেহ বা নিজব্যয়ে ডাক মাশুল দিয়া গ্রন্থ পাঠাইয়া দিলেন। আমরা জানি, কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার 'প্রভাতচিন্তার' 'ভ্রান্তিবিনোদের' এবং 'নিভৃতচিন্তার' এক এক খণ্ড, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্বের' এক খণ্ড, এবং হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার 'বাল্মীকির জয়ের' এক খণ্ড ডাক মাশুল দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা এই রকমে ডাক মাশুল দিয়া বই বিলাইয়া লোকের কাছে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের বই খুব কাটিতেছে; কিন্তু আমরা জানি যে তাঁহাদের বই যোগেশ বাবুর দোকানেই থাকুক আর গোধনপুরের Public Library-তেই থাকুক, পোকায় ভিন্ন আর কিছুতেই তাহাদিগকে কাটে না। বঙ্কিম বাবু সকল বিষয়েই কিছু সৃষ্টিছাড়া—তিনি যে শুধু তাঁহার গ্রন্থ দিতে অস্বীকার করিলেন তা নয়, গোধনপুরের যুবকবৃন্দকে একটু তিরস্কার করিয়াও লিখিলেন। তাঁহার চিঠি পাইয়া পশুপতি বাবু গোধনপুরের Social Improvement Society-র সভ্যগণকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগকে সেই চিঠি শুনাইলেন। চিঠি এই রূপ:—

"আপনারা আপনাদের গ্রামের উন্নতির নিমিত্ত একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু আমি দুঃখিত হইলাম যে আমি আপনাদিগের বিশেষ সাহায্য করিতে অক্ষম। যাঁহারা সাধারণ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত আমার পুস্তক চাহিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলকে পুস্তক দিতে হইলে, আমার বিস্তর ক্ষতি হয়। আর এক কথা। যদি যথার্থই আপনাদের উন্নতি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কেন পুস্তক ক্রয় করিয়া পুস্তকালয় স্থাপন করেন না? তাহা করিলে আপনাদের পুস্তক পাঠে বেশী যত্ন ও হইতে পারে। ইতি।"

চিঠি শুনিয়া সমস্ত সভ্য একেবারে রাগিয়া আগুণ। সকলেই বলিলেন যে এ চিঠির একটা ভাল রকম উত্তর দেওয়া আবশ্যক। পশুপতি বাবু তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর প্রস্তুত করিয়া পাঠ করিলেন। উত্তর এই:—

"আপনার ভ্রমময় পত্র পাঠ করিলাম। আপনার এত যশ কেমন করিয়া হইল আমরা বুঝিতে পারি না। আপনি অতি অপ্রসভ্য। আপনার নিকট আমরা বই চাহিয়াছিলাম। সে কি আমাদের উপকৃতকারের জন্য? না আপনার উপকৃতকারের জন্য? আপনি যদি যথার্থ বুদ্ধিমতী হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে আমরা কেবল আপনার হিতকারিতা ভাবিয়া আপনার বই চাহিয়াছিলাম। আমরা এই সুসভ্য, সমুন্নত, গোধনপুর গ্রামে যে Public Library করিয়াছি, সে কাহার জন্য? আপনার যে রকম বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে আপনি কখনই বুঝিবেন না যে সে কেবল বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগকে প্রোৎসাহ

করিবার জন্য। বাঙ্গালা বই কেমে কে? পড়ে কে? আমরা দেশের উদ্ধারে গাঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছি বলিয়া Public Library করিয়া দেশের লোককে বঙ্গীয় গ্রন্থকার-দিগের অসার, অপদার্থ, অকৃত্রিম, অস্-নাসিক গ্রন্থ সকল পড়াইতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চেষ্টা কৃতসফল হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের কত লাভ হইবে,বুঝিতে পারেন? তাঁহা-দের বই কত বিক্রয় হইবে, বুঝিতে পারেন? বাঙ্গালা সাহিত্যের কত সমা-দর, সম্মান, সুসঙ্গতি বৃদ্ধি হইবে, বুঝিতে পারেন? না, আপনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? আপনার সে বুদ্ধিমত্তা নাই। আপনি ভবিষ্যৎ দেখিতে জানেন না এবং পারেন না। আমরা practical men, আমরা কেবল ভবিষ্যৎ দেখি। সার কথা এই—আমরা patriot, দেশের লোকের উপকারার্থ এবং আপনাদিগের ন্যায় ন্যায্য, অন্যায্য, নয়নচকোর গ্রন্থ-কারদিগের উপকৃতকারার্থ Public Library স্থাপন করিয়াছি। আপনারা গ্রন্থ না দিলে আমাদের মহৎ কার্য্য কেমন করিয়া সম্পন্ন হয়, বলুন দেখি? কিন্তু, হায়! আপনার সে বিচক্ষণপরতা নাই, আপনি প্রকৃত, প্রসিদ্ধ, প্রণয়কুশলী দানের পাত্র চেনেন না। আমরা আপ-নার তোয়াক্কা রাখি না।

আপনি লিখিয়াছেন যে পুস্তক ক্রয় করিলে পুস্তক পাঠে আমাদের বেশী যত্ন হইতে পারে। ক্রয় করিয়া পড়িব, এমন পুস্তক কি বাঙ্গালা ভাষায় আছে? আপনি কি মনে করেন যে আপনার পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার যোগ্য? হা ভ্রম! হা কুসংস্কার! হা দাম্ভিকতা! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আপনার পুস্তক কিছুমাত্র গুণসম্পন্ন নয়। শিক্ষিত লোকে আপনার পুস্তক পাঠ করে না। যাহারা রমণীকুল বিরোধী, প্রাচীন কু-সংস্কার সম্পন্ন, কেবল তাহারাই আপনার পুস্তক পড়ে। আপনি অত মুখনাড়া দিবেন না। আপনার দিন ফুরাইয়াছে। আমি শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ভারত-মাতাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তিন মাসের মধ্যে আপনার সমস্ত গ্রন্থ উড়াইয়া দিব। নিজে গ্রন্থ লিখিয়া দেশের সমস্ত Library পুরাইয়া ফেলিব। আপনি সাবধান হউন। ইতি।"

পত্রখানি বঙ্কিম বাবুর নিকট ডাকে পাঠান হইল। শুনিয়াছি যে পত্র পড়িয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহার পুস্তক বিক্রে-তাদিগকে অর্দ্ধেক দরে তাঁহার পুস্তক ছাড়িয়া দিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তকবিক্রেতারা আপত্তি করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা জান না,তিন মাস পরে আমার বই আর বিক্রয় হইবে না।"

২

বঙ্কিম বাবুকে চিঠি লিখিয়াই পশু-পতি বাবু পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত দিনে এক খানি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন। উপন্যাসের নাম—

'আশ্চর্য্য কাশীবাসী।' এক মাসের মধ্যে পুস্তক ছাপা হইল। কিন্তু পুস্তক ছাপাইয়া পশুপতি বাবু গোলে পড়িলেন। পুস্তক কেহ কেনে না এবং পুস্তক বিক্রেতারা অল্প কমিসনে পুস্তক লইতে চায় না। কাজেই পশুপতি বাবু তাঁহার ন্যায় গুণবান গ্রন্থকারদিগের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সমালোচকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই এক থামা মফঃস্বলের বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদককে বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহাদের পত্রে বেশ ভাল রকম সমালোচনা লেখাইয়া লইলেন। একটি সমালোচনা এইরূপ :—"বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে পশুপতি নামে একজন নূতন গ্রন্থকর্ত্তা বিচরণ করিতে আসিয়াছেন। পশুপতি বাবু নবীন লেখক হইলে কি হয়, তিনি বঙ্গের প্রবীন লেখকদিগকে আজ লজ্জা দিলেন! তাঁহার রচিত উপন্যাসটি এমনি সুকৌশলে গ্রথিত যে, তাহা একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে আদ্যোপান্ত শেষ না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার পুস্তক খানিতে বিলক্ষণ শব্দলালিত্য আছে। তিনি সকল প্রকার রসের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি মানব প্রকৃতি বেশ বুঝেন। তাঁহার পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকে এক এক বার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকর্ত্তা যথার্থই উৎসাহের যোগ্য।" আর একটি সমালোচনাও প্রায় এই রকম, কেবল একটী বেশী কথা ছিল। সে কথা এই—"আমাদের মতে পুস্তকখানি সমস্ত বিদ্যালয়ে, বিশেষত বালিকা বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হওয়া উচিত।" এত লেখা হইল বটে, কিন্তু ভাল কাগজে কেহ ভাল বলিল না। সাধারণীতে একটু ভাল করিয়া লেখাইবার জন্য পশুপতি বাবু একদিন অক্ষয় বাবুর কাছে গিয়া তাঁহার বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু অতি অভদ্র এবং অশিষ্ট। তিনি সাধারণীতে 'আশ্চর্য্য কাশীবাসীকে' অবক্তব্য কলঙ্করাশি বলিয়া নিন্দা করিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' একটু ভাল বলিলে কিছু কাজ হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া পশুপতি বাবু একদিন চন্দ্র বাবুর নিকট গিয়া তাঁহার এক রকম হাতে পায় ধরিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় চন্দ্র বাবু কিছু কুটিলস্বভাব। তিনি তখন প্রশংসা করিয়া লিখিব, এইরূপ আশ্বাস দিয়া পরে বিলক্ষণ নিন্দা করিয়াছিলেন। সমালোচনা দ্বারা কোন কাজ হইল না দেখিয়া পশুপতি বাবু আর একটি অতি সদুপায় অবলম্বন করিলেন। বইখানি খুব আদরণীয় হইয়াছে, অতএব খুব কাটিতেছে, লোকে এইরূপ বুঝিলে ক্রয় করিবে ভাবিয়া, পশুপতি বাবু সমস্ত পুস্তকের title-page ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফেলিয়া সমস্ত পুস্তকে এক এক খানি নূতন title-page আঁটিয়া দিলেন। নূতন title-pageএর মধ্যে কতক গুলিতে প্রথম সংস্করণের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়, কতক গুলিতে

তৃতীয়, কতক গুলিতে চতুর্থ সংস্করণ লেখা হইল। এক মাসের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চারি সংস্করণ বিজ্ঞাপিত হইল। তথাপি গবর্ণমেণ্ট চারি সংস্করণের যে তিন-চেরে বার খানি লইয়াছিলেন, তাহার বেশী বিক্রয় হইল না। এদিকে ছাপাখানার বিল লইয়া পীড়াপীড়ি হইতে লাগিল। ১৫৫৮/১০ টাকার বিল। যাহার বিল সে উকিলের চিঠি দিল। পশুপতি বাবু তাঁহার শেষ সম্বল ৪ বিঘা ব্রহ্মত্তরের মধ্যে সাড়ে তিন বিঘা বিক্রয় করিয়া ছাপাখানার দেনা পরিশোধ করিলেন।

৩

পশুপতি বাবু ছাপাখানার দেনা পরিশোধ করিলেন বটে, কিন্তু পেটের অন্ন আর বড় যুটে না। দেশের উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শুধু যে তাঁহারই এই দশা তা নয়, গোধনপুরের সমস্ত বাবুদিগের এবং তাঁহাদের পরিবার বর্গের আজ এই দশা। কেহই আর পেট ভরিয়া খাইতে পাননা, কেবল সন্ধ্যার পর তামসিক বিদ্যালয়ে কি জানি কোথা হইতে দুধ আসে, বাবুরা তাহাই একটুকু আধটুকু খাইয়া থাকেন। কিন্তু এত কষ্ট সহিয়াও কেহ উদ্ধার কার্য্য ছাড়িতে চাননা। ও দিকে গোপ-কৃষক মহলে বড়ই কান্নাহাটি পড়িয়া গেল। তাহাদের মেয়েরা খুব বাবু হইয়া পড়িয়াছে, কেবল বেশবিন্যাসে মন, কেহ আর গৃহকর্ম্ম করে না। তাও সওয়া যায়। কিন্তু একঘরে হওয়া ত কম অপমান নয়। অন্যান্য গ্রামে গোপকৃষকদের যে সব জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে তাহারা আর তাহাদের বাড়ীতে খাইতে চায় না, নিমন্ত্রণ করিলেও আসে না। তাহারা তখন ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"মশায় তখন মেয়ে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাইতে অনুকূল করিলেন, এখন যে আমাদের জাতি যায়।" ন্যায়বাগীশ মহাশয় উত্তর করিলেন—"না হে না, ও সব যুগধর্ম্মে হইতেছে, উহাতে দোষ কি?" কিন্তু গোপ কৃষকেরা আর ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিল না। তাহারা তাহাদের মেয়েছেলেদিগকে ইস্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইল। তখন উদ্ধার এবং পরোপকার করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া পশুপতি বাবু বই লিখিয়া সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি আর এক খানি বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এবার আর উপন্যাস লিখিলেন না, একখানা গীতি-কাব্য লিখিলেন। প্রথম কবিতা হইতে দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলামঃ—

"গাও মাতা বঙ্গাননী!
গাও তাঁর জয়,
যাঁর তরে
কবি বলে
'জয়, জয়, জয়'।
উদ্ধারিবে কবি

তাঁর
জাতি কুল মান।
আর
কবি উদ্ধারিবে
অবলার প্রাণ!
ফেলে দাও
উপন্যাস,
ফেলে দেও গান,
বাজাও দামামা
তবে
ঝন্
ঝন্
ঝন্।
তাড়াও খেতেরে
তবে
ছুঁড়ি
ফাঁকা গন্,
তাড়ায়ে
মায়েরে
কর
খান্!
খান্!!
খান্!!!"

কবিতা গুলি লিখিয়া পশুপতি বাবু মনে করিলেন যে এবার আব বঙ্কিম বাবু, হেম বাবু প্রভৃতি মহারথীগণের নিস্তার নাই। আহ্লাদে ডগমগ হইয়া বাবু কাব্য খানি ছাপাইবেন বলিয়া কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী অতি কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি চলিলে, ঠাকুরুণের জন্য কি করিব? সেই দিন থেকে (এই কথা বলিতে দুঃখিনীর চক্ষে জল আসিল) সেই দিন থেকে তাঁহার ব্যারাম বাড়িয়াছে। ডাক্তার ও দেখান হয় নাই, আর এমন পয়সা কড়ি নাই যে রোগীর খাবারের মতন কিছু কিনে দেওয়া যায়। তা, এখন কি করিব যদি বলে যাও ত ভাল হয়"।

পশুপতি বাবু উত্তর করিলেন—"কেন, সে জন্য ভাবনা কি? আমি এই নূতন বই ছাপাইতে যাইতেছি। এবার ঢের টাকা পাব।"

রত্ন। আমরা মেয়ে মানুষ ও সব ত বুঝ্‌তে পারি না, আমাদের ওতে কথা কওয়াই নয়। তবে তোমাকে বলে জিজ্ঞাসা করি, সেবার বই ছাপাইয়া ত কিছু হয় নাই, এবার কেমন করে হবে?

পশু। তুই কি তত কথা বুঝিবি—এবার ত বই বেচিব না, এবার কপিরাইট বেচিব। এবার নিশ্চয় ঢের টাকা পাব।

রত্ন। আচ্ছা, আমি বুঝ্‌তে চাই না, তুমি পেলেই হ'ল। এখন তবে ঠাকুরুণের জন্য কি করিব?

পশু। কেন, একবার সাবিত্রী গোয়ালিনীর কাছে যাস্, সে দুটা টাকা দেবে। সে আমার ধারে। তাইতে চালাস্। দেখিস্ যেন মার কোন কষ্ট হয় না।

রত্নমঞ্জরী ঘাড় হেঁট করিয়া একটী চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল—'আচ্ছা!'

পশুপতি বাবু মস্ মস্ করিয়া চলিয়া

গেলেন। এমনি বাস্ত যে একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। এ জগতে তাঁহার মা ও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। পশুপতি বাবু যখন কলিকাতায় থাকিয়া সমস্ত ভারতবাসীকে ভারতমাতার উদ্ধারার্থ জাগাইবার জন্য অগ্নিময় কবিতা ছাপাইতেছিলেন, তখন তাঁহার তুচ্ছ গর্ভধারিণী মাতা রোগে, শোকে, অনাহারে তাঁহারই জন্য হাহাকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মরিবার সময় রত্নমঞ্জরীকে বলিয়া গেলেন—"মা, তুমি একলাটি এখানে কেমন করিয়া থাকিবে, আর খাবেই বা কি? তা, যে কয়দিন বাবা আমার ঘরে না আসেন, সে কয় দিন তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়া থাকিও।" কিন্তু রত্নমঞ্জরী তাহা করিতে পারিল না। সে রোগ, শোক, অনাহার সব তুচ্ছ করিয়া পতির প্রতীক্ষায় পতির ঘরে পড়িয়া রহিল।

৪

পশুপতি বাবুর কাব্য ছাপা হইল। একেবারে ১০০০, কপি ছাপা হইল। তিনি অগ্রে এক কাপি হেম বাবুকে পাঠাইয়াদিলেন। হেম বাবু পড়িয়া মাথা হেঁট করিলেন। সে মাথা আর তুলিতে পারিলেন না। পশুপতি বাবু বঙ্কিম বাবুকে তাঁহার বই দেন নাই, কিন্তু বঙ্গদর্শনে সমালোচনার্থ সঞ্জীব বাবুকে এক কাপি দিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু সেই বই খানি লইয়া পড়িলেন। পড়িয়া তাঁহার ঈর্ষা এত প্রবল হইল যে, চক্ষুশূল একেবারে চক্ষুর বাহির করিবার জন্য তিনি বই খানা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া সঞ্জীব বাবু বলিলেন:—"তবে আর আমার বলিবার কি রহিল?" তা সে সব কথা যাউক। পশুপতি বাবু এবার আর বই বিক্রয় না করিয়া Copyright বিক্রয় করিয়া এক হাত মারিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন সম্ভ্রান্ত পুস্তক-বিক্রেতা Copyright ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। শেষে একজন ক্ষুদ্র দোকানদার সম্মত হইল। সে দেখিল যে বইগুলি ওজনে ২ মণ ১৫॥সের। প্রতি সের এক আনার হিসাবে ক্রয় করিয়া দুই আনার হিসাবে বিক্রয় করিলে তাহার পাঁচ ছয় টাকা লাভ থাকিতে পারে। অতএব সে ৫৸৵১০ মূল্যে Copy- right ক্রয় করিতে স্বীকার করিল। পশুপতি বাবু তাহাকে বলিয়া কহিয়া ৬৲ টাকা দাম ধার্য্য করিয়া Copyright বিক্রয় করিলেন। ক্রেতা প্রতি সের দুই আনার হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তখন বইগুলি মসলার দোকানে, জুতার দোকানে, এবং কাপড়ের দোকানে গিয়া পৌছিল। সেই সব দোকান হইতে সেই অপূর্ব্ব অগ্নিময় উত্তেজক কবিতাগুলি হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। পশুপতি বাবুর কীর্ত্তি, পশুপতি বাবুর অদৃষ্টচক্র ছাড়াইয়া উঠিয়া

সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল। পশুপতি বাবু যা বলিয়াছিলেন তাই করিলেন। বঙ্কিম বাবুর বইয়ের sale বন্ধ হইয়া গেল। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দখিয়াছি কি জুতার দোকানে, কি মসলার দোকানে, কি গাঁজার দোকানে, তাঁহার বই কোথাও পাওয়া যায় না।

৫

পশুপতি বাবু ৬৲ টাকা লইয়া গোধনপুরে গেলেন। তখন রত্নমঞ্জরী শয্যাগত, আর বড় একটা উঠিতে পারেন না। তথাপি যখন শুনিলেন যে স্বামী অনেক টাকা আনিয়াছেন, তখন মনের সাধে স্বামীর সেবা করিবেন বলিয়া কোন রকমে শয্যা হইতে উঠিয়া রন্ধনাদি করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাও বিধি তাঁহাকে বেশী দিন করিতে দিলেন না। পাঁচ সাত দিবসের মধ্যে শেয়ালদহের ছোট আদালত হইতে এক খানি শমন পশুপতি বাবুর নিকট পৌঁছিল। ছাপাখানার দেনার জন্য তাঁহার নামে নালিশ হইয়াছে, দেনার পরিমাণ ১৮৩৷৶১৫। যে লোক শমন লইয়া গিয়াছিল, তাহার পোশাক এবং রকম সকম দেখিয়া রত্নমঞ্জরীর ভয় হইল। তাহাতে আবার পেয়াদা টাকা কড়ির কথা কহিল। দেখিয়া শুনিয়া রত্নমঞ্জরী ভয়ে ভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল:—"ও আবার কিসের টাকা গা? কেহ কি নালিশ করেছে?" পশুপতি বাবু বলিলেন—"না না ও টাকা তাহারা আমার কাছে পাইতে পারে না। ও তাহাদের ভুল। তা সে যাহাই হউক, তোর ও কথায় কাজ কি?" রত্নমঞ্জরী বুঝিল যে তবে কোন ভয় নাই, অথচ তাহার মনে কেমন একটু ভয়ও রহিয়া গেল। তিন দিন পরে পশুপতি বাবু শেয়ালদহের ছোট আদালতে উপস্থিত হইলেন। যথা সময়ে তাঁহার মকদ্দমা ডাক হইল। তিনি হাকিমের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। হাকিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম পশুপতি ভট্টাচার্য্য?"

পশু। Yes.

হা। তুমি এই নকুড় চন্দ্র ঘোষের ছাপাখানায় "জাগো জাগো লতিকা" নামে এক খানা বই ছাপাইয়াছ?

প। Yes.

হা। ছাপার খরচ কত হইয়াছে?

প। আমি জানি না।

হা। উনি বলেন ছাপার খরচ ১৮৩৷৶১৫ হইয়াছে। ইহা তুমি স্বীকার কর?

প। Yes.

হা। এ টাকা কি ইহার কোন অংশ তুমি নকুড় চন্দ্রকে দিয়াছ?

প। আমি ও টাকা কেন দিব?

হা। তোমার কাজ হইয়াছে, তুমি দিবে না ত কে দিবে?

প। ঐটি মহাশয়ের ভুল। শুধু মহাশয়ের কেন, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতিও ঐ রকম ভুল করিয়া থাকেন। তা সে

কেবল আপনারা উদ্ধার এবং উপকৃতকারিতা বুঝেন না বলিয়া ভ্রমর ভুয়সী ভ্রান্ত করিয়া থাকেন। মহাশয়, আমি যে বই ছাপাইয়াছি সে কি আমার নিজের জন্য ছাপাইয়াছি? আমরা patriot, যাহারা patriot তাহারা কি নিজের জন্য খায়, নিজের জন্য পরে, নিজের জন্য বিবাহ করে, নিজের জন্য বই লেখে, নিজের জন্য বই ছাপায়? কখনই নয়ং তাহারা সব পরের জন্য করে। অতএব দেশের লোকের কর্ত্তব্য যে তাহারা patriot দিগকে খাওয়ায়, বিবাহ দিয়া দেয়, বই লিখিতে কাগজ কলম দেয়, বই ছাপাইবার খরচ দেয়। সকলের নিতান্ত, নিরুপম, নির্বাধ্য, নির্ব্বন্ধাতিশয় কর্ত্তব্য যে তাহারা patriot দিগকে যথা সর্ব্বস্ব দেয়, নইলে patriot গণ কেমন করিয়া দেশকে তাহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব দিবে? মহাশয় দিব্য চক্ষে দেখিবেন patriot এর দেশের লোকের উপর ষোলআনা দাবি। তা আমি এই যে দেশের, ভারতের, ভারতমাতার উদ্ধারের জন্য কাব্য লিখিলাম, সে কাব্য ছাপাইবার খরচ কি আমাকে দিতে হইবে,না দেশের লোককে দিতে হইবে, ভারতকে দিতে হইবে, ভারত মাতাকে দিতে হইবে? মহাশয় প্রবীণ, প্রাচীন, প্রাজ্ঞল, প্রণিধান করিয়া দেখিবেন যে সে খরচ দেশের লোকের দেওয়া উচিত, ভারতের দেওয়া উচিত, ভারতমাতার দেওয়া উচিত। মহাশয় ও ত একজন দেশের লোক। মহাশয়ের ও সে খরচ দেওয়া উচিত। তবে মহাশয় patriot কাহাকে বলে এবং patriotকে কি রকম করিয়া পালন করিতে হয়, জানেন না বলিয়া মৎপ্রণীত গ্রন্থ ছাপাইবার খরচের জন্য আমাকে ধরিয়া বিধ্বস্ত করিতেছেন। কেন, নকুড় বাবু ও ত দেশের লোক—ওঁর ও ত ছাপার খরচ দেওয়া উচিত? উনি দেন না কেন? বাবা! patriot পুষিতে ব্যয় কত, তাত জানেন না!, patriot পোষা আর গরু পোষা একই কথা। কত খোল খড় খাওয়াইলে তবে গরু দুধ দেয়। patriot-কে কি আপনারা গরু হইতে খাটো মনেকরেন? হা কুসংস্কার! হা ভারত মাতা!"—

হাকিম অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন। কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আসামীকে বলিলেন—"তোমার নামে ১৭৩ ৸৶১৫ টাকার ডিক্রী দিলাম। টাকা আনিয়াছ কি?"

প। আমি কি জন্য টাকা আনিব? দেনা আপনাদের সকলের। এত বুঝাইলাম তবুও আপনি বুঝিলেন না। অহো! ভারতে সকল লোকই কি গর্দ্দভ?

হা। কনিষ্টবল, আসামীকে গ্রেপ্তার কর। উহাকে জেলে লইয়া যাও।

তখন দুইজন কনিষ্টবল পশুপতি বাবুকে ধরিল। পশুপতি বাবু হাকিমকে বলিলেন—"আমি জেলে যাব কেন,

আপনি জেলে যাবেন।" হাকিম একটু হাঁকিয়া কনিষ্টবলকে বলিলেন—"লে যাও।" কনিষ্টবলদ্বয় পশুপতি বাবুকে টানিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় পশুপতি বাবু চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন:—"আহা patriot কাহাকে বলে তাহা এখনও ভারতবাসী বুঝিল না! আহা! patriot কে সর্ব্বস্ব দিয়া পুষিতে হয়, তাহা এখনও দেশের লোক বুঝিল না! এদেশ অধঃপাতে যাউক!"

পশুপতি বাবুর জেলে যাওয়ার সম্বাদ শীঘ্রই গোধনপুরে প্রচার হইল। রত্নমঞ্জরী যে দিন সে সম্বাদ পাইল, সেই দিনই তাহার দুঃখের জীবন ফুরাইয়া গেল। তাহার মৃত দেহের সৎকার করে, গোধনপুরে মনুষ্য মধ্যে এমন কেহ ছিল না, কেননা সমস্ত গোধনপুর আজ তাহার পতির শত্রু! যাহারা তাহার অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করিল, তাহারা বনবাসী!

ওদিকে সাবিত্রী ঠাকুরাণী পশুপতি বাবুর মেয়াদের কথা শুনিয়া, নিজের দুই খানা গহনা বেচিয়া, কিছু টাকা লইয়া শেয়ালদহে গিয়া পশুপতি বাবুকে খালাস করিলেন। খালাস হইয়া পশুপতি বাবু সেই দিনই সাবিত্রী ঠাকুরাণীকে লইয়া হাবড়ার ইষ্টেষনে গাড়িভাড়া করিয়া দেশ ছাড়িয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। তখন দেশ যথার্থই উদ্ধার হইল।

ফুলের প্রণয়-ভাষা।

১

ফুলের প্রণয় ভাষা মরি কি মধুর রে!
আঁধার আঁধারে থাকি,
পাতায় পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি মরে থাকে সরমে;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,

ছুঁইলে ঝরিবে উহু বাজে তার মরমে,—
কিবা নব অনুরাগ কামিনী কুসুমে রে!

২

প্রেমের কৈশোর ভাব রজনী গন্ধায় রে!
আঁধারে আঁধারে থাকে,
আঁধারে লুকায়ে রাখে
শীতল সৌরভ ভরা সুকুমার শরীরে;
কিন্তু সহে দরশন,
সুকোমল পরশন,
তোল তারে,—প্রেমভরে কাঁদিবেক শিশিরে,—
প্রেমের কৈশোর ভাষা রজনী গন্ধায় রে!

৩

প্রেমের যৌবন দেখ বিকচ গোলাপে রে!
প্রীতিময়, প্রেমময়;
শোভাময়, সুধাময়;
ব্রীড়ার ঈষদ হাসি ভাসিতেছে অধরে;
অতৃপ্ত সৌরভে, রাগে,
অতৃপ্ত বাসনা জাগে,
তথাপি কোমল প্রাণ সমীরণে ঝরে রে,—
প্রফুল্ল যৌবন ভাব বিকচ গোলাপে রে!

৪

প্রেমের প্রৌঢ়তা মূর্ত্তি পদ্মিনী সুন্দরী রে!
সুখ শান্তি স্বরূপিণী,
প্রীতিপূর্ণ সরোজিনী,
যৌবন-সৌরভ আছে হৃদয়েতে লুকায়ে;
ব্রীড়া নাই, ক্রীড়া নাই,
সেই চঞ্চলতা নাই,
প্রীতি পারাবারে গেছে সেই লজ্জা মিশায়ে,—
ঝড়ে বজ্রে নাহি টলে পদ্মিনী সুন্দরী রে!

৫

প্রেমের মিলন সুখ মালতী কুসুমে রে!
গলায় গলায় থাকে,
হৃদয়ে হৃদয় মাখে,
শয্যায় পড়িয়া থাকে অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া;
বিরহ তাপিত প্রাণে,
কে যে শীতলতা দানে,
কি কোমল সৌরভেতে মনো প্রাণ মোহিয়া,—
মরি কি মিলন সুখ মালতী কুসুমে রে!

৬

প্রেমের দুবাশা ব্রতী ওই সূর্য্যমুখী রে!
কোথায় গগনে রবি,
প্রচণ্ড অনল ছবি,
কোথা গন্ধ হীন ফুল ধরাতলে ফুটিয়া;
কি দুবাশা হৃদে বহে,
অনিমিষ নেত্রে রহে,
যায় শুকাইয়া, সেই রবি পানে চাহিয়া,—
প্রণয়ের একাগ্রতা ওই সূর্য্যমুখী রে!

৭

প্রেমের বিধবা শেষ ওই সেফালিকা রে!
আঁধারে আঁধারে ফুটে
আঁধারে ভূতলে লুটে,
কাঁদি সারা নিশি, পড়ি অশ্রু ভারে ঝরিয়া;
মাটিতে রাখিয়া বুক
যুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া,—
প্রেমের বিধবা শেষ ওই সেফালিকা রে!

প্রাপ্ত গ্রন্থের

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

Life of the Honb'le Justice Dwarka Nath Mitter

By Dinabundhu Sanyal. Calcutta: Published by the author, Berhampur. 1883.

বঙ্গদর্শনে সচরাচর ইংরেজী গ্রন্থ সমালোচিত হয় না। সমালোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে কিন্তু আমাদিগকে সে ব্রত ভঙ্গ করিতে হইতেছে—কেননা এখানি বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ মৃত অনারেবল দ্বারিকানাথ মিত্রের জীবনী।

মহাত্মা দ্বারিকানাথ মিত্র যেমন মানুষ ছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থ আমরা তেমন কিছুই করিতে পারি নাই। তিনি কিরূপ গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা বিচার করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের এইটী মাত্র বুঝা আবশ্যক যে তিনি বিদেশীয়দিগের কাছে, এমন কি ইংরেজ প্রভৃতি সুসভ্য সমাজের সুপণ্ডিত মহাত্মাদের কাছে, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এবড় সামান্য কাজ নয়। এ কাজ যে করে, সে একটী সামাজিক এবং ঐতিহাসিক শক্তি। তাহার স্মৃতি পবিত্র ও বলবিধায়ক। তাই বলিতেছি যে, দ্বারিকানাথ মিত্রের নিমিত্ত আমরা এমন কিছুই করিতে পারি নাই। দীনবন্ধু বাবু তাঁহার স্মৃতি সংরক্ষণার্থ এইগ্রন্থ খানি লিখিয়া তদুদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ করিয়াছেন বলিয়া, আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এবং সেই জন্য অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এ পুস্তকের আমরা আদর করি। মিত্রজের ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকের জন্য দীনবন্ধু বাবু বিস্তর অমূল্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন।

সাধারণতঃ প্রগাঢ় আইনজ্ঞ এবং সদ্বিচারক বলিয়াই দ্বারিকানাথের প্রতিষ্ঠা—কিন্তু তিনি যে অতি সুশিক্ষিত এবং প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, অনেকেই বোধ হয় তাহা জানেন না। নিম্নোদ্ধৃত অংশ টুকু পড়িলেই পাঠক বুঝিবেন, দ্বারিকানাথ কেমন উচ্চদরের কাব্যরসজ্ঞ ছিলেন :—

"Romeo and Juliet is the only play of Shakespear in which the whole plot is made to rest on the passion of love, a passion which is representedhere in its truly dramatic aspect, and in such a light as to enchain irresistibly the sympathies of all. In the way in which love is generally treated

in the English stage, it is felt to be an impertinent and tedious interference with the real business of the piece. When it is represented merely as one of many other passions, holding divided empire with jealousy, with envy, with pride, with hatred; contending with duties with prejudices, yielding to views of selfishness, or the rules of society, it may be decorons, but it is not dramatic. But in a different light has the passion been represented here by Shakespeare. Here indeed is to be found that Eros, which haunts the dreams of youth, which lives in the memory, and casts back a sunshine even on the twilight of age : not a passion of this noisy world, but a celestial sentiment ; mysterious, immortal, born of the deity, returning into his bosm. Where its spark lights, it is inextinguishable, where its essence penetrates, it indelibly colours with its golden hue the whole fountain of existence. All duties yield to it, for it is itself the highest of all ; all evil passions disappear before it, for they can not co-exist with its presence ; it cannot hesitate or doubt, for a divine revelation has announced its destiny ; all prejudices of rank and society, all rules of custom are abrogated by the dictates of its higher law ; it is open and undisguised, it is not clamorons but calm, and yet assured, for it confides in its own energies and its heavenly though invisible source. One and indivisible, it is never at war with itself nor distracts us with a conflict of feeling. We foresee its course from the first and follow it to the last with clear and unbroken sympathies. It no longer appears as a mere, disturbing force, crossing the path of other duties, and jostling them in their courses, but a calm celestial luminary which, in its irresistible round, draws all minor objects within its orbit, and round which they are contented thereforward to perform their humbler revolutions."

জীবন-সঞ্চার। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, ১২৭নং মসজীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট্, বেদান্ত প্রেসে শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মার্জ্জিত রুচি নবীন সমালোচক যোগেন্দ্র বাবুকে এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য বোধ হয় নরকে পাঠাইতে উদ্যত হইবেন, কিন্তু বৃদ্ধ বঙ্গদর্শন আজিও ততটা সুসভ্য হইতে পারে নাই। সুরুচি এবং কুরুচি কাহাকে বলে, কি সুপাঠ্য এবং কি অপাঠ্য, কিরকম লিখিলে দেশে সুনীতি প্রবল হয়, কিরূপ লিপি প্রণালীতেই বা কুনীতি প্রশ্রয় পায়—এই

সকল গুরুতর বিষয়ে স্বল্প ইংরেজী নবীস এবং ইংরেজী নীতির পক্ষপাতী বঙ্গীয় যুবকগণ, যেপ্রকার ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিবেচনা করিলে এই গ্রন্থের রচয়িতা যোগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। সন্তানোৎপাদন, কামপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়িক বিষয় সম্বন্ধে তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রচলিত রুচি ও মতানুসারে তাঁহার গ্রন্থের বিষয় অতি কদর্য্য এবং তিনি স্বয়ং দণ্ড পাইবার যোগ্য। কিন্তু তিনি স্বপক্ষ সমর্থনে দুই একটী কথা বলিয়াছেন। তাহা এই:—

"সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক আমাদের দেশে অতি বিরল, "যৌবন-সুহৃদ" ও "জীবন-রক্ষক" ভিন্ন আর একখানিও এ প্রকার পুস্তক নাই। সুতরাং আমাদের ভয় হয়, পাছে সাধারণে আমাদের "জীবন সঞ্চারকে" ঘৃণা করেন, পাছে কেহ পুস্তকখানিকে কুরুচির আদর্শ-স্থল বলেন। দেশে অনেকেরই বিশ্বাস যে সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহা তিমিরে আবৃত রাখিতে হয়, যেন তাহা প্রকাশ করিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে উক্ত বৃত্তিকে অন্যায় পথে চালিত করিলে যে সকল পাপের উদ্ভব হয়, তাহা জগতে নাই, এই প্রকার ভাব দেখাইলে, সে গুলি জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে। যেখানে গোপন, সেখানেই কু; জিজ্ঞাসা করি, সন্তানোৎপাদন কি পাপ কার্য্য? তাহা না হইলে এ সম্বন্ধে এত লুকাচুরি কেন?"

যাঁহার এরূপ সাহস, তিনিই যথার্থ মানুষ। যাঁহার এরূপ শিক্ষানীতি, তিনিই যথার্থ গুরু হইবার যোগ্য। যাঁহারা "রুচি," "রুচি" করিয়াও প্রতি-পদে এবং প্রতি কাজে রুচির শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার ভয় করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

পৌষ-পার্ব্বণ। (রসকাব্য।)

সায়ের শ্রীনেহালচাঁদ প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত।

আজ্ বঙ্গে পৌষ পার্ব্বণ। আজ্ বঙ্গবাসী পিঠাপুলী খাইতে ব্যস্ত। পাতলা সরুচাকলি নলেন গুড়ের পরমান্নে ডুবাইয়া মুখে দিলে বোধ হয়, যেন মুখে চতুর্ব্বর্গ প্রবেশ করিয়াছে। অতএব আজ্ আমাদের মুখ বড় মিষ্ট। মিষ্টমুখে মিষ্ট কথা বই বাহির হয় না। কাজেই এই বিচিত্র পৌষ পার্ব্বণ সম্বন্ধে আমরা মিষ্ট কথা বই তিক্ত কথা বলিতে আজ্ নারাজ।

গ্রন্থে দোষ যে কিছু নাই, এমত নহে। সরস বর্ণনা বেশী দীর্ঘ করিতে গেলে কিছু নীরস হইয়া পড়ে। সে দোষ এ গ্রন্থের অনেক জায়গায় আছে। টানিয়া বুনিয়া বাড়াইতে গিয়া গ্রন্থের অনেক স্থান দুর্ব্বোধ ও হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বলিয়াছিত,আজি চতুর্ব্বর্ণ চিবাইতে চিবাইতে তিক্ত কথা বলিব না। অতএব দুইটা ভাল কথা বলি। পৌষ পার্ব্বণের রচনা নূতন প্রণালীর। ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে এ প্রণালীর রচনা বাঙ্গালায় বড় দেখা যাইত না। এ একটা কম কথা নয়। নূতন রচনা প্রণালীর অর্থ নূতন শক্তি। বাঙ্গালা সাহিত্যে যথার্থই নূতন শক্তি বিকাশ পাইতেছে। নূতন শক্তি পাইলেই লোকে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। নেহালচাঁদ ও তাই করিয়াছেন। অতএব সেজন্য তাঁহার সহিত বেশী দ্বন্দ্ব করিতে রাজি নই।

পৌষ পার্ব্বণের রচনায় বেশ জোর আছে। এবং স্থানে স্থানে যথার্থই জমজমাট হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার ভাষা এবং ছন্দের উপর বিলক্ষণ দখল দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের অনেক স্থানে যথার্থই মিষ্ট এবং মনোহর বর্ণনা আছে। পৌষের রাত্রি শেষে গৃহিণী শয্যাত্যাগ করিয়া "গলবস্ত্রে" পৌষ "জাগাইতেছেন" :—

"রাত পোহালো, সারাণ হলো
পাক পাখালী গায় রে,
গা তোল গো, লক্ষ্মী মেয়ে
সোণার পৌষ যায় রে।
ফুল ফুটে বাতাস ছোটে
গোঠে গরু ধায় রে,
গা তোল গো, সোণার যাদু
সুখের পৌষ যায় রে!
ও রাত তোর পায়ে পড়ি
এখন ভোর হস্‌নে,
সুখ বিলাসী, পৌষ আমাদের
তারে হরে নিস্‌নে।
ঘরে যাও গো সুয্যি ঠাকুর
উদয় পাটে বসোনা
দুঃখী মেয়ের, দুঃখু দেখে
অমন করে হেসোনা।"

কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহিণী এই বলিয়া ঢেঁকিতে "বামনী" বাঁধিতেছেন :—

"আয়ার বায়ার পটি
দূরদেশে না যেও,
আমার বাড়ী তিন দিন
পিটে পায়েস খেও!
বউ ঝি নিয়ে বাউনি বাঁধি
মুখটি তুলে চাও,
আর কোথা না যেও তুমি
আমার মাথা খাও।
দাও বাউনি পরমাই বর,
বজায় রাখ দাসীর ঘর।
সব দিন নয় বছর ভরে,
এক দিন এসো দাসীর ঘরে।
তাই বাউনি আজ্‌লো তোরে
রাখমু দিয়ে বাঁদ,
যাগ যজ্ঞি নেমন্তনে,
এসো-লক্ষ্মী, বসো জনে;
ধন, দৌলত, দুধে, ভাতে,
ব্যাটার ব্যাটা পুতীর পুতে,
ধান, মান দে বজায় রাখো
কোলের সোণারচাঁদ।"

গৃহিণী যখন পিষ্টক তৈয়ার করিতেছেন, পাড়ার এক বৃদ্ধা ডাকিনী তখন রন্ধন গৃহের আড়ালে দাঁড়াইয়া কতকগুলি মন্ত্র পড়িতেছে, আর গৃহিণীর পিষ্টক চুঁইয়া যাইতেছে। একটি মন্ত্র এই :—

"রাবণের মা, রক্ষী বুড়ী,
ডেকে বোল্‌তেছে,
কোন্ হাভাতী, চিরুণ-দাঁতী,
চাল কুটছে রে ?
তার, কোটন বাটন, ঘোটন ঘ্যাটন,
ভস্মে ঢালন ঘী ;
তার ফর্ ফরাণী, ঘুর্ ঘুরাণী
ঘুরিয়ে দিতেছি।
আয়রে আমার এক ঠেঙ্গে,
ট্যাংরা মাছের ঘাড় ভেঙ্গে !
আয়রে আমার কাণকুঠে,
তীর তারা সব ধর ছুটে।
আয়রে আমার পাতাল ফোঁড়,
মাম্‌দো মেঠো মাণিক জোড়।
আয়রে আমার মদন টাক,
সঙ্গে পা'ক দু তিন লাখ।
রক্ষী বুড়ীর লক্ষ্মী তোরা,
বিশেষ তোদের বলবো কি,
দেখ্ দেখি ধন, চাল কোটে কোন,
চিংড়ী পোড়ার চ্যাংড়া ঝী ?
তার, পোষ পবুণী, দে ফেলে,
তার দুধ গুড়ে দে জল ঢেলে ;
পুড়ুক পিঠে, নিবুক জ্বাল,
ডুবুক নৌকো, ভাঙ্গুক হাল।
রাবণের মা ডেকে কয়,
হকের গুঁড়ী যেন নক্কে যায়।"

আর বেশী কথা বলিবার স্থান নাই। এখন, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন নেহাল চাঁদের রন্ধনশালায় পিষ্টক চুঁইয়া না যায়। যদি যায় এমন দেখেন, তবে তাঁহার পিষ্টক প্রস্তুতকারিণী নীচের মন্ত্রটী পড়িয়া যেন দুটো সরিষা ছুড়িয়া মারেন—

"যে করে গৃহস্থের নষ্ট,
তারে দাও অশেষ কষ্ট।
যে হরে রাঁধুনীর মান,
কাটো তার নাক কান।
আগুন তুমি সর্ব্ব শুচি,
তোমায় দেবো লুচীর গুছী।
ডাকৃচি ঠাকুর ফিরে চাও
ডাইনী মাগীর মুণ্ড খাও।
ঘুচুক দুঃখু, বাড়ুক সুখ,
ডান ডাইনীর পুড়ুক মুখ।
কার্ আজ্ঞে ? মা শ্মশান কালীর আজ্ঞে !
এই জল শর্ষে তার মুখে লাগ্‌গে।"

বঙ্গদর্শন।

১০৬ সংখ্যা।

দেবযান।

মৃত্যুর পর, বা স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, আত্মা কিরূপে কোথায় যায়! এতৎপ্রসঙ্গে ভারত বন্ধু সিনেট সাহেব Esorteric Buddhism পুস্তক মধ্যে "দেবচান" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেবচান শব্দের প্রকৃত অভিধেয় কি? তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য নহে এবং তাহা কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত তাহাও জানি না। বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনায়, দেবচান শব্দ পাই নাই; তবে তিব্বৎ দেশীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঐ শব্দ থাকিলেও থাকিতে পারে। আর্যশাস্ত্র হইতে ঐ শব্দ গৃহীত,—তাহার প্রকৃত নাম "দেবযান"। সংস্কৃত ভাষায় দেব যান কি? তাহা বর্ণন করিতেছি।

সংস্কৃত ভাষায় যে দেবযান শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি? তাহা সংক্ষেপে বলিলে মনস্তুষ্টি না হইবারই সম্ভব, সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া এতৎ বিষয়ক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে।

সংস্কৃত ভাষায় কোন্ গ্রন্থে দেবযান শব্দ আছে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে, সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রেই ঐ শব্দ বিরাজ করিতেছে। বৈদিক আরণ্যক, উপনিষদ, ও মহাভারতাদি গ্রন্থের প্রত্যেক রহস্যবিজ্ঞান অংশে ঐ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"বেথ্য দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং
পিতৃযানস্য বা যৎকৃথ্যা দেবযানং বা
পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা।
[আরণ্যকোপনিষদ্]

বেথ্য পথো র্দেবযানস্য পিতৃযানস্য
বা ব্যাবর্ত্তনা ইতি।
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্)

ভারতবর্ষে যখন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতি হইয়াছিল—যে সময়ে শ্বেতকেতু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস এবং অন্যান্য

জন্মসিদ্ধ যোগীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—দেবযান কি? তাহা সেই সময়ের মহাত্মারাই জানিতেন। তাঁহাদের আর্য-বিজ্ঞানের নিকট কিছুই দুর্জ্ঞেয় ছিল না। মরণের উত্তরকাল, জীবের ভবিষ্যৎগতি, আত্মার নির্ম্মোক্ষ, সমস্তই তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা (ইহার নামান্তর যোগজ প্রজ্ঞা বা দিব্যচক্ষু) দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে মরণের পর, বা স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর, যাহারা উৎকৃষ্ট জীব তাহাদের উর্দ্ধগতি হয় এবং যাহারা নিকৃষ্ট প্রাণী তাহারা এই পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের আর উর্দ্ধগতি হয় না, প্রত্যুত ক্রমেই তাহাদের অধোগতি হইতে থাকে। ধর্ম্ম কর্ম্ম পরায়ণ শুদ্ধাত্মাগণের উর্দ্ধ লোকে যাইবার দুইটী পথ আছে। তাহার একটী পথের নাম দেবযান এবং অন্যতর পথের নাম পিতৃযান। যাঁহারা অত্যন্ত শুদ্ধাত্মা, তাঁহারাই সেই উৎকৃষ্টতম দেবযান পথে গমন করেন; এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ মলিন তাঁহারা পিতৃযানে আরূঢ় হন। দেবযান পথে গতি হইলে আর এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তি হইয়া যায়; কিন্তু পিতৃযান পথে গতি হইলে, ক্রমে নানাবিধ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, অবশেষে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া, জরা, মরণাদি ভোগ করিতে হয়। যাহারা অত্যন্ত পাপী, অত্যন্ত মলিন, তাহারা এবং যাহারা ক্ষুদ্র প্রাণী তাহারা, উক্ত উভয় পথের কোন পথেই যাইতে সমর্থ হয় না। কেননা তাহাদের উর্দ্ধ গতিশক্তি নাই, সুতরাং তাহারা এই স্থানেই জন্মিয়া মরণের পর পুনরায় এই স্থানেই বৃক্ষাঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস হয়। অন্য কোন লোকে তাহাদের গতি হয় না। সেই জন্যই ঋষিরা এই পৃথিবীকে দেবযান ও পিতৃযান ভিন্ন স্বতন্ত্র এক স্থান অর্থাৎ তৃতীয় স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদে (আরণ্যক ও উপনিষদে) এতৎসম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে, তাহা বলিতেছি—

অরুণ নামক ঋষির পৌত্র, শ্বেতকেতু নামক জনৈক ঋষি কুমার, পিতার নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আপনার বিদ্যাখ্যাতি বিস্তারার্থ, পঞ্চাল দেশীয় রাজসভায় গমন করিলেন। সভাসদ্গণকে বিদ্যাবাদে পরাভূত করিয়া অবশেষে রাজাকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে তাঁহার সমীপগামী হইলেন। রাজার নাম প্রবাহণ এবং তাঁহার পিতার নাম জীবন। রাজা প্রবাহণ ইতিপূর্ব্বে ঋষিকুমারের বিদ্যাগর্ব্বের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আগমন মাত্রেই কুমারকে "ওহে বালক!" এতদ্রূপে সাবজ্ঞ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার নিকট শিক্ষিত হইয়াছ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "হাঁ আমি শিক্ষিত হইয়াছি। যদি তোমার কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, ত তাহা বলিতে পার।" প্রত্যুত্তর শুনিয়া

রাজা বলিলেন

"বেথ্য যথেমাঃ প্রজাঃ প্রয়ত্যো-
বিপ্রতি পদ্যন্তা ইতি ?"

এই সকল প্রজা মরণের পর যেরূপে যেথানে গমন করে, তাহা তুমি জান ?

"নেতি হোবাচ।"

শ্বেতকেতু কহিলেন, "না, তাহা জানি না।"

"বেথ্য উ যথেমং পুনবা পদ্যন্তা ইতি ?"

আচ্ছা, যেরূপে এই লোকে পুনরাগত হয়, তাহা জান ?

"নেতি হৈ বো বাচ।" তাহাও জানিনা।

"বেথ্য উ যথা লোক এবং বহুভিঃ
পুনঃ পুনঃ প্রয়স্তি র্নসম্পূর্য্যতা ইতি ?"

বার বার বহুজীব জন্মিতেছে, মরিতেছে; তথাপি সে লোক ও এ লোক পরিপূর্ণ হয় না কেন, তাহা জান ?

"নেতি হৈ বো বাচ।" তাহাও জানিনা।

"বেথ্য উ যতিথ্যাং আহুত্যাং হুতায়াং
আপঃ পুরুষ বাচোভূত্বা সমুখায় বদন্তীতি ?"

আপ অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্য সকল কতবার আহুত হইয়া অবশেষে পুরুষাকারে পরিণত হয়, তাহা তুমি জান ?

"নেতি হৈ বো বাচ।" আমি তাহাও জ্ঞাত নহি।

"বেথ্য উ দেবযানস্ত বা পথঃ প্রতি পদং
পিতৃযানস্ত বা যৎকৃত্বা দেবযানং বাপস্থানং
প্রতিপদান্তে পিতৃ যানং বা ?"*

জীব যে কর্ম্ম করিলে দেবযানপথে বা পিতৃযানপথে গমন করে, তাহা জান ? "নাহ মত একঞ্চন বেদিতি হোবাচ।" এই পাঁচ প্রশ্নের একটীও জানিনা।

"অথমু কিং অনুশিষ্টোঽ বোচথাঃ ?
যোহি ইমান্ নবিদ্যাৎ কথং স
অর্নুশিষ্টেনঽব্রবীৎ ?"

তবে তুমি কি হেতু বলিলে আমি শিক্ষিত হইয়াছি ? যে ব্যক্তি এই সকল কথা জানে না, সে কি প্রকারে বলিতে পারে যে, আমি শিক্ষিত হইয়াছি ?

অতঃপর এতদ্রূপ সতিরস্কার বাক্যে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া শ্বেতকেতু পুনর্ব্বার পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাকে কিছুই উপদেশ করেন নাই; অথচ বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞাতব্য উপদেশ করিলাম।' আমাকে যে উত্তমরূপ শিক্ষা দেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, সেই দুর্বৃত্ত রাজা আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন করিল—আমি তাহার একটীরও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না।" অনন্তর তাঁহার পিতা বলিলেন "বৎস, এই পাঁচ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত আমিও জ্ঞাত নহি। জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই আমি উহা তোমাকে বলিতাম।" এই বলিয়া, তিনি সেই প্রবাহণ রাজার নিকট গমন করিলেন।

*ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এই প্রশ্নটী অন্য প্রকারে উক্ত হইয়াছে। যথা—"বেথ্যপথোর্দেবযানস্য পিতৃযানস্যচ ব্যবর্ত্তনা ইতি।" অর্থাৎ দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ যে স্থানে গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছে ? একসময়ে দুই ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিল,পরন্তু গমনকালে তাহার একজন দেবযান পথে ও অন্যজন পিতৃযান পথে যায় কেন তাহা জান ? কোথা হইতেই বা তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় তাহা জান ?

রাজা প্রবাহণ মান্যতম ঋষিকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত পূজা করিলেন, অনন্তর বলিলেন, "মহর্ষে! আপনি মনুষ্য ব্যবহার্য্য প্রচুর ধন প্রার্থনা করুন।" ঋষি বলিলেন "রাজন্! তোমার মানুষধন তোমারই থাকুক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তুমি যে আমার পুত্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার প্রত্যুত্তর কি, কেবল তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব তাহা তুমি আমাকে উপদেশ কর।" রাজা এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, সুতরাং বলিতেই হইবে। কিন্তু ইহা ন্যায় পূর্ব্বক বলা উচিত। ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "তবে এখানে থাকিয়া কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য করুন, তৎপরে বলিব। একাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই ছিল। ব্রাহ্মণেরা ইহা জানিতেন না। আজ হইতে ইহা ব্রাহ্মণেরা জানিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি আপনি অবশ্যই উক্ত বাক্যের নিমিত্ত ক্ষমা করিবেন।"

অনন্তর রাজা যথোচিত কালে ঋষিকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রত্যেক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উপদেশ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল উপদেশ মধ্য হইতে আমরা কেবল "দেবযান" পথটী সংগ্রহ করিলাম। অন্য গুলি সেই স্থলেই থাকিল।

রাজা প্রবাহণের মতে, দেবযান আর দেবলোক প্রাপক পথ তুল্য কথা। সেইরূপ পিতৃযান আর পিতৃলোক প্রাপক পথ সমান। দুইপথের মধ্যে দেবযান পথটী বিবৃত করা গেল।

"যেচামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তে অর্চিরভি সম্ভবন্তি। অর্চিষোঽহঃ। অহ্ন আপূর্য্যমান পক্ষম্। আপূর্য্যমান পক্ষাৎ যান ষণ্মাসাং উদঙ্ আদিত্য এতি তান মাসান্। তেভ্যঃ মাসেভ্যো দেব লোকং। দেবলোকাদাদিত্যম্। আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্। তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস * এত্য ব্রহ্মা লোকান্ গময়তি। তেষু ব্রহ্মা লোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি। তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। এষ দেবযানঃ পন্থা।"

এই শ্রুতির সংক্ষেপার্থ এই যে, যাঁহারা এই শরীরে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহারা পরিব্রাজক অথবা বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা সহকারে মরণান্ত পর্য্যন্ত সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনায় রত হন, তাঁহারাই স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, প্রথমতঃ অর্চি নামক দেবতার অভিমুখে উপস্থিত হন। অর্চি দেবতা উত্তরমার্গ অর্থাৎ প্রেতাত্মার উত্তরদিক্ গমনের পথ বিশেষ। অনন্তর সে তথা হইতে অহর্দ্দেবতার নিকট যায়। পরে অহর্দ্দেবতা তাঁহাকে শুক্ল পক্ষাভিমানিনী দেবতার নিকট সমর্পন করেন। ক্রমে

*ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মানসঃ পুরুষঃ এতৎ পরিবর্ত্তে "অমানবঃ পুরুষঃ" এতদ্রূপ পাঠ আছে।

শুক্ল পক্ষ দেবতা তাঁহাকে বহন করতঃ সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণের নিকট সমর্পণ করেন। উত্তরায়ণ মাসের সংখ্যানুসারে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সংখ্যা হয়। অনন্তর তিনি সেই ষণ্মাস দেবতা কর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হন। দেব লোক হইতে আদিত্য লোক এবং তথা হইতে তিনি বিদ্যুৎ লোকে গমন করেন। বিদ্যুৎ লোকে গমন কবিলে পর, ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষেরা আগমন করতঃ তাঁহাকে সেই অক্ষয়; অব্যয় ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। * অনন্তর তিনি সেই স্থানে থাকিয়া ক্রমে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন এবং অনেক কল্প কল্পান্তকাল বাস করেন।

ইহলোকে হইতে ব্রহ্মলোকে গমনের যেরূপ ক্রম প্রদর্শিত হইল, মৃতাত্মার উন্নতির বা উর্দ্ধ গমনের সেই ক্রম পরিপাটীর নাম দেবযান। ইহার অন্য নামও আছে। "অর্চি মার্গ", "উত্তর মার্গ", "উত্তরগতি", "উত্তরপথ", "দেবমার্গ", ইত্যাদি।

"ন চাত্র দক্ষিণা যন্তি না বিদ্বাং
সো তপস্বিনঃ।"

যাঁহারা কেবল যাগ, যজ্ঞ, দান ও পূজা করেন, যাঁহারা অধ্যাত্ম তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, যাঁহারা পাপক্ষয়ার্থ কোন তপশ্চর্য্যা করেননা, এপথটি তাঁহাদের জন্য নহে। কোন কালেই তাঁহারা এপথে যাইতে পারেন না। তাঁহাদের জন্য দক্ষিণ মার্গ অর্থাৎ পিতৃযান পথ নির্দ্দিষ্ট আছে।

"নপুনরাগমনং ইহ"

দেবযান পথে বা উত্তরমার্গে আরূঢ় হইলে তাঁহারা আর এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ইহ সংসারে আর তাঁহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা দক্ষিণ মার্গে অর্থাৎ পিতৃযান পথে আরোহণ করেন, তাঁহারা ক্রমে চন্দ্রলোক প্রভৃতি দেবলোক ভোগকরিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। আর আর যাহারা কোন প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, আপনার বল বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে না, তাহারা উল্লিখিত দুই পথের কোন পথই দেখিতে পায় না। তাহারা উক্ত পথদ্বয় ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত কালের জন্য এই স্থানেই—এই পৃথিবীতে—"ক্ষুদ্রাস্ত সকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানিভ বন্তি" ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইয়া বার বার জন্মে ও বার বার

* ঋষিরা বলেন যে, ব্রহ্মলোকে দুই শ্রেণীর অমানব পুরুষ বাস করেন। যাঁহারা জ্ঞান বলে, বিদ্যাবলে, তপস্যাবলে মাহাত্ম্য লাভ করিয়া তথায় গমন করেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য এক শ্রেণী অমানব পুরুষ আছেন। তাঁহারা ব্রহ্মার মানস সৃষ্ট এবং নিত্যোদিত মাহাত্ম্য অর্থাৎ ইহাঁরা প্রাপ্ত মাহাত্ম্য নহেন—তাদৃশ মাহাত্ম্য তাঁহাদিগের স্বতঃ সিদ্ধ।

ছান্দোগ্য ব্রহ্মণের মতে যাঁহারা প্রাপ্ত মাহাত্ম্য কপিলের মতে তাঁহারা সিদ্ধ আত্মা। থিয়োসফিষ্ট ভ্রাতৃগণ ইঁহাদিগকেই Adept Brothers বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদ্যুৎ লোকে, অভাব পক্ষে আদিত্য লোকে না যাইতে পারিলে ব্রহ্মলোক বাসী অমানব পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্নিম্নবর্ত্তী লোকস্থ অন্ন সিদ্ধাত্মাগণের সহিত ইহলোকের যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মরে। "য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটা পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্।" উক্ত উভয় পথ ভ্রষ্ট জীবেরাই এই পৃথিবীতে কখন কীট, কখন পতঙ্গ, কখন বা দংশ, মশকাদি রূপে জন্মিতেছে। ইহাদের পুনরুদ্ধার দুর্ল্ভ। উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে "অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ" তাহারা এমন নিম্ন লোকে যাইতে থাকে যে, সে সকল লোকে কিছু মাত্র আলোক, কিছু মাত্র জ্ঞান, কিছু মাত্র আনন্দ নাই—নিরন্তরই সে সকল লোক অন্ধ তমসে আবৃত আছে। সেই সকল পাপী আত্মারা অমিশ্র। অন্ধতামিশ্র রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, সঞ্জবন, অবীচি ও মহাবীচি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নরক লোকে যাইতে থাকে, কিছুতেই তাহাদের নিস্তার নাই। অতএব আমাদিগের, কেবল আমাদিগের নহে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই সদা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে রত থাকা কর্ত্তব্য। এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া যদি আমরা আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে না পারি, উপাসনাদির দ্বারা আত্মার উৎকৃষ্ট শক্তি আহরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই সেই অনন্দলোকে যাইতে হইবে। এই দুর্লভ্য জন্ম পাইয়া যদি জন্মোচিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ থাকি, কেবল পাশব পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাপৃত থাকি; তাহা হইলে আর আমাদিগের জরা; মরণাদি যন্ত্রণাময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরামদাস সেন।

☞ এই প্রবন্ধ বহরমপুর থিওসফিকেল সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

দৈব ও পুরুষকার।

পৃথিবীতে সকল মনুষ্যই কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু সকলে সমানরূপ ফললাভ করিতে পারে না। কেহ কৃতকার্য্য ও কেহ অকৃতকার্য্য হয় এবং কেহ মধ্যবিধ ফললাভ করে। কেহ রাজা, কেহ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ বীর, কেহ সুখী হয়; এবং কেহ প্রজা, কেহ মূর্খ, কেহ নির্ধন, কেহ নির্বীর্য্য, কেহ দুঃখী হয়। কেহ বা মধ্যবিধ অবস্থায় থাকে। কিন্তু কেন এরূপ হয়, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দুই দল দুই প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। একদল বলেন, কার্য্য করা মনুষ্য শক্তিতে হয় না, ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, সে তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারে। তাঁহাদের মতে দৈব শক্তিই সমস্তের মূল। আর একদল বলেন, ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই সমান করিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন

করিলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয়। এই জন্য তাঁহারা বলেন, চেষ্টাই কার্য্যের প্রধান কারণ—যে যেমন চেষ্টা করে, সে সেইরূপ ফললাভ করে। পুরুষকারই কার্য্যের মূল কারণ। দৈববাদীরা ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ পরিহার করিবার জন্য, পূর্ব্ব জন্মকৃত কার্য্যই শক্তি ভিন্নতার কারণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং কি দৈববাদী, কি পুরুষকারবাদী উভয়ের মতে মানব চেষ্টাই কার্য্যের কারণ। তবে কাহারও মতে পূর্ব্ব জন্মকৃত চেষ্টা ইহজন্মের কার্য্যের কারণ ও কাহারও মতে ইহজন্মের চেষ্টাই ইহ জন্মকৃত কার্য্যের কারণ। সুতরাং ইহাকে আমরা পরস্পর বিপরীত মত বলিতে পারি না। বরং উভয় মতকেই একবিধ বলাই সঙ্গত বোধ হয়। কেন না উভয় দলেই বলিতেছেন, মনুষ্য আপন চেষ্টার অনুরূপ ফললাভ করে। প্রভেদ এই, কেহ বলিতেছেন,—কল্যকার চেষ্টার ফল অদ্য ফলিতেছে, ও কেহ বলিতেছেন অদ্যকার চেষ্টার ফল অদ্যই প্রাপ্ত হইতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে দৈববাদীরাও পুরুষকারবাদী। কিন্তু পুরুষকারবাদীদিগকে দৈববাদী বলা যায় না। সুতরাং কি দৈব কি পুরুষকারবাদী কেহই দৈববাদী নহেন—সকলেই পুরুষকারবাদী। কেন না উভয় দলস্থ ব্যক্তিগণই বলিতেছেন, মনুষ্য চেষ্টাই কার্য্যের হেতু। সেই জন্য যে যেমন চেষ্টা করে, সে সেইরূপ ফললাভ করে। কেহ সেইফল জের টানিয়া পরজন্মে লইয়া যান, কেহ বা ইহজন্মে বাকী কাটিয়া শূন্য করেন, বা সঙ্গে করিয়া ঈশ্বর সমীপে লইয়া যান।

দৈববাদীদিগের অপর নাম অদৃষ্টবাদী। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রকৃত অদৃষ্টবাদী বলিতে পারা যায় না, কেন না যে কারণে কার্য্য হয় তাহা তাঁহাদের অদৃষ্ট নয়—স্পষ্ট দৃষ্ট। তাঁহারা যখন বলিতেছেন, মনুষ্য কৃত চেষ্টা অনুসারে (অবশ্য পূর্ব্ব জন্মকৃত) কার্য্য হয়, তখন তাঁহাদিগকে কিরূপ অদৃষ্টবাদী বলিব? তবে যদি কিরূপ চেষ্টায় কিরূপ কার্য্য হয়, তাহা না জানাকে অদৃষ্ট বলিতে হয়, তাহা হইলে পুরুষকারবাদীদিগকে ও অদৃষ্টবাদী বলিতে হইবে। কেননা অধিকাংশ স্থানেই তাঁহারা কোন্ কারণে কি কার্য্য হয় তাহা জানিতে পারেন না। তাহাই জানিবার চেষ্টা হইতে বিজ্ঞান, দর্শনের সৃষ্টি ও উন্নতি। যাঁহারা ললাট লিপি স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেও দৈব বা অদৃষ্টবাদী বলা যাইতে পারে না। কেননা তাঁহারা বলেন যে, মানব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ চেষ্টা করে, বিধাতা তদনুরূপ কার্য্য ফল তাহাদের ললাটে লিখিয়া দেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে ও মানব চেষ্টা কার্য্য সাধনের একমাত্র কারণ। অতএব কি দৈব, কি পুরুষকারবাদী, কি অদৃষ্ট কি দৃষ্টবাদী সকলেরই মূলমত এই যে মনুষ্য চেষ্টাই কার্য্যসাধনের একমাত্র কারণ। তুমি

কার্য্যকর ফল পাইবে, না কর পাইবেনা। অনেকের অর্থাৎ স্পষ্ট পুরুষকারবাদী দিগের ইহার প্রতি এত দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহারা বলেন, "হয়না একথা আমরা স্বীকার করি না। মানব যাহা চেষ্টা করিবে তাহাই পাইবে। সাধিলেই সিদ্ধি।"

তবে কি দৈববাদী কেহ নাই? আছে।

"জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি।
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ॥
ত্বয়া হৃষী-কেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোস্মি, তথা করোমি॥"

ভগবদ্গীতার এই শ্লোকের অর্থ এই যে মনুষ্য চেষ্টা কিছুই নহে, ঈশ্বর যাহা করান, তাহাই মানব করে। সুতরাং এইরূপ মতবাদীদিগকেই প্রকৃত দৈববাদী বলিতে হয়। পুরুষকারবাদীদিগের মতের সহিত ইঁহাদের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু এ মতের সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে অগ্রে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝা আবশ্যক। কিন্তু তাহা এত দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য যে তাহার আলোচনা করিতে হইলে তাহারও মীমাংসা হইবেনা, উপস্থিত বিষয়ের ও মীমাংসা হইবে না। মানবতত্ত্ব পাঠ করিলে একথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। জড় ও চৈতন্যের যেরূপ প্রভেদ, ঐ মতদ্বয়ের অর্থাৎ পুরুষকার ও দৈববাদের ও সেইরূপ প্রভেদ। অর্থাৎ যেমন কেহ বলেন, এই বিশ্ব কেবল চৈতন্যময়, জড় কিছুই নহে এবং কেহ বলেন বিশ্ব জড়ময়, চৈতন্য কল্পনা মাত্র; সেইরূপ কেহ বলেন যে মানব চেষ্টাই কার্য্যের একমাত্র কারণ, দৈব কিছুই নহে এবং কেহ বলেন দৈবই কার্য্য সকলের উৎপাদক,—মানব চেষ্টা উপলক্ষণ মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদ যেমন সুকঠিন, দৈববাদের সমালোচন ও তদ্রূপ অর্থাৎ উভয়ই আমাদের অনায়ত্ত। এই জন্য আমরা ঈশ্বরের সহিত দৈববাদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পুরুষকার বাদের আলোচনা করিব। অর্থাৎ মানব চেষ্টাই কার্য্যের একমাত্র কারণ কিনা, তাহার বৈজ্ঞানিক বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

সর্ব্ব প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই, যদি চেষ্টা করিলেই কার্য্য হয়, তবে হয় না কেন? সকলেই ত চেষ্টা করিতেছে, তবে সকলে ধনী, পণ্ডিত, বীর ও সুখী হয় না কেন? ইহার উত্তরে পুরুষকারবাদী বলিবেন যে, যেরূপ চেষ্টা করিলে, ঐ সকল ফল লাভ হইতে পারে, সেরূপ চেষ্টা হয় না বলিয়াই ঐ সকল ফল লাভ হয় না। যদি তাঁহাদিগকে এমন সহস্র উদাহরণ দেখাইয়া দেওয়া যায় যে, কেহ সামান্য চেষ্টা করিয়া ঐ সকল ফল লাভ করিয়াছে ও কেহ বহুতর চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন যে যাহারা বহু চেষ্টা করিয়া ফল পায় নাই, তাহাদের চেষ্টার পরিমাণ অধিক বটে, কিন্তু বুঝিতে না পারায় তাহাদের চেষ্টা ভ্রান্তি-সংকুল হইয়াছে, এবং যাহারা সামান্য বা বিনা চেষ্টায় ফললাভ করি-

য়াছে বোধ হইতেছে, তাহাদের চেষ্টার গভীরতা বুঝিতে পারা যায় নাই বলিয়া অল্প বা নিশ্চেষ্টা বোধ হইয়াছে। এই কারণে আমরা অধিক উদাহরণ দিলাম না—নচেৎ আমরা পুরুষকারবাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, উত্তরাধিকার ক্রমে বা পোষ্যপুত্র স্বরূপে অতুল ধন পাইয়া যে ধনী হইয়াছে, তাহার ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা কোথায়? সুরূপ ও সুকণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া যে লোকের প্রিয় হইয়াছে, তাহার প্রিয় হইবার চেষ্টা কোথায়? ইংলণ্ডে জন্মিয়া যে স্বাধীন ও ভারতে জন্মিয়া যে পরাধীন হইয়াছে, তাহার স্বাধীন বা পরাধীন হইবার চেষ্টা কোথায়? এবং হঠাৎ বজ্রাঘাতে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মৃত্যুর কারণ দুশ্চেষ্টা কোথায়? এরূপ শত সহস্র প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। পুরুষকারবাদীদিগের সে সকলের উত্তর করিবার আদৌ উপায় নাই। কিন্তু না থাকিলে কি হয়, মানুষ এরূপ সংস্কারান্ধ যে কিছুতেই সংস্কার ছাড়িতে চায় না। সুতরাং অন্ততঃ মনে মনেও বলিবে যে ঐ সকলের কারণ আমরা বুঝিতে পারি নাই, ক্রমে বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা উহা বুঝিব। এই জন্য উক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া আমরা অন্য পথে চলিবার চেষ্টা করিব।

পুরুষকার বাদীরা বলেন, মনুষ্যচেষ্টাই মনুষ্যের কার্য্যের একমাত্র বা মূল কারণ। তর্ক করিলে তাঁহারা অনেক সময়ে এ দিক ও দিক হেলেন বটে, কিন্তু কাহারও উন্নতি কি অবনতি দেখিলে বলিয়া থাকেন, তাহাদের চেষ্টা হইতে উহা হইয়াছে; অর্থাৎ যে সুচেষ্টা করিয়াছে তাহার উন্নতি হইয়াছে, আর যে সুচেষ্টা করে নাই-অর্থাৎ হয় আদৌ চেষ্টা করে নাই, অথবা যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে বা বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে,—তাহার অবনতি হইয়াছে। তাঁহারা ঐ সংস্কার বশতঃ ইয়ুরোপীয় দিগকে উন্নত ও ভারতীয় দিগকে অবনত দেখিয়া, ইয়ুরোপীয়দিগের পুরুষকার ও কার্য্য প্রণালীর প্রশংসা ও ভারতীয়দিগের পুরষকার ও কার্য্য প্রণালীর নিন্দা করেন। কিন্তু হে পুরুষকার বাদিন্! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি বাস্তবিকই পুরুষকারকে কার্য্যের একমাত্র কারণ বলেন? তাহা যদি বলেন, তাহা হইলে আপনার অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে। আর যদি আপনি পুরুষকারকে মূল কারণ বলেন, তাহা হইলেও আপনার ভ্রম সামান্য নহে। কেননা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কালিদাস ও সেক্সপীয়র কবিতা লিখিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বোনাপার্টি ও সেকন্দর বীর হইতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কোপারনিকস্ ও নিউটন যেরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট যেরূপ ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন;

পৃথিবীতে আর কি কেহ সেরূপ করে নাই? ইহার উত্তরে আপনি বলিবেন, অবশ্যই করে নাই, করিলে তাহাদের ন্যায় ফল ও লাভ করিত। যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন চেষ্টা করে নাই? তাহা হইলে আপনি ঐ প্রশ্নকে উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। আচ্ছা, যদি জিজ্ঞাসা করি, বৃটন আজি যেরূপ উন্নত, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে তাহা অপেক্ষা অনেক অবনত ছিল, এবং দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহার নিতান্ত মন্দ অবস্থা ছিল—ইহার কারণ কি এবং এক্ষণে ভারতীয়গণ পতিত ও দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত উন্নত ছিল, ইহারই বা কারণকি? ইহারও উত্তরে আপনি কি বলিবেন যে, বৃটন জাতি পূর্ব্বে চেষ্টা করে নাই, এক্ষণে চেষ্টা করিতেছে এবং ভারতীয়গণ পূর্ব্বে চেষ্টা করিত, এক্ষণে করে না? যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,–যাহারা পূর্ব্বে চেষ্টা করিত, তাহারা এক্ষণে চেষ্টা করেনা কেন? এবং যাহারা পূর্ব্বে চেষ্টা করিত না, তাহারা এক্ষণে চেষ্টা করে কেন, তাহা হইলে আপনি তাহার কি উত্তর দিবেন? বোধ হয়, ইহার সন্তোষজনক উত্তর আপনি দিতে পারিবেন না।

মনুষ্যচেষ্টা, মনুষ্যকৃত কার্য্যের একটী কারণ সত্য, কিন্তু উহা কি সম্পূর্ণ কারণ? না উহাকে মূল কারণ বলা যায়? আমরা বোধ করি, উহার কিছুই উহাকে বলা যায় না। কেননা আমাদের কার্য্য সকল যদি কেবল মাত্র আমাদের চেষ্টা দ্বারা হইত, তাহা হইলে অবশ্য মানব চেষ্টা, মানবকৃত কার্য্যের একমাত্র কারণ বলা যাইত। তাহা কি হয়? কথনই না। কেননা তাহা হইলে মানব যাহা চেষ্টা করিত,তাহাই করিতে পারিত এবং প্রত্যেক মনুষ্যই, অন্ততঃ অধিকাংশই, সমান ফল লাভ করিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেছে না। ইচ্ছা করিয়া বা বুদ্ধি ভ্রংশ বশতঃ চেষ্টা করে না বলিলে প্রকৃত উত্তর হয় না। কারণ চেষ্টাই যখন সিদ্ধির এক মাত্র কারণ, তখন ঐ চেষ্টা দ্বারা ভ্রান্তি ও অনিচ্ছা দূর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন মানব-চেষ্টাকে একমাত্র কারণ কি প্রকারে বলিব? উহাকে মূল কারণও বলা যাইতে পারে না কেননা মূল কারণ কাহাকে বলে? যে কারণের অভাবে কার্য্য আদৌ হয় না, তাহাকে কি মূল কারণ বলিব? অথবা কেবল মাত্র যে কারণ বলে কার্য্য সম্পন্ন হয়, শুদ্ধ সহকারী কারণাভাবে যাহার সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য হয় না,–তাহাকে কি মূল কারণ বলিব? যদি মূল কারণের প্রথমোক্ত লক্ষণ ঠিক্ হয়, এবং সেজন্য মানব চেষ্টাকে যদি মূল কারণ বলিতে হয়, তবে অন্যান্য কারণ সকলকেও মূল কারণ বলিতে হইবে। কেননা কেবল মাত্র মানবচেষ্টায় কার্য্য হয় না, ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে যে সকল সহকারী কারণের অভাবে

কার্য্য সম্পন্ন হয় না স্বীকার করা যায়, তাহাদিগকেও মূল কারণ বলিতে হইবে। কেননা তাহাদের অভাব হইলে আদৌ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সুতরাং কারণের মূলও সহকারী ভেদ থাকেনা—কারণই মূল কারণ হইয়া পড়ে। যদি দ্বিতীয় লক্ষণকে মূল কারণের প্রকৃত লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে মূল কারণ ও একমাত্র কারণের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। উদাহরণ লইয়া এই সকলের সত্যতা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।—বৃক্ষের কারণ বীজ। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে? যদি মৃত্তিকা, রস, তাপ, আলোক প্রভৃতির সহিত বীজ মিলিত না হয়, তাহা হইলে কি একমাত্র বীজ বৃক্ষ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়? তাহা যদি না হয়, তবে বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ কি প্রকারে বলিব? ঐরূপে বীজকে বৃক্ষের মূল কারণ ও বলা যাইতে পারে না। কেননা যদি বীজকে বৃক্ষের মূল কারণ বলিতে হয়, তবে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি যে সকল পদার্থের অভাবে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তাহাদিগকেও মূল কারণ বলা উচিত। কিন্তু তাহা হইলে আর মূল কারণের প্রধান্য থাকিল কৈ? ইহাতে অনেকে এই আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি মূল কারণের এরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে মূল কারণ শব্দটী অভিধান হইতে উঠাইয়া দিতে হয়। আমরা বলি, সে কথা ভ্রান্তি পূর্ণ। আর যদিও তাহা সত্য হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? ভাষায় একটি শব্দ রাখিবার জন্য কি সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিতে হইবে? তুমি অক্সিজানকে জলের মূল কারণ বলিবে? না হাইড্রোজানকে জলের মূল কারণ বলিবে? তুমি পীত বর্ণকে হরিৎ বর্ণের মূল কারণ বলিবে, না নীল বর্ণকে উহার মূল কারণ বলিবে? হিঙ্গুলের মূল কারণ পারদ না গন্ধক? পুত্রের মূল কারণ শুক্র না শোণিত? অবশ্য তুমি ঐ সকল পদার্থের উৎপাদক কোনও একটী পদার্থকে মূল কারণ বলিতে পারিবে না। হয় উহাদের প্রত্যেক উপাদানকে মূল কারণ বলিবে, নয় উহাদের একটীকেও মূল কারণ বলিবে না। অবশ্য বলিতে হইবে, উহাদের যথারীতি সংযোগই ঐ সকল পদার্থ উৎপাদনের মূল বা একমাত্র কারণ। কিন্তু যেমন তেমন ভাবে সংযুক্ত হইলেই পদার্থ সকল উৎপন্ন হয় না। অক্সিজন্ ও হাইড্রোজন্ মিলিত হইলেই জল হয় না, পারদ ও গন্ধক মিলিত হইলেই হিঙ্গুল জন্মে না এবং শুক্র ও শোণিত একত্রিত হইলেই সন্তান জন্মে না। উপাদান পদার্থের পরিমাণ যথানিয়মিত হওয়া চাই এবং সংযোগ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট মত হওয়া চাই, তবে যুক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইবে। সুতরাং কোন পদার্থের কারণ বলিতে হইলে ঐ পদার্থের উপাদান পদার্থ সকল, তাহাদের যথাযোগ্য পরিমাণ, আবশ্যক মত মিশ্রণক্রিয়া

ও মিশ্রণকার্য্যের কাল,—এই সমস্তের সমবায়কে কারণ বলিতে হইবে। ঐ সকলই ঐ পদার্থের একমাত্র কারণ ও মূল কারণ। উহার একটীকে, কি একটী ভিন্ন সমস্তকে, একমাত্র কারণ বা মূল কারণ বলিলে ভ্রান্তি হয়, তাহাতে আর কথা কি? এক গাছি সূত্রকে বস্ত্র বলিলে যেরূপ ভ্রান্তি হয়, তাহাতে তদপেক্ষাও অধিক ভ্রান্তি হয়। তবে কি মূল কারণ শব্দের প্রয়োগ স্থল নাই? অবশ্য আছে। মনে কর, এক মুষ্টি ধান্য, মুদ্গ, সর্ষপ, তিল প্রভৃতির বীজ এক স্থানে বপন করা হইল; মৃত্তিকা, জল, তাপাদি পদার্থ সকল বীজ সমান রূপ প্রাপ্ত হইল; তথাপি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ বা তৃণ উৎপন্ন হইল। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এরূপ ভিন্নতার কারণ কি? তাহা হইলে বলিতে হইবে, বীজ বিভিন্নতাই ইহার কারণ বা মূল কারণ। সর্ষপ বৃক্ষ ও ধান্য বৃক্ষের যে প্রভেদ, তাহার মূল কারণ বীজের বিভিন্নতা।

বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ বলা যে কত অসঙ্গত, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। বট বীজের পরিমাণ কত অল্প—এবং সুবৃহৎ বট বৃক্ষের পরিমাণই বা কত অধিক? এক রতির কম পদার্থ কিরূপে সহস্রাদিক মণ পদার্থে পরিণত হইল? তিন্তিড়ী বীজে অম্লত্ব ও খর্জ্জুর বীজে স্বাদুতা কোথায় এবং আম্র বীজেই বা নানাবিধ আস্বাদন কি প্রকারে রহিয়াছে? সেগুণ কাষ্ঠের শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ়তা এবং শিশু কাষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিনত্ব, কি বীজেই নিহিত আছে? অতি ক্ষুদ্র বীজ যখন অতি বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট, নানা প্রকার আকার ও বর্ণবান, বহুবিধ আস্বাদসম্পন্ন ও কঠিন, এবং কোমল, মসৃণ প্রভৃতি বহু গুণযুক্ত হইতেছে দেখা যাইতেছে,—তখন কি প্রকারে বলিব, ঐ বীজই ঐ সকলের কারণ? অবশ্যই বলিতে হইবে যে পৃথিবীস্থ বহুতর পদার্থ বীজ সহ মিলিত হইয়াই ঐরূপ বহুগুণ সম্পন্ন হইতেছে। তাহাতে বীজের প্রাধান্য কোথায়? যখন হিঙ্গুল উৎপাদক পারদ ও গন্ধকের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না, তখন কি প্রকারে বীজ ও অন্য উপকরণ মধ্যে বীজের প্রাধান্য কল্পিত হইবে? তবে এক কথা এই যে, যখন দেখা যাইতেছে, এক রসাদি পদার্থ সর্ষপ ও বট বীজ রূপ ভিন্ন পদার্থের মধ্যগত হওয়াতেই, সর্ষপ ও বট বৃক্ষ রূপ ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতেছে, তখন বীজের প্রধান্য নাই, বলিব কি প্রকারে? কিন্তু আমরা বলি, এ যুক্তি সারবান নহে। কেননা, যাহার সহিত যাহার যেরূপ রাসায়নিক সম্বন্ধ, সেই পদার্থের যোগে সেইরূপ শক্তি বা কার্য্য প্রকাশ হইবে। তাহা বলিয়া উপাদান পদার্থ মধ্যে একের প্রাধান্য হইতে পারে না। কেনন তাহা হইলে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। মনেকর, নীল পীতের

সহিত মিশ্রণে হরিৎ এবং রক্তবর্ণের সংযোগে পাটল বর্ণ হয়। হরিৎ ও পাটলবর্ণ উৎপন্ন হইবার কারণ নীল উভয়েই আছে,—অপর উপকরণের মিল নাই। তাহা বলিয়া কি পীতকে হরিতের ও রক্তকে পাটলের মূল কারণ বলিব? তাহা যদি বলা না যায়, তবে সর্ষপ ও বট বৃক্ষের মূল কারণ সর্ষপ ও বট বীজ বলা যাইতে পারে না। কেননা ঐ উভয় বিধ পদার্থের উৎপাদক স্বরূপে রসাদি নিয়ত বর্ত্তমান আছে, কেবল অপর উপকরণের প্রভেদ মাত্র। নীলের এমত শক্তি আছে যে, পীত যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহারা এরূপ ভাবে মিলিত হইবে যে,তাহাতে হরিৎ হইতেই হইবে, এবং যখন রক্ত তাহাতে মিলিত হইবে, তখন তাহাতে পাটল হইতেই হইবে। অথবা পীতের এরূপ শক্তি আছে, যে নীল যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাতে হরিৎ হইবে এবং রক্ত বর্ণের এরূপ শক্তি আছে যে নীল যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাতে পাটলবর্ণ হইবে। ঐরূপ রসাদির এরূপ শক্তি আছে যে সর্ষপ বীজ যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাতে সর্ষপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, এবং বট বীজ যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাকে বটবৃক্ষ হইতে হইবে। অথবা সর্ষপ বীজের এমন শক্তি আছে, যে যখন রসাদি তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাতে সর্ষপ বৃক্ষ জন্মিবে এবং বট বীজের এমন শক্তি অছে যে যখন রসাদি তাহাতে মিলিত হইবে, তখন বট বৃক্ষ জন্মিবে। সুতরাং বীজের বা রসাদির প্রাধান্য কোথায়? যদি প্রাধান্য কল্পনা করিতে হয়, তবে সংযোগেরই প্রাধান্য বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাও বলা যায় না—কেননা আমরা দেখিতেছি, সংযোগের প্রকার ভেদে যুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ ভিন্নতা হইতেছে। দুগ্ধের সহিত অম্ল সম্মিলনে দধি ও ছানারূপ দ্বিবিধ পদার্থ জন্মিতেছে। দধি ও ছানা আকার, আস্বাদন ও উপকারিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এত বিভিন্ন, যে উহারা একই উপাদানে প্রস্তুত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের উপাদান সম্পূর্ণ এক। উভয় পদার্থই দুগ্ধ ও অম্ল সংযোগে উৎপন্ন। ঐরূপ আম্র বীজ হইতে সুবৃহৎ ও সুস্বাদু ফজলী ও নেংড়া প্রভৃতি আম্র জন্মিতেছে, আবার অতি ক্ষুদ্র ও ভয়ানক টক আম্র ও জন্মিতেছে। কি প্রকারে বলিব যে বীজই ফজলীর উৎকৃষ্টতার হেতু ও বীজই আবার মন্দ আম্রের অপকৃষ্টতার কারণ? অথবা সংযোগই উহাদের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতার কারণ? একস্থানে একবিধ বীজ একই প্রকার যত্ন সহকারে রোপিত ও পালিত হইয়া যখন উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট আম্রফল উৎপাদন করিতেছে এবং একবিধ দুগ্ধ, একবিধ অম্ল সংযোগে

দধি ও ছানারূপ ভিন্ন পদার্থে পরিণত হইতেছে, তখন কি প্রকারে বলিব যে উপাদান পদার্থের সংযোগ মাত্রই কার্য্যের কারণ? আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যে পদার্থ যে পদার্থের সহিত যে পরিমাণে যেরূপ ভাবে সংযুক্ত হইলে যেরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে, পদার্থের সেইরূপ হওয়াই সেই পদার্থ উৎপত্তির একমাত্র কারণ। উহার একটী বা একটী ভিন্ন সমস্তকে কারণ বলিলে সম্পূর্ণ ভ্রম হইবে। তবে তুমি বলিতে পার যে, রসাদি পদার্থের সহিত যোগে আম্রত্বের কারণ আম্র, বটত্বের কারণ বট ও সর্ষপত্বের কারণ সর্ষপ। ইহা কখন বলিতে পার না যে সর্ষপত্বের কারণ বা মূল কারণ সর্ষপবীজ ও বটত্বের কারণ বা মূল কারণ বটবীজ।

যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল যে যাহা উৎপন্ন হইতে যে যে পদার্থের যেরূপ সম্মিলন আবশ্যক, তাহার সত্ত্বাই তাহার কারণ,—তাহার অসত্বে তাহা হইতে পারে না। কি ভৌতিক পদার্থ, কি উদ্ভিদ্, কি কীট কি পতঙ্গ, কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য সকলেরই ঐ এক নিয়ম। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির কারণ যে কেবল উহাদের বীজ বা শুক্র, তাহা নহে। রসাদি অর্থাৎ শোণিতের যথানির্দ্দিষ্ট প্রকার মিলনই ঐ সকলের একমাত্র কারণ। সুতরাং যে জীব যেরূপ ভাবে যে কার্য্য সাধনক্ষম হইয়া উৎপন্ন, তাহা দ্বারা তদিতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য গুটীপোকা যেরূপ সূত্র নির্ম্মাণ ও লাক্ষাকীট যেরূপ লাক্ষা প্রস্তুত করিতে পারে, অন্য কীট তাহা পারে না। সিংহ, ব্যাঘ্র যেরূপ পশু সংহার করিতে পারে, মেষ, ছাগ সেরূপ পারে না। মানব যেরূপ বুদ্ধির কার্য্য করিতে পারে, অন্য জীবে তেমন পারে না। মেহগনির যেরূপ সুদৃঢ় কাষ্ঠ, সেগুণের সেরূপ হইতে পারে না; এবং সেগুণের কাষ্ঠের দ্বারা যেরূপ পোতাদি নির্ম্মিত হইতে পারে, আম্র কাষ্ঠে সেরূপ হইতে পারে না। যে গাভী যে পরিমাণ দুগ্ধবতী হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার অধিক দুগ্ধ দিবে না; যে মানব যেরূপ বুদ্ধি, বল, দৃঢ়তা প্রভৃতি লইয়া জন্মিয়াছে, সে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করিতে পারে না।

পুরুষকারবাদী এক কথায় হয় ত এই সকল কথা উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন, মানুষের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না—কেননা মানুষের চেষ্টা আছে, অপরের তাহা নাই। এ কথা যদি বলা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। কেননা চেষ্টা সকল জীবের ও সকল পদার্থেরই আছে। চেষ্টা ব্যতিরেকে কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। এ জগতে কোন্ জীব চেষ্টা শূন্য? সকল জন্তুই জীবিকা অর্জ্জন, স্ত্রীলাভ, জীবনরক্ষা ও বিরামলাভ জন্য নিয়ত সচেষ্ট। সিংহ, ব্যাঘ্র যেরূপ প্রাণী-

হিংসা জন্য কৌশল অবলম্বন করে; ছাগ, মেষ সেইরূপ উদ্যানস্থ বৃক্ষ, লতাদি ভক্ষণ করিবার জন্য চতুরতা প্রকাশ করে। জীবিকা অর্জ্জন ও আত্মরক্ষা জন্য সামান্য কীটগণ যে কৌশল অবলম্বনকরে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মশক ও ছারপোকা মনুষ্যকে কষ্ট দিয়া যেরূপ কৌশলে মনুষ্য শোণিত পান করে, তাহা কি আশ্চর্য্যজনক নহে? মক্ষিকাগণ নিয়ত মনুষ্যকে বিরক্ত করিতেছে, অথচ মনুষ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারিতেছেনা। এতদ্ভিন্ন, বাঁবর, বাবুই, মধুমক্ষিকা, পুত্তিকা প্রভৃতি জীবগণের চেষ্টায় কত প্রকার আশ্চর্য্য সুকৌশলসম্পন্ন শিল্প সমুদ্ভূত হইতেছে। এই সমস্তকে যদি চেষ্টা না বলিতে হয়, তবে মানব চেষ্টাকে কিরূপে চেষ্টা বলিতে পারা যায়? মানবের চেষ্টা কি ঐ সকল হইতে ভিন্ন প্রকৃতির? কখনই নহে। অপর জীবগণের ন্যায় মানবও জীবিকা অর্জ্জন, স্ত্রীলাভ, বিশ্রাম-সুখ-সম্ভোগ ও প্রাণ রক্ষার জন্য নিয়ত চেষ্টান্বিত। সন্তান পালন, দরিদ্রে দয়া, স্বজাতি বৎসলতা, ও ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি কতকগুলি চেষ্টা মানবের স্থূল দৃষ্টিতে অতিরিক্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সে সকল অতিরিক্ত নহে। আমরা প্রবন্ধান্তরে সে বিষয় আলোচনা করিব। এক্ষণে আমরা তর্কের জন্য স্বীকার করিলাম, মানবের ঐ সকল চেষ্টা অন্যজীবাতিরিক্ত। কিন্তু তাহাতে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার কারণ কিছুই নাই। কেননা যে জীবের যেরূপ চেষ্টা প্রাকৃতিক, সে জীব সেই রূপই চেষ্টা করিবে। সকল জীব সকল প্রকার চেষ্টা করেনা। আহার জন্য ব্যাঘ্র যেরূপ চেষ্টা করে, মেষ ও সেই রূপ চেষ্টা করে। কিন্তু মেষ কি ব্যাঘ্রের অনুবর্ত্তন করিতে পারে, না ব্যাঘ্র মেষের অনুবর্ত্তন করিতে পারে? কাকাতুয়া, টীয়া, ময়না, প্রভৃতি পক্ষী মনুষ্যের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু কাক, কোকিল কি তাহাপারে? হস্তী, অশ্ব, কুকুর, ও গো প্রভৃতি মনুষ্যের অধীন হইয়া মনুষ্যের কার্য্যে আইসে; সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা—কি সেরূপ মানবের অধীনতা স্বীকার করে? ঐরূপ, মানবও যে প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকৃতি অনুসারে চেষ্টা করে। মানবের প্রকৃতি বা শক্তির অতিরিক্ত চেষ্টা মানবের দ্বারা হইতে পারেনা। সুতরাং কেবল মানবের চেষ্টা আছে, অন্য জীবের নাই, একথা নিতান্ত অসঙ্গত। তাহা যদি হইল, তবে মানবচেষ্টা দ্বারা বিশ্বনিয়মের ব্যভিচার হইবে কেন? তাহা যদি হয়, তবে সকল জীবের চেষ্টা দ্বারাই হইবে। তাহা হইলে মেষের চেষ্টায় সিংহের কার্য্য হইবে, সিংহের চেষ্টায় বানরের কার্য্য হইবে এবং বানরের চেষ্টায় মানবের কার্য্য হইবে। তাহা না হইয়া, যদি কেবল মানবের চেষ্টাতেই দেবতার কার্য্য হইবে

বলা যায়, তাহা হইলে মানবচেষ্টাকে কুহকিনী সর্ব্বসাধিনী শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয় এবং তাহা হইলে মানবচেষ্টা দ্বারা অসাধ্য সকল সাধিত হয়, বলিতে হয়। তাহা হইলে মানব-চেষ্টা করিলে মৃত্তিকাকে স্বর্ণ করিতে পারিত, অগ্নিকে জল এবং জলকে অগ্নি করিতে পারিত, এবং জীবকে অজীব ও অজীবকে জীব করিতে পারিত। ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন মানব চেষ্টা দ্বারা যে ঐ সকল সাধন করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? হয়ত কালে মানব বিজ্ঞান বলে ঐ সকল সাধন করিতে পারিবে। কিন্তু আমরা বলি যদি কালে মানব ঐ সকল সম্পন্ন করিতে পারে, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তৎ-সমুদায় মানবচেষ্টা দ্বারাই সম্পন্ন বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ সকল পদার্থ যে সব পদার্থের সহিত যোগে বা যে প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সেই পদার্থে পরিণত হইবার শক্তি ধারণ করে, তাহা অবগত হইয়াই মানব তাহা সম্পন্ন করিবে। চেষ্টাই তৎপ্রতি কারণ হইতে পারে না। কেননা যদি কোনও প্রকার সংযোগে উক্ত পদার্থ সমূহের সেই সেই পদার্থে পরিণত হইবার শক্তি না থাকে, তবে সহস্র চেষ্টা দ্বারা উহা সাধিত হইবে না। প্রাকৃতিক শক্তিই সকলের মূল। সুতরাং যে মানবে যে শক্তি নাই, সে তাহা কি প্রকারে অর্জ্জন করিবে? যাহার কবিত্ব শক্তি নাই, সে কিরূপে কবি হইবে? যাহার শরীরে বল নাই, সে কিরূপে বীর হইবে? যাহার দয়া নাই, সে কিরূপে পরহিতব্রতী হইবে? এক্ষণে কথা এই যে, তবে কি যাহার যে শক্তি আছে, সে চেষ্টা না করিলেও সেই শক্তির ফল লাভ করিবে? তাহা হইতে পারে না। কেননা আমরা বলিয়াছি, কার্য্য উৎপাদনের উপকরণ সকলের একটীর অভাব হইলেই কার্য্য উৎপন্ন হইবে না; সুতরাং চেষ্টা যখন কার্য্যের উৎপাদনে একতর উপাদান, তখন তদ-ভাবে কিরূপে কার্য্য সিদ্ধ হইবে? অধিক কি, শক্তি ও চেষ্টা মিলিত হইলেও কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কেননা কার্য্য সম্পাদনের আরও অনেক উপাদান আছে। সে সকলের মিলনও আবশ্যক। মনে কর, তোমার উত্তম বুদ্ধি আছে, ঐ বুদ্ধিবলে তুমি একজন জগন্মান্য পণ্ডিত হইতে পার। কিন্তু তোমার ধন নাই, কিম্বা তুমি চিররোগী অথবা তুমি এমন স্থানে বাস করিতেছ যেখানে বিদ্যার আদৌ আদর, বা শিখিবার কোন উপায় নাই। তুমি কিরূপে পণ্ডিত হইবে? তোমার যন্ত্র নির্ম্মাণে কৌশল অধিকআছে, কিন্তু তাহা নির্ম্মাণ করিতে যে সকল উদ্যোগের আবশ্যক তাহা সংঘটন সামর্থ্য তোমার কিছু মাত্র নাই। তুমি কিরূপে আত্ম-শক্তি প্রকাশ করিবে? তুমি সচ্চরিত্র সাধু, কিন্তু তুমি এমন

অযথা প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত, যে তোমার সদনুষ্ঠান সকল নিয়ত বিপরীত ফল প্রসব করিতেছে, তুমি কিরূপে সাধু হইবে? তুমি বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন,—চেষ্টা করিলে তুমি বিলক্ষণ সুখী হইতে পার; কিন্তু তোমার পরিবারবর্গ, তোমার আত্মীয় স্বজন, স্বতঃপরতঃ তাহার প্রতিকূল, কাজেই তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে। তুমি দূরদেশে উপার্জ্জনের জন্য যাইবে—কিন্তু তোমার বৃদ্ধা মাতার পীড়া হইল, যাওয়া হইল না। যেমন তাঁহা আরাম হইল, অমনি তোমার ভ্রাতা বৃথা দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বাটীতে কাহাকে অভিভাবক রাখিয়া যাই, এই ভাবিয়া যাইতে পারিলে না। যেমন তাহার কোন সুযোগ করিলে, অমনি একজন প্রতিবেশী তোমার নামে একটী মিথ্যা মকদ্দমা করিল। এই প্রকারে প্রতিপদে তোমার কার্য্যের বিঘ্ন জন্মাইয়া দিয়া তোমাকে নিরাশ ও অবশেষে বিপদগ্রস্ত করিল। সংসারে এরূপ নিয়ত শত শত ব্যক্তির কার্য্যবিঘ্ন ঘটিতেছে। কেবল এই সকল নহে। আরও অনেক কারণ আছে। সেই জন্যই নিউটন, আর্য্যভট্ট, কালিদাস, সেক্সপিয়র, বুদ্ধ, ঈশা, অর্জ্জুন, বোনাপার্টির যত উন্নতি হইয়াছিল, অন্যের সেরূপ হয় নাই। তাঁহাদের ন্যায় শক্তি যে আর কেহ পায় নাই, তাহা নহে। শক্তির সহিত যে সকলের সমবায় আবশ্যক, তাহা না হওয়াতেই তদ্রূপ বা তদধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মনেকর, আর্য্যভট্ট যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষা অধিকশক্তিসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্যভট্ট যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক, তাহা তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, তাঁহারা কিছু করিতে পারেন নাই। ঐ আর্য্যভট্ট কিম্বা ভাস্করাচার্য্য যদি এখন জন্ম পরিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আধুনিক যন্ত্র সমূহ ও জ্যোতিস্তত্ত্ব সহায়ে যে কত উন্নতি করিতে পারিতেন, তাহার ইয়ত্তা কি? এই জন্য কাল একটী প্রধান উপাদান। আবার দেখ, মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামীর পূর্ব্বপুরুষ, একজন ইংরেজ গভর্ণরকে আশ্রয় দিয়া কত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যদি মুসলমানরাজ ঐ গভর্ণরকে বিপদগ্রস্ত না করিতেন, আর যদি গভর্ণর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে ত রামকান্ত আশ্রয় দানের অবসর পাইতেন না এবং এরূপ উন্নত হইতে পারিতেন না। এ প্রকার অবসর অন্যের ঘটিলে সেও কি এইরূপ লাভবান হইত না? অবশ্য হইত। অতএব ঘটনার প্রাচুর্য্য কার্য্যের একটী কারণ। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, কত কাপুরুষ রাজা নির্ব্বিবাদে ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের ন্যায়

প্রবল পরাক্রান্ত বীর, স্বীয় রাজ্যচ্যুত ও হত হইলেন। সে সময়ে ছলনাতৎপর, বিশ্বাসঘাতক যবন যদি ভারতে আসিয়া প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে তাঁহার কি সে দশা ঘটিত? প্রতাপসিংহ যেরূপ পরাক্রমী, তেজীয়ান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার সময়ে যদি আকবরের ন্যায় সম্রাট্ ভারতে না থাকিতেন, তাহা হইলে কি তিনি ভারতেশ্বর হইতে পারিতেন না? কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, তিনি নিজ রাজ্য পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে পারিলেন না। অথচ অনেক দেশে ও অনেক সময়ে তাঁহা অপেক্ষা হীনতেজ ব্যক্তি দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন। সুতরাং অবস্থাও একটী কার্য্যের কারণ। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে কার্য্য সাধনের উপাদান অনেক। কোনও একটী কারণে কার্য্য হইতে পারে না। শস্য উৎপন্ন করিতে হইলে ভূমির উর্ব্বরতা, কর্ষণের আধিক্যতা, বর্ষণ, তাপ ও আলোকাদির প্রাচুর্য্য এবং পুষ্ট বীজ ও বপন যোগ্য কালের উপর নির্ভর করিতে হয়। কার্য্য মাত্রেরই এই নিয়ম। অর্থাৎ যে কার্য্যসাধন করিতে হইলে যে যে উপায় আবশ্যক, তৎসমস্তের পরিমাণের উপর কার্য্যে সফলতা নির্ভর করে। চেষ্টা করিলেই যেমন তুমি ইচ্ছামত শস্য উৎপাদন করিতে পার না, সেইরূপ চেষ্টা করিলেই তুমি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু চেষ্টা যখন একটী কারণ, তখন চেষ্টা ভিন্ন কোন কার্য্য সাধন হয় না। এই জন্যই পুরুষকারবাদীরা বলেন যে, চেষ্টাই কার্য্যের একমাত্র কারণ। দৈববাদীরা দেখিলেন, চেষ্টা ভিন্ন কার্য্যের অন্য কারণ সমস্ত মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে, —সে সমস্তই দৈবের উপর নির্ভর করিতেছে। এবং সে সকলের সমবায় ব্যতিরেকে যখন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন, দৈবই কর্য্যের একমাত্র কারণ। তাঁহারা ভাবিলেন, যে মহাশক্তি এই সকল দৈবকারণ মিলিত করিয়া দেয়, সেই মহাশক্তিই মানব চেষ্টাকেও তাহার সহিত মিলিত করিবে, অর্থাৎ মানব চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। দৈববলের অধীন হইয়া সে চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। এই জন্য তাঁহারা দৈবকেই কার্য্যের একমাত্র কারণ বলেন। কিন্তু আমরা সেরূপ বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি যে, দৈবশক্তি আমাদিগকে চেষ্টা করিতে বাধ্য করিবে, বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়,—আমাদের নিত্য চেষ্টা করা উচিত। আমাদের যাহা সাধ্যায়ত্ত, তাহা আমরা করিব। তাহার সহিত দৈব মিলিত হয়, কার্য্য সম্পন্ন হইবে; না হয়, হইবে না। এই জন্য মহাজনে বলিয়াছেন—

"যত্নে কৃতে ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

এক্ষণে পুরুষকারবাদীগণ বলিতে পারেন, যখন আমরা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলাম না—যখন আমাদিগকে চেষ্টা করিতেই হইবে—তখন

এত তর্কের প্রয়োজন কি? আমরা বলি, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেননা চেষ্টা করিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইব, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যদি আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই,—যদি আমরা দেশ, কাল, অবস্থা, শক্তি আদির বিষয় বিবেচনা না করি—তাহা হইলে আমাদের পদে পদে বিপদ উপস্থিত হয়। তাহা হইলে একজন মূর্খ, দুর্ব্বল, নির্ধন, নিঃসহায় মুটে ও রাজা হইবার চেষ্টা করিয়া জীবন হারাইতে পারে। উহা না বুঝিয়া অনেক ব্যক্তি অসম্ভব আশার বশবর্ত্তী হইয়া চিরকালের জন্য দুঃখ পাইয়াছে। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে হইবে,—যে কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছি,তাহা সাধন করিতে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমস্ত একত্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে, তবেই তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, নচেৎ নহে। এই জন্যই কবিবর মাঘ বলিয়াছেনঃ—

"নালম্বতে দৈষ্টিকতাং
ন নিষীদতি পৌরুষে।
শব্দার্থৌ সৎকবিরিব
দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে॥"

শিশুপাল বধ ২য় সর্গ ৮৬।

সৎ কবি যেমন শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, পণ্ডিত সেইরূপ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই অবলম্বন করেন। অর্থাৎ অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল শব্দাড়ম্বর করিলে অথবা শব্দ সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে যেমন উত্তম রচনা হয় না—ফলতঃ উত্তম শ্লোক রচনা করিতে হইলে শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক,—সেইরূপ কার্য্য সম্পাদন সময়ে কেবল মাত্র দৈব বা কেবল মাত্র পুরুষকারের উপর নির্ভর করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইবেনা। ঐ উভয়ের প্রতি নির্ভর করিতে পারিলেই চেষ্টিত কার্য্যের ফললাভ হইতে পারে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

নব বর্ষ।

(টেনিসনের অনুকরণ।)

ঐ বাজে হোরা প্রভাত-নিশিতে,
বৎসর ফুরায় তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে ফিরে চেয়ে
অতীতে মিশিতে যায়!

জয়া মধুঋতু, তরু শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা-থর ;—
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
নূতনে আদরে ধর।

ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দেও,
বাজে সুখ-হোরা, আনি আত্রঝারা
নূতনে ডাকিয়ে নেও ;
গত-আয়ু প্রায় গতবর্ষ যায়,
যাক্—দেও গত হতে ;
হৃদয়-মন্দিরে অসতে নিবারি
পূজহ আদরে সতে।

ঐ বাজে হোরা ঘুচাতে সে জরা
মানস যাহাতে জরে,
অবনী ভিতরে নিরখিলে ফিরে
হৃদিপুষ্প যাহে ঝরে!
হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন-
কলহ করহ দূর্,
ধরণীর শেল্ দৌরাত্ম্য-আচার
ভাঙিয়ে করহ চূর্।

বাজে সুখ-হোরা, অসুখের ভরা
ডুবায়ে অতীত-নীরে—
মৃতকল্প, হত পুরাগত যত
কুরঙ্গে মানব ফিরে,
পুরাগত যত কটু মতামত
কু-আচার আদি পালে—

ঘুচায়ে সে সব　　আনি অভিনব
ডুবায়ে অতীত কালে ;
ধর সাধুতর　　সু-আচার আরো,
জটিল কুবিধি হর ;—
পুরাতনে সরা,　　ঐ বাজে হোরা,
নবীনে আদরে ধর।

ঐ বাজে হোরা,　　কুচিন্তা-পসরা
ভাসা রে কালের জলে,
অনাটনতাপ,　　কলুষকলাপ,
ত্যজ অলীকৃতা ছলে ;
সুখে বাজে হোরা,　　ধরা হতে সরা
এ মম দুঃখের গীতি,
মধুপূর্ণ সুধী　　নবীন গায়কে
ডাকিয়ে কর অতিথি।

হোরা বাজে ধর,　　পদদর্প হর,
কুলস্পর্দ্ধা কর ছেদ,
সত্যে গেঁথে ডোর্　　স্বত্বেরে পালিতে
শিখহ নবীন বেদ,
ধরণীর বিষ্　　হর হিংসা দ্বেষ,
পর দুঃখে কর খেদ ;
ঐ বাজে হোরা,　　পুরাতনে সরা
ঘুচায়ে অবনি-ক্লেদ।

বাজে সুখ-হোরা,　　কালে ঢেলে দেও
কদর্য্য রোগের কায়া,
ক্ষুদ্র ধনতৃষা　　ধরা মাঝে নাশি
কৃপণে শিখাও হায়া।

সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ-
উত্তাপে ধরণী জরা,
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।

ঐ বাজে হোরা, হৃদিবীর্য্য-ধরা
অভয় পরাণী যেবা,
স্বভাবে উদার দয়ার শরীর
কর রে তাদেরই সেবা;
পৃথিবী-আঁধার ঘুচায়ে আবার
জলুক্ তরুণ ভাতি,
নরকুল তায় সুধর্ম্ম-প্রভায়
পোহাক্ বিঘোরা রাতি।

প্রভাত নিশিতে, ঐ বাজে হোরা
বিগত বৎসর যায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে ফিরে চেয়ে
অতীত-কোলে মিশায়!
ভরা মধু-ঋতু, তরু শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা-থর;—
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
নূতনে আদরে ধর।

মনোরমা।

শরতের জ্যোৎস্নালোকে যদি কমলিনী প্রস্ফুটিত হইত, সেই শোভাময়ী রজনীকালে যদি ভ্রমরী গুঞ্জরিত, তবে আমি একদা মৃণালিনীর শোভা দেখাইতে পারিতাম। মৃণালিনীর জ্যোৎস্নালোকে কেমন মনোরমা ফুটিয়াছে, বরণে বরণে কেমন মিশাইয়া গিয়াছে, অথচ পদ্মিনী কেমন হৃদয়-কন্দর রাগ-রঞ্জিত, সুরভি-আমোদিত করিয়া পবিত্র শ্বেত বরণে ঢল ঢল করিতেছে, আর ঐ সরসীর চারিপার্শ্বে গিরিজায়া কেমন আমোদে মত্ত হইয়া পঞ্চমে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে, এ দৃশ্য যিনি দেখিতে চান, তিনি মৃণালিনী দেখুন। যে দৃশ্য প্রকৃতিতে নাই, তাহা কাব্যসৃষ্টিতে দুর্লভ নহে। কবি এক মুহূর্ত্তে এক অপূর্ব্ব রমণীয় রাজ্য দেখাইতে পারেন।

যে মাধুরীতে মৃণালিনীর সৃষ্টি, মনোরমাতেও সে মাধুরী আছে। যে দৃঢ় পতি-অনুরাগে মৃণালিনী সর্ব্বত্যাগিনী, সেই দৃঢ় পতি-অনুরাগে মনোরমা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মৃণালিনী পতির জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, এক ধ্রুবতারার প্রতি চাহিয়া তিনি সকল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, মনোরমা একদৃষ্টে স্থির নক্ষত্রের মত সেই ধ্রুবতারার প্রতি চাহিয়াছিলেন। এই জন্য বলিয়াছি, বরণে বরণে মিশাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মৃণালিনী এক পতি-অনুরাগেই বৃহৎ। তাঁহার পতি-অনুরাগের বৃহৎ রঞ্জন সমস্ত গ্রন্থ-ভূমিকে রঞ্জিত করিয়াছে। সেই অনুরাগ-ভাসিত সরসীক্ষেত্রে ক্রমে এক কমলিনী ফুটিল। পতি-অনুরাগ তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি নহে, তিনি শুদ্ধ এক রূপে সুন্দরী নহেন। তাঁহার হৃদয়কন্দরে অনেক সৌন্দর্য্য ও পরিমল নিহিত আছে। আর গিরিজায়া, মত্ত গিরিজায়া, গাও তুমি আনন্দের গীত গাইয়া চারিদিকে নৃত্য করিয়া বেড়াও, তোমার মন কিছুতেই নিরানন্দ হইবার নহে।

মৃণালিনীর গ্রন্থ-ভূমিতে মনোরমাই প্রধান চিত্র। এই মনোরমার সকল সৌন্দর্য্য বিকাশের জন্য গ্রন্থের অপরাপর চিত্রের অবতারণা। মৃণালিনী মনোরমার ছায়াপাত করিয়াছেন, গিরিজায়া মৃণালিনী ও মনোরমা চিত্রের পার্শ্বালঙ্কার। পশুপতি, মনোরমার হেমচন্দ্র। কিন্তু হেমচন্দ্র মৃণালিনীর হৃদয়দল যত না বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন, মনোরমার হৃদ-

পদ্মের শতদলকে ততোধিক বিকশিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঠিক্ বুঝিতে পারিনা গ্রন্থমধ্যে হেমচন্দ্রের প্রয়োজন মৃণালিনীর জন্য, কি মনোরমার জন্য অধিক। মৃণালিনীর চিত্ত হেমচন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরমার চিত্ত তিনি পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

মনোরমা আঁকিবার পূর্ব্বে কবিকে অনেক গুলি চিত্র আঁকিতে হইয়াছে। কবি তৎপূর্ব্বে অগ্রে চপলা বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার সরল চিত্রে কল্পনাকে চমকিত করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার স্মৃতি যখনও সতেজ রহিয়াছে, সেই স্মৃতিকে প্রভাসিত করিয়া মনোরমা দেখা দিলেন। আমরা সেই বনবাসিনী সরলা সাহসিনীকে একদা নিশাকালে বাপীকূলে চন্দ্রালোকে চকিতের ন্যায় চিনিতে পারিলাম। চিনিতে পারিলাম, যেন পুনর্জ্জীবিতা কপালকুণ্ডল, সেই নিভৃত বনদেশে, দীর্ঘিকার সর্ব্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া, শ্বেতবসনা অবেণী-সম্বদ্ধ-কুন্তলা, কেশ জালে স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল হৃদয় সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া, ঘোর নিশীথে অসঙ্কুচিতচিত্তে বসিয়া আছেন। কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বকার স্মৃতি সহসা একদিন এইস্থলে প্রভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা তখন মনোরমাতে কপালকুণ্ডলার সেই চিত্ত চাপল্য, সেই সরল সাহস, সেই অদম্য বন্যভাব দেখিতে পাইলাম। কপালকুণ্ডলা আর একবার আমাদিগের কল্পনাকে চমকিত করিলেন।

কিন্তু কপালকুণ্ডলার ন্যায় মনোরমা শুদ্ধ কল্পনাকে চমকিত করেন নাই। কপালকুণ্ডলা কবির কাল্পনিক সুন্দরী, মনোরমা শুদ্ধ তাহাই নহে। তিনি এই মৃণ্ময় পৃথিবীর প্রকৃত রমণী। কপালকুণ্ডলা কল্পনার বিহঙ্গিণী; মনোরমা সংসারের সারভূতা মনোমোহিণী রমণীরত্ন। কিন্তু প্রকৃত রমণী বলিলে মনোরমার রমণীয়তা থাকে না। যিনি কবি তিনি প্রকৃত জীবনকে অনুরূপ চিত্রিত করেন না। প্রকৃত জীবনের যে চিত্র কবির মনে প্রতিবিম্বিত হয়, কবি সেই চিত্র অঙ্কিত করেন। প্রকৃতি স্বাভাবিক সুন্দরী বটে, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে তাহার সমৃদ্ধির উদ্দামতায়, তাহার কাঠিন্যের রূঢ়তায় অপনীত হইয়া যায়। কোন স্বচ্ছ সরোবরের নির্ম্মল জলরাশিতে যখন প্রকৃতির সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সেই প্রতিবিম্বিত চিত্রে প্রকৃতি সুন্দরী অধিকতর রমণীয় বেশে প্রতীত হইতে থাকেন। এইরূপ প্রতিবিম্বিত সৌন্দর্য্যে মনোরমা চিত্রিত। কপালকুণ্ডলা যেন মানস-সরোবরের সুবর্ণ কমলিনী, মনোরমা সেই সুবর্ণ কমলিনীর প্রতিবিম্বিত চিত্র; শুদ্ধ তাহাই নহে, সেই মানস-সরোবর-তীরবাসিনী প্রকৃতি সুন্দরীর প্রতিবিম্বিত চিত্র। সে প্রতিবিম্বে প্রকৃতির রূঢ়তা

কিছুই নাই, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য সকলই প্রতিফলিত হইয়াছে।

কিগুণে তবে কাল্পনিক সুন্দরী প্রকৃত রমণী চিত্র হইলেন, কিগুণে কপালকুণ্ডলা মনোরমা হইলেন? যেগুণে কপালকুণ্ডলা মনোরমা হইয়াছেন, তাহা মনোরমার সৌকুমার্য্য, মনোরমার সুন্দর সুকোমল হৃদয়। যে সৌকুমার্য্যে, যে কোমলতায় আয়েষা সুন্দরী, মনোরমায় তাহার অভাব নাই। কবি মনোরমাকে আঁকিবার পূর্ব্বে আয়েষার সরল সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। যেমন কপালকুণ্ডলার সরল সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, তেমনি আয়েষার সরল সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। আয়েষা পূর্ব্বেই মনোরমার ছায়াপাত করিয়াছেন। আমরা যেমন মনোরমাতে কপালকুণ্ডলার বন্য সরলতা দেখিতে পাই, তেমনি একদা হেমচন্দ্রের পার্শ্বে তাহাকে আয়েষা রূপেও দেখিতে পাই। আয়েষা যেন পুনর্জ্জীবিতা হইয়া আহত হেমচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত আছেন, হেমচন্দ্রকে বিপুল ধনরাশি দান করিতেছেন, হেমচন্দ্রের মনোবেদনায় শান্তি বারি দিয়া সেই বেদনা অপনীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং সর্ব্বশেষে প্রকৃতির কোমলতায় এবং প্রেমের প্রচুরতায় একদা পশুপতির চিতায় আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

এ সমস্তই আয়েষা; কিন্তু মনোরমার সৌন্দর্য্য শুদ্ধ এই খানেই নিঃশেষিত হয় নাই। কপালকুণ্ডলা এবং আয়েষা যেমন মনোরমার ছায়াপাত করিয়াছেন, মনোরমাও তেমনি আর এক ভবিষ্য-সুন্দরীর ছায়াপাত করিয়াছেন। সে সুন্দরী নিডিয়ার ছায়া—রজনী। রজনীর হৃদয়-কোমলতায় সত্যের বিমল জ্যোতিঃ যেমনি আপনাপনি অনুভূত হইত, সেই রূপ প্রতিভা একদা আমরা মনোরমায় দেখিয়াছি। মনোরমায় একদিন আমরা এক চমৎকার সুন্দরীর ছায়া দেখিয়াছি। যে দিন মনোরমা "আমি ত উন্মাদিনী" রূপে হেমচন্দ্রের সহিত কথা বার্ত্তায় প্রেমের ও মানব-মনের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল একে একে বাহির করিতেছিলেন, সেইদিন আমরা অনুভব করিতেছিলাম, যেন তাহার সরল হৃদয়াকাশে সেই সত্য সকলের বিমল জ্যোতিঃ আপনাপনি প্রতিভাত হইতেছিল। মনোরমার হৃদয়-কোমলতায় সেই গূঢ় তত্ত্ব সকল আপনি উদিত হইতেছিল। যেন সন্ধ্যাগগনে তারাবলি আপনাপনি ফুটিতেছিল। হেমচন্দ্র যেমন সেই দিন বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "আমি ইহাকে একদিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম", আমরাও ভাবিলাম এত উন্মাদিনী নহে,—ইনি প্রতিভারূপিণী! উন্মাদিনী, প্রতিভারই সহচরী। যে প্রতিভায় বালিকা একদিন হেমচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রতিভায় তিনি চতুর পশুপতিকেও আর একদিন নিরুত্তর করিয়াছিলেন। যে রাত্রে পশুপতি আপন ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন——অপূর্ব্ব-দর্শন!

জীবনময়ী প্রতিমা-রূপিনী তরুণী দাঁড়াইয়া আছে,—যেদিন পশুপতি সেই মোহিনী মূর্ত্তিকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন,—সেইদিন মোহিনী যে সকল কথায় পশুপতিকে অপ্রতিভ এবং অবশেষে কাঁদাইয়া ছিলেন,সেই কথাবার্ত্তায় মনোরমা আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মনোরমায় এই তিন সরল সৌন্দর্য্য মিশ্রিত হইয়াছে। যে সরল সৌন্দর্য্য বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার মাধুরী, যে হৃদয়-সৌকুমার্য্য আয়েষার অমূল্য সম্পত্তি, যে প্রতিভা রজনীর বিশেষ সৌন্দর্য্য, সেই বন্যভাব, সেই হৃদয়-মাধুরী, সেই প্রতিভালোক মনোরমার ভূষণ। কিন্তু মনোরমার প্রকৃতিতে একটী বিশেষ ভাব আছে। কপালকুণ্ডলা যে নারী হৃদয়ের ঈষদাভাস দেন, মনোরমায় যেমন সেই নারী হৃদয়ের সৌন্দর্য্য পূর্ণবিকশিত হইয়াছে, কপালকুণ্ডলার চপল প্রকৃতির পূর্ণমাত্রা ও তেমনি মনোরমা প্রাপ্ত হইয়াছেন;—এতদূর, যে, ইহাতে সেই কুসুম-নির্ম্মিতাকে দেখিয়া একদিন সন্দেহ হয়, একি অলৌকিক সরলা বালিকা, না উন্মাদিনী? আমাদিগের স্মরণ হয়,আমরা কুপার-অঙ্কিত বালক জবের চরিতে এক দিনমনোরমার আদর্শ দেখিয়াছি*। এই আদর্শে মনোরমার প্রকৃতি-বিশেষ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই প্রকৃতি-বিশেষ পশুপতি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"মনোরমার দুইমূর্ত্তি—একমূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা,—যে মূর্ত্তিতে পশুপতির হৃদয় শীতল হইত। আর একমূর্ত্তি,—গম্ভীরা তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী—সে মূর্ত্তি দেখিলে পশুপতি ভীত হইতেন।" মনোরমার এই প্রকৃতি-বিশেষ হেমচন্দ্রও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমরা এই প্রকৃতি-বিশেষের আদর্শ কুপার-অঙ্কিত জবে দেখিয়াছি। মনোরমার চাপল্য এই দুই প্রকৃতি-বিশেষেও দেখা দিত। তিনি বহুরূপিনীর ন্যায় কখন আনন্দময়ী হইতেন, কখন গম্ভীরা হইতেন; কখন সরলতায় মোহিত করিতেন, কখন প্রখর বুদ্ধিশীলতায় চমকিত করিতেন, কখন তেজস্বিতায় পশুপতিকে কাঁদাইয়া দিতেন, আবার আয়েষার মত তৎক্ষণাৎ মৃদুতায় গলিয়া সেই পশুপতিকে মধুর ভাবে সান্ত্বনা করিতেন।

যে সমস্ত কুসুম-সৌকুমার্য্যে মনোরমা নির্ম্মিতা, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। একদা দেবতারা যেমন সুরবালাগণের তিল তিল রূপ লইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনোরমা বঙ্কিম বাবুর সেইরূপ সৃষ্টি। আমরা মনোরমায় সকল সৌন্দর্য্য মিশ্রিত দেখি। মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, আয়েষা, রজনী, বিমলা, লবঙ্গলতা, কুপারের জব—এসমুদায়ই মনোরমার ছায়া এবং মনোরমাতে এ সমুদায়ই মিশ্রিত আছে। উঁহারা এক

* See the character of Job in "Lionel Lincoln" of J. Fenimore Cooper

একজন সরল সৌন্দর্য্যময় স্বতন্ত্র কুসুম ;—মনোরমা মিশ্রিত-সৌন্দর্য্য-কুসুম-স্তবক। যে শিল্প কৌশলে সরল সৌন্দর্য্য অঙ্কিত হয়, তাহা মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতিকে গড়িয়াছে,—এবং যে শিল্প চাতুরীতে মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নির্ম্মিত হয়, মনোরমা সেই শিল্পচাতুরীর পরিচয় *। মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি ভাস্করের শ্বেত প্রস্তরমূর্ত্তি, মনোরমা চিত্রকরের নানা রাগ-রঞ্জিত সৌন্দর্য্য †। আবার চিত্রকর যেমন কোন নদী তীর চিত্র করিতে বাসনা করিলে, সেই নদীর অনেক তীর দেশ ছাড়িয়া এমন এক স্থানে আসিয়া উপনীত হয়েন, যেখানে সেই তীরদেশের অনেক সৌন্দর্য্য এরূপে মিলিত রহিয়াছে যে, তাহার চিত্রপটে সকলেরই শোভা অতি সুন্দর ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে, সেই স্থান মনোনীত করিয়া চিত্রকর যেমন আপন চিত্র অঙ্কিত করেন, এবং সেই নদীতীরের সুন্দর শোভা দেখান, বঙ্কিম বাবু সেইরূপ এমত সৌন্দর্য্য সকল মিশাইয়াছেন, এবং এমত ভাবে মিশাইয়াছেন, যাহাতে তাহার চিত্র প্রকৃত জীবনের আলেখ্য রূপে প্রতীত হইয়াছে। মনোরমা এইরূপ শিল্প কৌশলের সৃষ্টি।

পূর্ণচন্দ্র বসু—

* The pure and the Ornate style.

† The Classical and the Romantic beauty.

দেবী চৌধুরাণী।

নবম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল —সাগরের সঙ্গে কথা কহেনা। দেখিল, দেবীর বজরায় পাল তুলিয়া, পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল,

"বজরা কোথায় গেল ?"

সাগর বলিল, "তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাহাকে ও বলে না।"

ব্র। দেবী কে ?

সা। দেবী দেবী।

ব্র। তোমার কে হয় ?

সা। ভগিনী।

ব্র। কি রকম ভগিনী?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা বজরার সঙ্গে যাইতে পার?" মাঝিরা বলিল, "সাধ্য কি? ও নক্ষত্রের মত ছুটিয়াছে।" ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বরের বজরা খুলিয়া চলিল।

সূর্য্যোদয় হইলে সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল।

"দেবী কি ডাকাতি করে?"

সা। তোমার কি বোধ হয়?

দেবী। ডাকাতির সামান ত সব দেখিলাম—ডাকাতি করিলে করিতে পারে, তাও দেখিলাম। তবু বিশ্বাস হয় না যে ডাকাতি করে।

আ। তবু কেন বিশ্বাস হয় না?

ব্র। কে জানে। ডাকাতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল।

সা। কেহ বলে দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে। কেহ বলে মাটীর ভিতর পোঁতা টাকা পাইয়াছে। কেহ বলে দেবী সোণা করিতে জানে।

ব্র। দেবী কি বলে?

সা। দেবী বলে এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্র। পরের ধন এত পাইল কোথায়?

সা। তা কি জানি।

ব্র। পরের ধন হলে অত আমিরী করে? পরে কিছু বলেনা?

সা। দেবী কিছু আমিরী করেনা। খুদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখ্‌লে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র,—কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ওকি?

সাগর, ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলের নূতন আঙ্গটি দেখাইল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্য্যাদা দিয়াছে।

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিল। সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল "ইহাতে দেবীচৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।"

ব্র। কই?

সা। ভিতরে—ফারসীতে।

ব্র। (পড়িয়া) এ কি এ? এযে আমার নাম—আমার আঙ্গটি? সাগর! তোমাকে আমার দিব্য যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা না কও। আমায় বল দেবী কি?

সা। তুমি চিনিতে পার নাই সে কি আমার দোষ! আমি ত একদণ্ডে চিনিয়াছিলাম।

ব্র। কে! কে! দেবি কে?

সা। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। সাগর

দেখিল, প্রথমে ব্রজেশ্বরের শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল, তারপর একটা অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন—উচ্ছলিত সুখের তরঙ্গ, শরীরে দেখা দিল। মুখ প্রভাময়, নয়ন উজ্জ্বল অথচ জলপ্লাবিত, দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্ত্তিময়। তারপরই আবার সাগর দেখিল, সব যেন নিবিয়া গেল। বড় ঘোরতর বিষাদ আসিয়া যেন সেই প্রভাময় কান্তি অধিকৃত করিল। ব্রজেশ্বর বাক্যশূন্য, স্পন্দশূন্য, নিমেষশূন্য। ক্রমে সাগরের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজেশ্বর চক্ষু মুদিল। দেহ অবসন্ন হইল; ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। সাগর কাতর হইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কিছুই উত্তর পাইল না। একবার কেবল ব্রজেশ্বর বলিল "প্রফুল্ল ডাকাত! ছি! আমি মরিলাম না কেন? প্রফুল্ল মরিল না কেন?"

দশম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া, দেবী চৌধুরাণী—হায়! কোথায় গেল দেবী চৌধুরাণী? কই সে বেশ ভুষা, ঢাকাই সাড়ী, সোণা দানা, হীরা মুক্তা পান্না—সব কোথায় গেল? দেবী সব ছাড়িয়াছ-সব একেবারে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। দেবী কেবল এক খানা গড়া পরিয়াছে—হাতে কেবল এক গাছা কড়। দেবী নৌকার এক পাশে বজরার শুধু তক্তার উপর একখান চট পাতিয়া শয়ন করিল। ঘুমাইল কি না জানি না।

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মত মোটা সাড়ী। কপাল ও বুক গঙ্গা-মৃত্তিকায় চর্চ্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল—তখন দেবীর যে সৌন্দর্য্য বাহির হইল, গত রাত্রের বেশভূষা, জাঁকজমক, হীরা, মতি, চাঁদনি বা রাণীগিরিতে তাহা দেখা যায় নাই। কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরাণীর মত দেখাইয়াছিল—আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মত দেখাই-তেছে। যে সুন্দর, সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন?

দেবী, এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেকদূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না আমরা কিছুমাত্র

অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময়ে সেদেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখন ও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন, যে ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইজ অব হেষ্টিংসকে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্ব্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্ব্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই "ভাল মানুষ" হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।

দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া ও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকা কে বলিল,

"দিবা, তুই এইখানে বস্। আমি আসিতেছি। এ বনে বাঘ ভালুক বড় অল্প। আসিলেও তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।" এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুরঙ্গ। পাতরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্ব্বকালে বোধ হয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কাল সহকারে চারিপাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে, মিট্ মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতে ছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাহার পূজা করিতেছিলেন। দেবী, শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিলেন। দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পূজা সমাপন পূর্ব্বক, আচমন করিয়া, দেবীর সঙ্গে কথপোকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা! কাল রাত্রে তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি ডাকাতি করিয়াছ নাকি?"

দেবী বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "কিজানি!" ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবানীঠাকুর।

দেবী বলিল, "কিজানি কি ঠাকুর? আপনি কি আমায় জানেন না? দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলেন, কি জানি?"

ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা

হইলে, এক দিনের তরে ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও একাজ মন্দ মনে কর না বোধ হয়—কেন না তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এতদিন ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয়, ত মহাপাতক কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সেকি? যা এতদিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে? যদি আমি এ সকল ডাকাতির ধনের এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমি ত জান, যে কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাতি করি। যে ধার্ম্মিক, যে সৎপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করে, যাহার ধনহানি হইলে ভরণপোষণের কষ্ট হইবে, আমি কি রঙ্গরাজ কখন তাহাদের এক পয়সাও লই নাই। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদেরই উপর ডাকাতি করি। ডাকাতি করিয়া এক পয়সা লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায় কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজ শাসন চালাইতেছি। তোমার নামে, আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। একি অধর্ম্ম?

দেবী। রাজা, রাণী যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন্—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপ করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে তোমার বশ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী—গুণে যথার্থ রাজরাণী। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে—কেননা তুমি সন্ন্যাসিনী, মার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মত রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাতনী বলিয়া জানে—এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কি? এ বরেন্দ্রভূমে আজ কালি কে এমন আছে যে এ নামে লজ্জিত? কিন্তু সে কথা যাক্—ধর্ম্মা-

চরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি? খ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না? আত্ম-বিসর্জ্জন হইল কৈ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়—আমার স্ত্রী বুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে তাই বলিতেছি—আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর হইতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

ভবানী। যদি ভাল লাগে না—তবে কালি রঙ্গরাজকে ডাকাতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন? কথা যে আমার অবিদিত নাই, তাহা বলা বেশীর ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই তবে অবশ্য এটাও জানেন, যে কাল রঙ্গরাজ ডাকাতি করে নাই—ডাকাতির ভান্ করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য?

ভ। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলেও নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল,

"তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ভ। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দে। কিছু দিবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ, ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভাল কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। থানকা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, "সে কি রকম?"

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরিবের বাগদী অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউর মা মরিয়া গেল।

দে। আর বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? আমরা পরহিত ব্রত নিয়েছি। যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই—কিন্তু সম্প্রতি অনেক গুলি লোক দারিদ্রগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে তাহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে।

শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবেনা। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দববার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে প্রচার করিয়াছি। সোম বার দিন অবধারিত করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবেনা—করিলে মারা পড়িবে। ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া, আজি বৈকুণ্ঠ পুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু, আর আমি একাজ করিব কিনা সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজ কে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ দিল,

"আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল—সেই খানে চল। বরকন্দাজ দিগের সম্বাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাইও—টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বজরার মাস্তুলের উপর তিন চারি খানা ছোট বড় সাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল; ছিপখানা বজরার সামনে আসিয়া বজরার সঙ্গে বাঁধা হইল। তাহাতে যাট জন জোয়ান বোটে লইয়া বসিয়া রাণীজী কি জয় বলিয়া, বাহিতে আরম্ভ করিল—সেই জাহাজের মত বজরা তখন তীর বেগে ছুটিল। এদিকে দেখা গেল বহু সংখ্যক পথিক বা হাটুরিয়া লোকের মত লোক, নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বজরার সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের হাতে কেবল এক এক লাঠি মাত্র—কিন্তু বজরার ভিতর বিস্তর ঢাল, সড়কী, বন্দুক আছে! ইহারা দেবীর "বরকন্দাজ" সৈন্য।

সব ঠিক দেখিয়া, দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালে গেল। হায়! দেবি—তোমার এ কিরূপ সন্ন্যাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সোমবারে, প্রাতঃসূর্য্য প্রভাসিত, নিবিড় কাননাভ্যন্তরে, দেবীরাণীর "দরবার" বা "এজলাস"। সে এজলাসে কোন মোকদ্দমা মামলা হইত না। রাজকার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমী সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে—কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিস্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার দাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদোয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর ভূমে বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর, একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা—তাহাতে ও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। কিন্তু সাড়ী পরা। সাড়ী খানায়, ফুলের মাঝে মাঝে এক এক খানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জল গৌরবর্ণ দেখাইতেছে। গলায় এত মতির হার, যে বুকের আর বস্ত্র পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালের প্রকৃত দেবী প্রতিমা মত সাজিয়াছে। এসব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া, বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক বরকন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচ শত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সারিদিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল সড়কী। চারিদিকে লাল নিশান পোতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশহাজার লোকে একবার "দেবী রাণী কিজয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তার পর দশজন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তার পর, সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক এক জন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসন সমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও

প্রণাম করিল—কেননা অনেকের বিশ্বাস ছিল, যে দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেই জন্য কেহ কখন তাঁহার সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেই রূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকা পোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া একপ্রহর রাত্র হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্য্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাতি এইরূপ—অন্য ডাকাতি নাই।

কিছু দিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুডলাড্ সাহেবের কাছে সম্বাদ পৌছিল, যে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল মধ্যে দেবীচৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমীয়তবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহা ও রটিল যে অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে —অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির্—বলে টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচ পত্র করিতে লাগিল —সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে দেবীচৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যথাকালে পিতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া, ব্রজেশ্বর তাঁর পাদ বন্দনা করিলেন। ব্রজেশ্বর মনে মনে স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন যে, এ ডাকাতির টাকা স্পর্শ করা হইবে না—"তাহা হইলে আমরা সেই পাপীয়সীর"—হায়! প্রফুল্ল এখন পাপীয়সী!—"পাপীয়সীর পাপের ভাগী হইব।" কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিই সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণ হইল।

হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল সম্বাদ কি? টাকার কি হইয়াছে।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, যে তাঁহার শ্বশুর

টাকা দিতে পারেন নাই। হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে টাকা পাও নাই?"

ব্রজেশ্বর যদি বলেন, যে "টাকা পাই নাই" তবে স্পষ্ট মিথ্যা কথা হয়। ব্রজেশ্বর যদি এ কালের ছেলে হইতেন, তবে ইংরেজী পড়িয়া "Lie direct" সম্বন্ধে এ স্থলে কি বিবেচনা করিতেন বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রজেশ্বর সে কেলে ছেলে—একটা "Lie direct" সম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আর যেখানে ব্রজেশ্বর মিথ্যা কথা বলিতে পারুক আর না পারুক, বাপের সম্মুখে নহে। মুখ দিয়া কখনও বাহির হয় নাই। ব্রজেশ্বর বলিতে পারিল না, টাকা পাই নাই। ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া, হরবল্লভ হতাশ্বাস হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, চুপ করিয়া থাকাও মিথ্যাবাদ হইতেছে। ব্রজেশ্বর টাকা আনিয়াছেন, অথচ তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরবল্লভ বুঝিতেছেন, যে ব্রজ টাকা আনে নাই। ব্রজেশ্বরের মোটা বুদ্ধিতে বোধ হইল যে আমি বাপকে প্রবঞ্চনা করিতেছি। আমার মার্জ্জিতবুদ্ধি, মার্জ্জিতরুচি, মার্জ্জিতপাদুক একেলে ইংরেজি নবিসের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধ হইত যে, "আমি ত মিছে কিছুই বলি নাই—যে টুকু বলিয়াছি, সাঁচা সত্য। তবে দেবীচৌধুরাণীর টাকার কথা আমি বলিতে বাধ্য নই—কেননা সে টাকা ত আনিবার কোন কথাও ছিল না, আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা হয় নাই। আর সে ডাকাতির টাকা—গ্রহণ করিলে পিতৃঠাকুর মহাশয় পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন, অতএব সে কথা প্রকাশ না করাই আমার ন্যায় বিশুদ্ধাত্মার কাজ। বিশেষ, আমার মুখ দিয়া ত মিথ্যা বাহির হয় নাই—তা বাবা কেন জেলে যান্‌না—আমি কি কর্‌ব?" ব্রজেশ্বর তত বিশুদ্ধাত্মা নয়—সে সেরকম ভাবিল না। তার বাপ মাথায় হাত দিয়া নীরব হইয়া বসিয়াছে—দেখিয়া তার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর আর থাকিতে পারিলেন না—বলিয়া ফেলিলেন,

"আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে কিন্তু আর একস্থানে টাকা পাইয়াছি—"

হরবল্লভ। পেয়েছ! তা, আমায় এতক্ষণে বল নাই? দুর্গা! বাঁচলাম!

ব্র। টাকাটা যে স্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কিনা বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তার নামটা মনে আসচে না—সেই যে মেয়ে ডাকাত একজন আছে?

হর। কে, দেবীচৌধুরাণী?

ব্র। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পাইলে কি প্রকারে?

ব্রজেশ্বরের সেই প্রাচীন নীতি শাস্ত্রে লেখে, যে এখানে বাপের কাছে একটু ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। ব্রজ বলিল,

"ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।"

হর। বদলোকের টাকা! লেখা পড়াটা কি রূপ হইয়াছে?

ব্র। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখা পড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশী খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিল,

"পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই, ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।"

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "টাকা নেবনা ত কি ফটকে যাব নাকি! টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা, পুণ্যের টাকা কি? আর,জগতপের টাকাই বা কার্ কাছে পাব? সে আপত্তি করে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে ডাকাতের টাকা, তাতে আবার লেখা পড়া করে নাই—ভয় হয়, পাছে দেরি হ'লে বাড়ী ঘর লুটপাট করিয়া লইয়া যায়।"

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

হর। তা, টাকার মিয়াদ কতদিন?

ব্র। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা, সে হলো ডাকাত। দেখা দেয়না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে,যে টাকা পাঠাইয়া দিব?

ব্র। ঐ দিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায়থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, "তা সেই দিন সেই থানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

ব্রজেশ্বর বিদায় হইলেন। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া, কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, "হাঃ সে বেটির আবার টাকা শোধ দিতে যাবে? বেটিকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পলটন শুদ্ধ তার বজরায় না উঠে—ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাঁকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবেনা।"

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন—ব্রজেশ্বর কে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এদিকে সাগর আসিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে গিয়া গল্প করিল যে, ব্রজেশ্বর, একটা রাজরাণীর বজরায় গিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে-সাগর অনেক মানা করিয়াছিল, তাহা শুনে নাই। মাগী জেতে কৈবর্ত্ত—আর তার দুইটা

বিবাহ আছে—সুতরাং ব্রজেশ্বরের জাতি গিয়াছে, সুতরাং সাগর আর ব্রজেশ্বরের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিবেনা, ইহা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী এ সকল কথা ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করায়, ব্রজেশ্বর অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, "রাণীজি জাত্যংশে ভাল—আমার পিতৃ-ঠাকুরের পিশী হয়। আর বিয়ে,—তা আমারও তিনটা, তারও তিনটা।"

ব্রহ্ম ঠাকুরাণী বুঝিল, কথাটা মিথ্যা; কিন্তু সাগরের মতলব যে ব্রহ্মঠাকুরাণী এ গল্পটা নয়নতারার কাছে করে। সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইলনা। নয়নতারা একে সাগরকে দেখিয়া জ্বলিয়া ছিল, আবার শুনিল, যে স্বামী একটা বুড়া কন্মে বিবাহ করিয়াছে। নয়নতারা একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং কিছু দিন ব্রজেশ্বর নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারিলেননা—সাগরের ইজারা মহল হইয়া রহিলেন।

সাগরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু নয়নতারা বড় গোল বাধাইল—শেষে গিন্নির কাছে গিয়া নালিশ করিল। গিন্নি বলিলেন, "তুমি বাছা পাগল মেয়ে। বামনের ছেলে কি কৈবর্ত্ত বিয়া করে গা? তোমাকে সবাই ক্ষেপায়, তুমিও ক্ষেপ।"

নয়ান বৌ তবু বুঝিল না। বলিল, "যদি সত্য সত্যই বিয়ে হয়ে থাকে?" গিন্নি বলিলেন, "যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ করে ঘরে তুলব। বেটার বৌ ত ফেলতে পারব না।"

এই সময়ে ব্রজেশ্বর আসিল, নয়ান বৌ অবগুণ্ঠন পলাইয়া গেল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,

"মা কি বল্‌ছিলে গা?"

গিন্নী বলিলেন, "এই বল্‌ছিলাম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস্, তবে আবার বৌ বরণ করে ঘরে তুলি।"

ব্রজেশ্বর অন্যমনা হইল, কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রদোষকালে গিন্নীঠাকুরাণী কর্ত্তা-মহাশয়কে বাতাস করিতে করিতে, ভক্তচরণে এই কথাটা নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার মনটা কি?"

গিন্নী। আমি ভাবি কি, যে সাগর বৌ ঘর করেনা। নয়ান বৌ, ছেলের যোগ্য বউ নয়। তা যদি একটি ভাল দেখে ব্রজ বিয়ে করে, সংসার ধর্ম্ম ক'রে আমার সুখ হয়।

কর্ত্তা। তা ছেলের যদি সেরকম মন বোঝ, তা আমায় বলিও। আমি ঘটক ডেকে ভাল দেখে সম্বন্ধ করব।

গিন্নী। আচ্ছা, আমি মন বুঝিয়া দেখিব।

মন বুঝিবার ভার, ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর উপর পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী, অনেক বিরহসন্তপ্ত, এবং বিবাহপ্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শুনাইলেন, কিন্তু ব্রজের মন তাহাতে কিছু বোঝা গেল না। তখন ব্রহ্মঠাকুরাণী স্পষ্ট জিজ্ঞাসা-বাদ আরম্ভ করিলেন। কিছুই খবর

পাইলেন না। ব্রজেশ্বর কেবল বলিল "বাপ মা যে আজ্ঞা করবেন, আমি তাই পালন করিব।"

কথাটার আর বড় উচ্য বাচ্য হইল না।

আমার দেবতা।

১

পৌষ মাস—বৃহৎ সূর্য্য মণ্ডল লাল হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। পর্ব্বত, নদ, নদী, গাছ, গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, ক্ষেত্র, পশু, পক্ষী, মনুষ্য—অনন্ত পৃথিবী সুমধুর সুকোমল ছায়া-মিশ্রিত সোণার রঙে রঞ্জিত। দূরে, উপরে—আকাশে কিছু ঘন ছায়া—যেন রাঙা মুখের উপর কৃষ্ণ কেশরাশি—যেন অনুরাগোৎফুল্ল প্রেমময়ীর বদনে সুমধুর সুগভীর বিষাদ রেখা। হর্ষ বিষাদের অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অভিব্যক্তি। পূর্ণ পুরুষের পূর্ণ মুর্ত্তি। আহা! পূর্ণ মুর্ত্তির কি শান্তিময়, কি কোমলতাময়, কি আনন্দময়, কি চিন্ময় গাম্ভীর্য্য!

সেই ম্রিয়মান সোণার পৃথিবীর উপর দিয়া, সেই গগনপ্রান্তঃস্থিত পরিবর্দ্ধনশীল ছায়ারাশির ছায়ায় একটু একটু মিশিয়া পাখী উড়িয়া যাইতেছে। ক্ষুৎপিপাসা মিটাইয়া পাখিগুলি যেন সেই শান্ত সোণার রঙের মতন সোণার টুকুরা—মনের সুখে ভাসিয়া যাইতেছে—কিন্তু ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে, যেন সেই গগনব্যাপী ছায়ার ভিতরে ছায়া, যেন সেই শান্ত, সুন্দর, সুগভীর ছায়ার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া রহিয়াছে।

এখন ঐ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ও ঐ শান্ত, সুন্দর, সুগভীর গগনব্যাপী ছায়ার প্রাণে আপনার শান্ত, সুন্দর, সুগভীর প্রাণ মিশাইয়া দিল। গভীর প্রাণে গভীর প্রাণ মিশিল—গভীর সমুদ্রে গভীর সমুদ্র মিশিল। তারে

সেই মিশ্রিত প্রাণরাশি বৃক্ষ, লতা, গৃহের উপরে ঢলিয়া পড়িল। স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী সেই শান্ত, সুগভীর,বিষণ্ণ প্রাণের শান্ত, সুকোমল নিশ্বাসে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। আমার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দুইটি গাভী আর একটি গোবৎস রোমন্থন করিতেছিল। কি জানি কেন, তাহারা রোমন্থনে বিরত হইয়া, যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছিলাম। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া গ্রন্থখানি রাখিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে উঠিলাম। যেমন দাঁড়াইলাম,অমনি আমার প্রাঙ্গণস্থিত অশোক বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্র খসিয়া পড়িল।

শুকাইলে সব খসিয়া পড়ে। তাই শুষ্ক অশোক পত্র খসিয়াপড়িল। কল্লোলিনীর কুলে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিব বলিয়া বাটীর বাহির হইলাম। বাটীর বাহিরে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। দেখিলাম,বটবৃক্ষের একটি কাঁচা পাতা খসিয়া পড়িল। দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম—এ কি! মনে হইল—এ জগৎ ভৌতিক। তখন ভৌতিক জগৎ ভুলিয়া জগদ্বন্ধুর ধ্যানে বসিলাম। ধ্যানান্তে শুষ্ক পত্র, কাঁচা পত্র কিছুই মনে নাই। গৃহে গেলাম। গৃহিণীবলিলেন—সন্ধ্যা করিতে এত রাত্রি তোমার কখনও হয় নাই। আমি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া ধ্যানমগ্নের ন্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম।

২

প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে পর গৃহিণী আমার পদধূলি লইতে আসিলেন। কিন্তু আজ তাঁহাকে কেমন এক রকম দেখিলাম—তাঁহার মুখ যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তাঁহার কোন পীড়া হয় নাই। তবে এই মাত্র বলিলেন যে, কাল রাত্রি হইতে আমাকে সব কেমন কেমন বোধ হইতেছে, যেন সব এলাইয়া পড়িতেছে, যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম বোধ হইয়াছিল তাহাও যেন কত নরম হইয়া পড়িয়াছে। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। দেখিলাম সর্ব্বত্র বৃক্ষের কাঁচা পাকা পাতা পড়িয়া রহিয়াছে, অনেকগুলি ছোট ছোট ডাল ও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দুই একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলকেই কিছু বিমর্ষ, কিছু বিস্ময়াপন্ন দেখিলাম—সকলেরই মুখ আমার গৃহিণীর মুখের মত ফুলো ফুলো।

সকলেরই যেন কিছু শ্বাস কষ্ট হইতেছে। সকলেই যেন আমাকে কিঞ্চিৎ কাতর ভাবে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। এক জন যাইতে যাইতে যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বসিয়া পড়িল, আর এক জন অতি কষ্টে তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেল।

৩

আমি ও কিছু বিস্মিত হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যা-বন্দনাদি করণার্থ নদীতীরে যাইতেছি। যাইতে যাইতে দেখিলাম, গাছের পাতা যেমন নিঃশব্দে পড়িয়া যায়, একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড শাখা তেমনি নিঃশব্দে খসিয়া পড়িয়া গেল। আমি আরো বিস্মিত হইয়া দেবাদিদেবকে ডাকিলাম। মনে সাহস হইল। নদীতীরে গিয়া দেখি কল্লোলিনীর কায়া কিছু শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ ভাবে সন্ধ্যা-বন্দনাদি আরম্ভ করিলাম। অকস্মাৎ একটা অতি কাতর কিন্তু অতি ক্ষীণ মর্ম্মভেদী স্বর শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি একটা গাভী নদীতে জল পান করিতে আসিয়া নদী সৈকতে ডুবিয়া যাইতেছে, গোপালক তাহাকে টানিয়া তুলিতে আপনি ও ডুবিয়া যাইতেছে। আমি দ্রুতপদে গমন করিলাম; কিন্তু যেমন তথায় পৌঁছিলাম, অমনি গাভী এবং গোপালক উভয়েই সৈকতে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সূর্য্যের রশ্মি তখন মলিন হইয়া উঠিয়াছে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

৪

পুনরায় আচমন করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিব বলিয়া নদীর জলে নামিলাম। জলে হাত দিলাম, কিন্তু হাতে জল লাগিল না। তখন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যেখানে আমার হাত সেখানে জল নাই, সেখানে একটা শূন্য কূপ—একটা অতলস্পর্শ শূন্য কূপ। সেই কূপের পার্শ্বে খানিকটা জল, তাহার পর সেই রকম আর একটা অতলস্পর্শ শূন্য কূপ। এই রূপে যত যাই, ততই দেখি খানিকটা জল আর এক একটা সেই রকম অতলস্পর্শ শূন্য কূপ—ঘোর অন্ধকার, কিন্তু ভিতর সমস্ত দেখা যায়, যতদূর দেখ দেখা যায়, দেখিয়া শেষ করা যায় না—স্বচ্ছ অতলস্পর্শ অন্ধকার! এমন সুন্দর ভীষণ অন্ধকার কখন দেখি নাই।

আচমন করিয়া ধ্যানে বসিলাম।

কিন্তু ধ্যানে আজ তাঁহাকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিলাম না। যত তাঁহার কাছে যাই, তত তিনি সরিয়া যান। বিষণ্ণ মনে উঠিয়া আসিলাম।

৫

সন্ধ্যা হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল। কিন্তু চাঁদের আজ আলো নাই। চাঁদ যেন রাহুগ্রস্ত। আকাশে নক্ষত্র নাই। সমস্ত আকাশ নীহার-ময়। নীহার মলিন ও ম্রিয়মান!

প্রভাত হইল। সাবিত্রীকে প্রণাম করিব বলিয়া মাথা তুলিলাম। দেখিলাম—সূর্য্যমণ্ডল অর্দ্ধেক আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে প্রাণ নাই, সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতি নাই। এমন নির্জ্জীব প্রভাত বিশ্বে বুঝি আর কখন হয় নাই!

ভাবিতে ভাবিতে আমার সেই কল্লোলিনীর কূলে গমন করিলাম। কল্লোলিনী শুকাইয়া রহিয়াছে। তাহার সেই স্বচ্ছ জীবনরাশি যেন ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সুন্দরীর শূন্য মলিন দেহ ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া আছে! আমার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল পড়িল। চক্ষু পরিষ্কার হইল। দেখিলাম—দূরে সে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ নাই। যেখানে গিরিশৃঙ্গ ছিল, সেখানে বিষণ্ণ নীহার-ময় আকাশ!

৬

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যমণ্ডল অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সেই অনন্তব্যাপী সূর্য্যমণ্ডল নিভিল! আরো নিভিল! আরো নিভিল! অনন্ত আকাশ হিম, আরো হিম, আরো হিম হইয়া উঠিল! অনন্ত আকাশ অন্ধকারময়, আরো অন্ধকারময়, আরো অন্ধকার-ময় হইল! অনন্ত দেশ শূন্য, আরো শূন্য, আরো শূন্য হইয়া গেল!

অনন্ত গভীর অনন্ত শূন্য অনন্ত অন্ধকার কণ্‌ কণ্‌ কণ্‌ কণ্‌ করিতে লাগিল।

৭

তখন দেখি—

সেই নীরব নিস্তব্ধ অনন্ত গম্ভীর অনন্ত শূন্য অনন্ত অন্ধকার ব্যাপিয়া একটা অন্ধকার সদৃশ অনন্তকায় পক্ষী অনন্তের অনন্তগাম্ভীর্য্য ভরাইয়া, অনন্ত শূন্য পূরাইয়া অনন্ত বৃহৎ স্বরে ডাকিতেছে—

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

আমার হৃৎকম্প হইল। কিন্তু সেই অনন্ত বৃহৎ স্বরের অনন্ত পূর্ণ-তায় মুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। ভয়ে কি মোহ! ভীষণ কি সুন্দর! পূর্ণ ভীষণতায় কি ভীম

সঙ্গীত! প্রলয়ের কি গভীর, কি ভয়ানক, কি গীতিময় প্রাণ!

আবার সেই অনন্ত শূন্য পূরাইয়া, সেই অনন্ত গাম্ভীর্য্য ভরাইয়া, সেই অনন্ত বৃহৎ স্বরে সেই অনন্তকায় পক্ষী—সেই অনন্ত-পক্ষ অনন্ত-চঞ্চু অনন্ত-দেহ ঘোর-কৃষ্ণ দাঁড় কাক—ডাকিল ঃ—

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

আমার হৃৎকম্প হইল। আমি মুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

৮

স্তম্ভিত হইয়া ধ্যানে বসিলাম। ধ্যানে কিছুই দেখিলাম না, কিছুই পাইলাম না, কেবল শুনিলাম সেই অনন্ত-ভরা অনন্ত-পোরা অনন্ত-দীর্ঘ, অনন্ত-প্রস্থ ডাক—

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

অনন্ত হিম অনন্ত অন্ধকারে অনন্ত-দীর্ঘ, অনন্ত-প্রস্থ, অনন্ত-পোরা, অনন্ত-ভরা ডাক—

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

৯

দুঃখে, বিস্ময়ে, রাগে আপনার আত্মাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহাও সুন্দর, কিন্তু ইহা অসার—এতকাল কি কেবল অসার সৌন্দর্য্য ধ্যান করিলাম? তখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলাম, সেই অনন্ত অন্ধকারে এক অপূর্ব্ব নীল আভা ফুটিয়াছে—আর দেখিলাম সেই অনন্তকায় ঘোর-কৃষ্ণ পক্ষী সেই নীলাভ অন্ধকারে একটু ডুবিয়াছে, তাহার সেই অনন্ত-ভরা ডাক একটু নামিয়াছে, একটু কমিয়াছে, একটু ডুবিয়াছে।

অনন্ত অন্ধকারের সেই নীল আভা একটু ঘন একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই ঘোর-কৃষ্ণ অনন্তকায় পক্ষী আরো একটু ডুবিল—অনন্তকায় পক্ষীর অনন্তভরা ডাক আরো একটু নামিল, আরো একটু কমিল, আরো একটু ডুবিল।

অনন্ত অন্ধকারের সেই নীল আভা যত ঘন, যত উজ্জ্বল হইতে লাগিল, সেই ঘোর-কৃষ্ণ অনন্তকায় পক্ষী তত ডুবিতে লাগিল—অনন্তকায় পক্ষীর অনন্তভরা ডাক তত নামিতে লাগিল, তত কমিতে লাগিল, তত ডুবিতে লাগিল। নামিয়া নামিয়া, কমিয়া কমিয়া, ডুবিয়া ডুবিয়া সেই অনন্ত-ভরা ডাক, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, ক্ষীণ-তর হইতে ক্ষীণতম হইয়া আসিল—যেন সেই ডাক তাহার অনন্তকায়া, অনন্তরাজ্য হারাইয়া অনন্তদূর হইতে আসিতে লাগিল।

সেই অনন্তদূর হইতে আগত অনন্তক্ষীণ ডাক শুনিয়া ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইল।

যে অনন্তকায় পক্ষীর সেই অনন্ত-ভরা ডাক, সে কি হইল, কোথায় গেল, বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাহার সেই অনন্তভরা ডাক এখন অনন্তক্ষীণ আকারে অনন্তদূর হইতে আসিতেছে দেখিয়া, ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইল। সেই অনন্তদূর হইতে আগত অনন্তক্ষীণ ডাকের ন্যায় ভীষণতায় অনন্তশক্তির ও হৃৎ-কম্প হয়। সে ভীষণতা ভীষণতা-ভরা। সে ভীষণতায় ভীষণতা বই কিছুই নাই!

১০

সেই অনন্ত অন্ধকার গভীর নীলি-মাময় হইল। তখন সেই অনন্তনীলিমা সমুদ্র এক অপূর্ব্ব নীলিমাময় আকার ধারণ করিল—দুই পদ, চারি বাহু, অনতিদীর্ঘ দেহ, অতুল মুখমণ্ডল, অনির্ব্বচনীয় কান্তি, চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিশিষ্ট আকার ধারণ করিল। আকার শান্ত, গম্ভীর, সংযত, সুকোমল। সেই অপূর্ব্ব নীলিমাময় অনতিদীর্ঘ দেহ সমস্ত দৃষ্টিপথ যুড়িয়া রহিয়াছে। আর সেই অনতিদীর্ঘ দেহের মধ্য হইতে, সেই ভীষণ অনন্ত-ক্ষীণ ক-অ-অ ক-অ-অ ধ্বনি নির্গত হইতেছে—বোধ হইতেছে যেন ধ্বনি অনন্ত যোজন দূর হইতে আসি-তেছে।

যেদিকে চাই, সেই দিকেই সেই অপূর্ব্ব নীলিমাময় অনতিদীর্ঘ পদ্ম-পলাশ-লোচন পুরুষ সমস্ত দৃষ্টিপথ যুড়িয়া রহিয়াছেন—তাঁহার অনতিদীর্ঘ দেহের মধ্য হইতে সেই ভীষণ অনন্তক্ষীণ ক-অ-অ ক-অ-অ ধ্বনি নির্গত হইতেছে,—বোধ হইতেছে যেন ধ্বনি অনন্ত যোজন দূরে উত্থিত হইতেছে।

সম্মুখে পশ্চাতে নীচে উপরে পার্শ্বে কেবলমাত্র সেই অপূর্ব্ব নীলি-মাময় নীলাভ অনতিদীর্ঘ পদ্মপলাশ-লোচন মহাপুরুষ অনন্ত দৃষ্টিপথ যুড়িয়া রহিয়াছেন—তাঁহার অনতি-দীর্ঘ দেহের মধ্য হইতে সেই ভীষণ অনন্তক্ষীণ ক-অ-অ ক-অ-অ ধ্বনি নির্গত হইতেছে—বোধ হইতেছে যেন যে ঘোরকৃষ্ণ অনন্তকায় পক্ষী সেই ক-অ-অ ক-অ-অ ধ্বনি করি-তেছে, সে সেই অনতিদীর্ঘ দেহের ভিতরে, কে বলিবে কোথায়, অনন্ত যোজন দূরে পড়িয়া আছে।

১১

ভয়ে, বিস্ময়ে, আহ্লাদে আপনাকে

আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি দেখিতেছি? ইহা ত প্রলয় নয়—যাঁহাকে দেখিতেছি, তাঁহার অনতিদীর্ঘ দেহের ভিতরে, কে বলিবে কোথায়, অনন্ত যোজন দূরে প্রলয় পড়িয়া রহিয়াছে। তবে এ কি দেখিতেছি?

তখন শুনিলাম, সেই অপূর্ব্ব নীলিমাময় নীলাভ অনতিদীর্ঘ অনন্তব্যাপী পদ্মপলাশলোচন মহাপুরুষ কণ্ঠস্বরে অনন্ত ভরাইয়া, অনন্ত পূরাইয়া, অনন্ত জাগাইয়া, অনন্ত কাঁপাইয়া, অনন্ত মাতাইয়া বলিলেন :—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

অমনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠিল—অমনি অনন্ত চরাচর নতশিরে সেই মহাপুরুষের স্তুতি গান করিতে আরম্ভ করিল। অনন্ত বিশ্ব আহ্লাদে ভাসিল দেখিয়া আমি ও আমার সেই কল্লোলিনীর কূলে যজ্ঞেশ্বরের ধ্যানে বসিলাম।

হিন্দু।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কৃষিপদ্ধতি অর্থাৎ কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বরাহ নগর নর্সরি হইতে শ্রীউমেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, বাগবাজার রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নবসারস্বত যন্ত্রে শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯০

কৃষিপদ্ধতির অগ্রহায়ণ ও পৌষ দুই সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। বেশ সহজ ভাষায় এ দেশের উপযোগী কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি লিখিত হইতেছে। আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে, “কৃষিপদ্ধতি” যদি উৎসাহ এবং যত্নাভাবে শীঘ্র না লুপ্ত হয়, তবে

ইহার দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারিবে। নমুনা স্বরূপ আমরা "পাপিয়ার চাষ ও সম্ভাবিত লাভ" শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পাপিয়া এদেশের ফল নহে। পাপিয়া নামক দ্বীপ হইতে উহা এ দেশে আনীত হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই ফলের তত আদর ছিল না, পরে নিজ গুণে ক্রমশঃ সর্ব্বত্রই আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ পাপিয়া অতি উত্তম ফল। ইহার চাষ প্রণালী অতি সহজ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও ইহার রীতি মত চাষ হইতে দেখি নাই। বাটীর আশ-পাশে বিনা যত্নে যে দুই চারিটী গাছ জন্মে, লোকে তাহারই ফল ভোগ করে এবং তাহাই বাজারে বিক্রয় হয়। যত্ন-পূর্ব্বক চাষ করিলে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক জেলায়, বিশেষ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষ করিলে প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য লাভ হওয়ার সম্ভব।

এক বৎসরের গাছেই প্রায় ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। তিন বৎসর পর্য্যন্ত গাছ সতেজ থাকে। গাছের প্রথম অবস্থায় ফল বড় হয়, পরে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আইসে। এক একটী পাপিয়া গাছের জন্য দীর্ঘে চারি হাত ও প্রস্থে চারি হাত পরিমিত স্থান আবশ্যক করিলেও এক বিঘা জমীতে চারি শত গাছ জন্মিতে পারে। এক একটী সতেজ গাছে দুই শতের ও অধিক ফল ধরিতে দেখা যায়। কিন্তু অযত্ননিবন্ধন অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে। এজন্য প্রতি-গাছ হইতে বৎসরে ২০।২৫ টীর অধিক পাকা ফল লাভ হওয়া ঘটে না। এই গাছের শিকড় অধিক মাটীর নীচে যায় না। ভাসা শিকড় হয় বলিয়া গোড়ার উপরের মাটী শুকাইয়া গেলেই রসের অভাবে গাছের পাতা কটাইয়া যায় এবং গাছ শীর্ণ হইতে থাকে। এই কারণেই অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে। যদি রীতিমত পাপিয়ার চাষ করিয়া শুকার সময় ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত জল সেচনের উপায় করা যায়, তাহা হইলে গাছ সতেজ থাকে, ফল বড় হয় ও ফল প্রায় ঝরিয়া পড়ে না। এইরূপ যত্ন করিলে এক এক গাছ হইতে বৎসরে শতাধিক পাকা পাপিয়া পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাজারে এক একটা বড় পাপিয়া সাত আট পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। পাকা পাপিয়ার গ্রাহক ও কম নহে। যদি প্রতি গাছে বৎসরে গড়ে পঞ্চাশটী করিয়াও পাকা ফল পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক ফল গড়ে দুই পয়সা হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহাতেও প্রতি বৎসর এক বিঘা জমীর উৎপন্ন গাছ হইতে ৬২৫ ছয় শত পঁচিশ টাকা আয় হইতে পারে। মালীর বেতন ও জমীর খাজানার বার্ষিক একশত পঁচিশ টাকা খরচ হইলেও প্রতি বিঘায় বৎসর ৫০০ৎ পাঁচ শত টাকা লাভ!! এতদ্ভিন্ন তরকারির জন্য কাঁচা পাপিয়া

বিক্রয় হইয়া থাকে।”

মন্দার কুসুম। পৌরণিক বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য। কলিকাতা, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্—বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মলাটেই জ্ঞানদাসের স্মরণীয় কবিতাটীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল :—

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।”

আমরাও অবশ্য “সুখের লাগিয়া” মন্দার কুসুম নাটক পড়িতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু দোষ দিব কার্?—“সকলি গরল ভেল।” রামায়ণ বা মহাভারত বেওয়ারিশ জিনিস বলিয়াই না হয় তাহার উপাখ্যানভাগের উপর এতটা অত্যাচার শোভা পায়, কিন্তু সেই সব মহাপ্রাণ চরিত্র লইয়া খেলা করিতে যাওয়া কি নিরাপদ না ধর্ম্ম সঙ্গত? যদি বড় বড় কথায় জোবানবন্দী লিখিতে অথবা ছড়া কাটাইতে পারিলেই নাটককার হওয়া যাইত, তবে আজ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমান্ সেক্সপীয়রের এবং কালিদাসের অভাব নাই। বাঙ্গালায় যিনি নাটক লিখিলে লিখিতে পারিতেন, আজিও তিনি সে উদ্যম করিলেন না। নাটক সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের কলঙ্ক কবে মোচন হইবে?

আরও একটা কথা বলি। আধুনিক বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন প্রথম হইতেই অনেক কথা বলিয়াছে। এবং বোধ হয়, অন্যান্য মাসিক পত্রেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা নাটক লেখেন, তাঁহারা অবশ্য সে সকল কথা জানেন। তবে তাঁহারা কেন যে আবার নাটক লিখিয়া বঙ্গদর্শন প্রভৃতি কাগজে সমালোচনার্থ পাঠাইয়া দেন, আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া উৎসাহ ভঙ্গ করিতে আমাদের যথার্থই কষ্ট হয়। অতএব তাঁহারা একটু বুঝিয়া চলিলে আমরা বাধিত হইব।

কেশব-বিয়োগ।—স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পরলোকপ্রাপ্তি উপলক্ষে) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৯০

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার কয়খানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। আর সেই উপলক্ষে শুদ্ধ এক দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে অবিশ্রান্ত যে সব লেখালেখি হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এ সকল শুভচিহ্ন। ইহাতে অন্ততঃ বুঝায়, বাঙ্গালী এখন দেশের সুপুত্রদের আদর করিতে শিখিয়াছেন।

কেশব বাবুর জীবনী লিখিবার সময় আজিও হয় নাই। যে ধর্ম্মের প্রচার

তিনি জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, পঞ্চাশ বৎসরেও কতক অনুভূত হয় কিনা সন্দেহ। এ দেশে একাল পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে—অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক জন্মিয়াছেন—সেই সেই ধর্ম্ম এবং সে সংস্কারকগণের কৃতকার্য্য প্রথমতঃ যেরূপ বোধ হইয়াছিল, দুই তিন শত বৎসর পরের ইতিহাস ঠিক্ তাহার বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। সুতরাং কেশব বাবুর প্রকৃত জীবনী লেখক জন্মিবার এখনও অনেক দেরী।

তবে কেশব বাবুর সাময়িক জীবনী চাহিনা, এমত বলি না। সাময়িক জীবনী চাই, এবং সরল ভাবে আড়ম্বর মাত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের লিখিত "কেশব বিয়োগে" সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আর ইহাতে কবিতার এত বাড়াবাড়ি কেন, বুঝিতে পারিলাম না। কথায় কথায় কবিতা লেখা বড় ছেলে-মানুষী বলিয়া আমাদের মনে হয়।

—o—